# রোমাণ্টিক কবি ও কাব্য

রোমাণ্টিক কবি ও কাব্য

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

# রোমান্টিক কবি ও কাব্য



বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

বাক্‌-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩ কলেজ রো :: কলিকাতা ৯

*Romantic Kavi O Kavya*





প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৭৯ / অগাস্ট ১৯৭২

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্‌-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩ কলেজ রো
কলিকাতা ৯



মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
শ্রীহরি প্রেস
১৩৫এ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট
কলিকাতা ৭

প্রচ্ছদপট :
শ্রীসুধাময় দাশগুপ্ত

ছয় টাকা

সীতা-কে

Where the heart lies, let the brain lie also.

# ভূমিকা

বিদেশী রোমান্টিক কবি ও তাঁদের সাহিত্য এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। আলোচনা যাতে সাধারণ পাঠকের বোধগম্য, ছাত্রদের উপযোগী ও সকলের হৃদয়গ্রাহী হয় সে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কবির রচনার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে মূল রচনার অনেক উৎকৃষ্ট অংশ উদ্ধৃত করেছি। সাহিত্যিক মূল্যায়নও বাদ পড়ে নি। এই আলোচনায় ইংরাজী সাহিত্যের প্রাধান্য স্বাভাবিক। ব্লেক থেকে কীট্‌স্ পর্যন্ত সাত জন ইংরাজ রোমান্টিক কবি এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছেন। যে রোমান্টিক ধারা ওয়ার্ডসোয়ার্থের যুগে ইংরাজী কাব্যসাহিত্যে বেগবতী হয়ে উঠেছিল, ভিক্‌টোরীয় যুগে, এমন কি বিংশ শতাব্দীতেও, তার অবলুপ্তি ঘটে নি। ব্রাউনিং ও ডে লা মেয়ারের কবিতা এই ধারার অক্ষুণ্ণতার প্রমাণ। পরিসর সীমিত রেখে এবং কবির কাব্যের অন্তর্নিহিত মূল্য, বিশ্বজনীনতা ও কবিখ্যাতি বিচার ক'রে ইংরাজী সাহিত্যের বাইরে তিন জনকে নির্বাচন করেছি। লেওপার্দীর নির্বাচনের স্বতন্ত্র তাৎপর্যও রয়েছে। যদিও তিনি একজন দিক্‌পাল কবি, তাঁর নামের সঙ্গে পাঠক-সাধারণের বিশেষ কোনো পরিচয় নেই।

কবিদের জীবনবৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে যা তাঁদের কবিতা ভালোভাবে বোঝার সহায়ক হবে। তা ছাড়া জীবনকাহিনীর বিশেষ আকর্ষণ অবশ্যই আছে। মিল্‌টন বলেছেন, বড়ো লেখক হওয়ার আশা যিনি পোষণ করেন, তাঁকে নিজেকেই 'প্রকৃত কবিতা' হতে হবে। যে সব কবি এই গ্রন্থের অন্তর্গত তাঁরা অনেকেই নিজেদের জীবনে প্রকৃত কবিতা হতে পেরেছিলেন।

প্রথম প্রবন্ধে কাব্যের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা ও শেষ প্রবন্ধটিতে রোমান্টিক কবিতার বিশিষ্ট রূপের বিশদ পরিচয়। প্রসঙ্গত বাঙ্‌লা কবিতার কথাও এসেছে, বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতাকে ব্রাউনিঙের প্রেমের কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি।

বিদেশী নাম বা শব্দের বেলায় রোমক লিপিতে স্বরন্যাস-চিহ্নিত অক্ষর ব্যবহার সম্ভব হয় নি। মুদ্রণালয়ে এই অক্ষরের ব্যবস্থা নেই। লিপ্যন্তর

করার সময় যতটা সম্ভব প্রচলিত বানান অনুসরণ করেছি। 'রোম্যান্টিক', 'শেলি', 'ইলিজাবেথ্' প্রভৃতি বানান শুদ্ধতার দিক থেকে বাঞ্ছনীয় হলেও বাঙ্‌লা ভাষায় প্রায় অপ্রচলিত।

এই বইয়ের মূল পরিকল্পনা অনেক দিন আগের। কোনো কোনো অংশের খসড়া 'ভারতবর্ষ', 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময় পিতৃদেব স্বর্গত ডক্টর ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও আমার শিক্ষাগুরু স্বর্গত অধ্যাপক তারকনাথ সেন সেগুলি দেখে দিয়েছিলেন। তাঁদের পুণ্যস্মৃতি আমাকে নিরন্তর প্রেরণা দিয়েছে।

রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে অধ্যাপক ডঃ শিশির চট্টোপাধ্যায়ের সস্নেহ উপদেশ ও সাহায্য সব সময় পেয়েছি। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে আমার ছাত্র শ্রীমান্ নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন। প্রাথমিক প্রচেষ্টা তাঁরই। প্রুফ্-সংশোধনে সযত্ন সহায়তা করেছেন শ্রীগগন দে। এঁদের ও অন্য যাঁদের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়েছি তাঁদের সকলকে, বিশেষ ক'রে আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার মজুমদার, ডক্টর প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য; শুভার্থী অধ্যাপক ডঃ শীতাংশু মৈত্র, ডক্টর দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীবিনয় দত্ত ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; বন্ধু অধ্যাপক দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অপূর্ব সান্যাল, অধ্যাপক তারাপ্রসন্ন ঘটক ও ডক্টর জ্যোতির্ময় ঘোষ; ছাত্র শ্রীমান্ অশোক চৌধুরী ও শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ শীল, এবং বাক্-সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

ইংরাজী বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
স্বাধীনতা দিবস, ১৯৭২

# সূচীপত্র

## শোক থেকে শ্লোক। কাব্যের জন্ম

They learn in suffering what they teach in song.
SHELLEY

কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস রঘুবংশ-কাব্যের চতুর্দশ সর্গের এক স্থানে পতি-পরিত্যক্তা রোরুদ্যমানা জানকীর সঙ্গে আদিকবি বাল্মীকির আকস্মিক সাক্ষাৎ বর্ণনা করতে গিয়ে বাল্মীকি সম্পর্কে লিখেছেন— 'নিষাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ' অর্থাৎ ব্যাধকর্তৃক বাণবিদ্ধ ক্রৌঞ্চকে দেখে যাঁর শোক শ্লোক বা কবিতার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কালিদাস এখানে নূতন কথা কিছু বলেন নি, পুরাতন কবিপ্রসিদ্ধিকে নিজের মতো করে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে কাব্যসৃষ্টির দুর্জ্ঞেয় রহস্যের উপর কিছুটা আলোকপাত রয়েছে। কামমোহিত ক্রৌঞ্চের ক্রন্দন প্রথমে বাল্মীকিকে শুধু অভিভূতই করেছিল, তাঁর কবিসত্তাকে জাগ্রত করে নি। তখন বিচার করার মতো বা নিজেকে প্রকাশ করার মতো তাঁর মনের অবস্থা নয়। তিনি যে শোকগ্রস্ত এ অনুভূতি তাঁর তখনও আসে নি। যে মুহূর্তে বাল্মীকির শোকের উচ্ছ্বাস সংযত হল, সে মুহূর্তেই তাঁর শোকের অনুভূতি জাগল। নিষাদ বা ব্যাধকে তিনি যখন চিরকালের অভিশাপে অভিশপ্ত করলেন—

মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ

তখন সে অনুভূতি রূপ পেল। অনুভূতি যখন রূপ পায় তখন তা কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়। ব্যক্তিবিশেষের বিষাদ করুণরসে পরিণত হল, যা ছিল অন্তর্জগতে তা সাহিত্যের সামগ্রী হল, শোক শ্লোকে উত্তীর্ণ হল। শোক থেকে শ্লোকে উত্তরণের মধ্যে সাধারণ মানুষ কবিতে রূপান্তরিত হল, মর অমরে।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কবির তফাৎ কোথায়। কিংবা এই কথাই অন্য ভাবে বলতে গেলে, কবিকে অ-কবি থেকে পৃথক করব

কিভাবে? ভাবের অনুভূতি অল্পবিস্তর সকলেরই আছে, শব্দের মাধ্যমে আমরা চলতি কথাবার্তায় বা চিঠিপত্র ইত্যাদি লেখার মধ্যে তাকে রূপও দিচ্ছি। তা হলে আমরা কবি হই না কেন? যে কারণে নিষ্কপর্দক না হলেই অর্থবান হয় না ঠিক সেই কারণে। অনুভূতি ও অনুভূতিতে পার্থক্য রয়েছে, আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এক রূপ ও অন্য রূপে রয়েছে সাগর-গভীর প্রভেদ। অন্য সব দিকে কবি অন্য সকলের মতো সাধারণ মানুষ হলেও তাঁর অনুভূতির ক্ষমতা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম, অনেক তীক্ষ্ণ, অনেক নিগূঢ়, অনেক ব্যাপক। অনুভূতির তীব্রতা ও গভীরতা বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রদীপ্ত ক'রে জ্ঞান-লোকের দ্বার উন্মুক্ত করে। তাই বাল্মীকির শোকের জ্ঞান বা অনুভূতির সঙ্গে সাধারণ শোকের অনুভূতির কোনো তুলনাই হয় না। তুলনা করা চলে কীট্‌সের অসমাপ্ত কাব্য 'Hyperion' কাব্যের অ্যাপোলোর সঙ্গে, যাঁর উপলব্ধি তাঁকে দেবত্ব এনে দিয়েছিল— যিনি বলেছিলেন—

Knowledge enormous makes a God of me.

ভাবাবেগের অনুভূতির যে তীব্রতা তারও ইতরবিশেষ আছে। শোকের অনুভূতি তীব্রতম। সুতরাং বেদনাই প্রজ্ঞার মূল উৎস। তাই বায়রন তাঁর কাব্যনাট্য 'Manfred'-এর শুরুতেই বলেছেন— Sorrow is knowledge। কীট্‌স তাঁর একটা চিঠিতে এই প্রশ্নই তুলেছেন— 'বোধশক্তিকে শিক্ষা দিয়ে আত্মিক শক্তিতে পরিণত করার জন্য বেদনা ও অশান্তিতে ভরা এই সংসারের কত প্রয়োজন সেটা দেখছ না?' বেদনার ধারা-স্নানে অভিষিক্ত হয়ে কবির নবজন্ম হয়— কবিও তাই ব্রাহ্মণের মতো দ্বিজ। কবি তাঁর সাবিত্রীকে বলবেন, অ্যাপোলো যেমন কীট্‌সের কাব্যে নেমোসাইনিকে বলেছেন—

Names, deeds, gray legends, dire events, rebellions,
Majesties, sovran voices, agonies,
Creations and destroyings, all at once
Pour into the wide hollows of my brain,
And deify me, as if some blithe wine
Or bright elixir peerless I had drunk,
And so become immortal.

যে ঘাত-প্রতিঘাতে জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ আবর্তিত হচ্ছে, সংসারের

ভালো-মন্দ, শাদা-কালো আন্দোলিত, তা কবির সংবেদনশীল মন যে ভাবে অনুভব করবে আমরা তা কল্পনাও করতে পারব না। সুরভারতীর কবি যথার্থই বলেছেন, 'জাহ্নবীমজ্জনং প্রীতি ন জানন্তি মরুস্থিতাঃ।' অনুভূতির জোয়ারে অবগাহনে কবির যে তৃপ্তি তা আমাদের ধারণাতীত; যারা পল্বল চোখে পর্যন্ত দেখলাম না, স্পর্শ করা তো দূরের কথা। মানুষের স্বভাবই এই যে তার সব তীব্র অনুভূতিই সে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়; তাই বিবাহের আনন্দানুষ্ঠানেই হোক, আর শ্রাদ্ধের দুঃখের দিনেই হোক, নিমন্ত্রিতের সংখ্যার অনুপাত একই থাকে। (আশ্চর্য মনের অঙ্কশাস্ত্র! সংসারের গণিতের সঙ্গে এর এতটুকু মিল নেই। অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিলে তাই আনন্দ কমে না গিয়ে বরং বেড়ে যায়; শেলীর true love-এর মতো, to divide is not to take away। দুঃখের ক্ষেত্রে আবার এর বিপরীত।) মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে কবিও নিজের তীব্র অনুভূতিকে নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন না; অন্যের সঙ্গে তা ভাগ করে নিয়েই তাঁর আনন্দ। যতক্ষণ সেটা সম্ভব না হচ্ছে ততক্ষণ 'প্রকাশের ব্যথা' তাঁকে ব্যাকুল করে রাখছে। 'নিজের মনোভাব অপরের মনে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া, উহাই সাহিত্য, উহাই ললিত-কলা'। কবি আপন মনে যে রস সম্ভোগ করেন সেটা যখন এমন রূপ পরিগ্রহ করে যা সর্বজনগ্রাহ্য ('সর্ব' কথাটি আক্ষরিক অর্থে না নিলেও চলবে) তখনই তা কাব্য। এইদিক থেকে দেখলে শিল্পীমাত্রেই কবি। চিত্রশিল্পী রাফাএল্‌, ভাস্কর মেকেলাঞ্জেলো ও সুরস্রষ্টা মোট্‌সার্টকে 'কবি' বলতে বাধা নেই। আর সেই কারণেই আমরা অজন্তা ও ইলোরায় 'কাব্য' খুঁজে পাই, যেমন খুঁজে পাই শ্রাবস্তীর কারুকার্যে।

কবিতা স্বত-উৎসারিত, স্বতঃস্ফূর্ত। ওয়ার্ডসোয়ার্থের ভাষায় spontaneous overflow of powerful feeling। ওয়ার্ডসোয়ার্থ-উক্ত ভাবাবেগের এই প্লাবনকে আলঙ্কারিক অভিনবগুপ্ত সাধারণ একটি উপমার সাহায্যে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন— পরিপূর্ণকুম্ভোচ্ছলনবৎ। পরিপূর্ণ কলস থেকে জল যেমন উচ্ছলিত হয়ে পড়ে কবিচিত্ত থেকে কাব্যরস সে ভাবে শতধা উৎসারিত। এর অর্থ এই নয় যে কাব্যের সৃষ্টিতে কবির নিজের কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই। সক্রিয় ভূমিকা যেটা আছে সেটা পরে আসে। উচ্ছলিত কাব্যরসকে অলৌকিক বলতে পারি। সেটা কবির প্রচেষ্টা-সঞ্জাত নয়; সেখানে কবি

সম্পূর্ণভাবে অক্রিয়। সেই উচ্ছলিত কাব্যরসকে আধারে ধরে রাখার জন্য যে প্রযত্ন তার মধ্যে কবির স্বকীয়তা রয়েছে। কিন্তু আধার যত বড়োই হোক না কেন, কাব্যরসের অফুরন্ত নির্ঝরের কতটুকু বা তাতে ধরা চলে। শেলী তাঁর 'কাব্যের স্বপক্ষে' প্রবন্ধে তাই বলেছেন—" 'আমি কাব্য রচনা করব', এ কথা কোনো লোক বলতে পারে না। কবি-সার্বভৌমও তা বলতে পারেন না; কারণ স্থষ্টির সময় মনের অবস্থা নির্বাণোন্মুখ অঙ্গারের মতো। কোন অদৃশ্য প্রভাব দমকা বাতাসের মতো তাকে ক্ষণ-দীপ্তিতে জাগিয়ে দেয়। এ শক্তি অন্তর থেকে জাগে, ফুলের বিকাশের সঙ্গে তার রঙ যেমন ম্লান হয়, বদলে যায়; আর আমাদের প্রকৃতির চেতন-অংশগুলি তার আসা-যাওয়ার কোনো খবর রাখে না। এই প্রভাব তার মৌলিক শুদ্ধতা ও শক্তি নিয়ে যদি স্থায়ী হতে পারত তা হলে তার ফল কত বিরাট হত সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা সম্ভব নয়; কিন্তু রচনার যখন সূত্রপাত হয় তার পূর্বেই প্রেরণার ক্ষয় আরম্ভ হয়ে যায়, আর বিশ্ববাসীর গোচরে আনা হয়েছে যে-সব কাব্য তার মধ্যে যা সর্বশ্রেষ্ঠ সেটিও বোধ হয় কবির মনের মূল কল্পনার ক্ষীণ ছায়া মাত্র।"

কাব্যস্থষ্টির মূলে এই ধরনের অলৌকিকত্ব আছে বলেই কাব্যে আমরা কবির সাংসারিক রূপের পরিচয় পাই না। কবির জীবনের ব্যক্তিগত ঘটনা, কল্পনা, অনুভূতি যখন কাব্যের রূপ পরিগ্রহ করে তখন তা রূপান্তরিত হয়। কাব্য বোঝার জন্য তাই কবির সাংসারিক জীবনের খুঁটিনাটি জানবার জন্য ব্যস্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যে ধরনের উদগ্র কৌতূহল নিয়ে আমরা আজকাল কবির জীবনের ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ দিকগুলির সন্ধান করি তা শুধু অশালীনই নয়, অপ্রয়োজনীয়ও বটে। বিদেশে শেলী, কার্লাইল্‌, ডিকেন্স্‌ প্রভৃতি লেখকদের জীবনের তথ্যসন্ধানে যে অশোভন আগ্রহ দেখানো হয়েছে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির জীবন নিয়ে তারই দাসসুলভ অনুকরণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার রসগ্রহণের জন্য কবিমানসীর কোনো পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না। নষ্টনীড়ের নায়িকার মর্মবেদনা উপলব্ধি করার জন্য কাদম্বরী দেবীকে আনার কী দরকার? 'W. H.' উইলিয়াম হার্ভে, না উইলিয়াম হার্বার্ট, এ প্রশ্ন শেক্সপীয়রের চতুর্দশপদী কবিতার রসগ্রহণে বাধারই স্থষ্টি করবে, সহায়তা করবে না। 'কবিরে পাবে না কবির জীবনচরিতে'।

নিজের মনোভাব অপরের মনে সঞ্চারিত করার প্রয়াসের মধ্যে সাধারণ

ভাবে কবির যেমন আনন্দ আছে তেমন সার্থকতাও আছে। কিন্তু কাব্যসৃষ্টির পিছনে আর-একটা মানবিক দিক আছে। সেটি মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য-বোধ। বাসগৃহ, বেশভূষা থেকে আরম্ভ করে বন্ধুবান্ধব পর্যন্ত যা কিছু আমরা পছন্দ করে নির্বাচন করি সেই নির্বাচনের পিছনে আমাদের সৌন্দর্যবোধ কাজ করে। এ সৌন্দর্যবোধ আমাদের সহজাত। (মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর মধ্যেও এটা দেখা যায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অনেক পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে 'সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা' হয় স্ত্রী-প্রাণীকে আকর্ষণ করার জন্য। প্রাণিবিদ্যা-বিদেরা এ বিষয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন।) সৌন্দর্যের সর্জন, সৌন্দর্যের নিরীক্ষণ, সৌন্দর্যের উপভোগ, সৌন্দর্যের মূল্যায়ন—এসব দিকে মানুষের প্রবণতা স্বভাব-সুলভ এবং বহুমুখী।

অন্যান্য অনুভূতির মতো সৌন্দর্যের অনুভূতিতেও কবির সংবেদনশীলতা সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি। যে-সব জিনিসের মধ্যে আমরা কোনো কান্তি খুঁজে পাই না, প্রাত্যহিকতার অঙ্গনে যা বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, যা আমাদের শুধু ক্লান্তি আনে, কবির অন্তর্দৃষ্টি সেই-সব জিনিসের বহিরাবরণ ভেদ করে তাদের আসল রূপ দেখতে পায়। কবির তৃতীয় নয়নের সামনে তাদের আদিম সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত হয়। সেই সৌন্দর্যের অনুভূতি একান্ত উন্মাদক। কবির হৃদয় তাই ময়ূরের মতো নেচে ওঠে। শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাসের কিছুটা অন্তত কবির কাব্যে সঞ্চারিত হয় ও তা কাব্যের মধ্য দিয়ে পাঠকচিত্তে সংক্রমিত হয়। পাঠকের দৃষ্টির সামনে থেকে যেন একটা পর্দা সরে যায়। যা অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র, শুধু অবহেলার বিষয় ছিল, সেইটাই কেমন করে সহসা লাবণ্যময় রূপে উদ্ভাসিত হল। ড্যাফোডিল্ ফুল অতি-পরিচয়ের ফলে শুধু অবজ্ঞাই পেত সাধারণ দর্শকের কাছ থেকে। কিন্তু ওয়ার্ডসোয়ার্থ যখন এক বিশেষ রূপে সুবর্ণোজ্জ্বল আন্দোলিত ড্যাফোডিল্‌কে দেখলেন—

যে তারকারাজি ছায়াপথে জলে
তাদেরই মতন অবিচ্ছিন্ন,
তারা বিস্তৃত ছিল অনন্ত দলে
উপসাগর-তট করি আকীর্ণ।
এক নিমেষেতে দেখিনু হাজার,
হৃষ্ট লাস্যে মাথা নাড়ে বার বার,

তখন ড্যাফোডিলের রূপান্তর ঘটল। কবির চোখের মায়া সবার চোখে ছড়িয়ে গেল। আগে ঘাসের দিকে আমরা ফিরেও তাকাতাম না। কিন্তু এখন— যখন মনে পড়ে জীবনানন্দের কবিতা—

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা ;
কাঁচা বাতাবীর মতো সবুজ ঘাস— তেমনি সুঘ্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে,

তখন ঘাস দেখলে আমাদেরও ইচ্ছা হয় এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো গেলাসে-গেলাসে পান করি।

এমন-কি, যা আমাদের কাছে বিশ্রী কুৎসিত তার মধ্যেও কোথাও কোনো সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে, যা শুধু কবির বা শিল্পীর চোখে ধরা পড়ে। (যেমন শেক্সপীয়রের রাজা পঞ্চম হেনরি কবির চোখ দিয়ে দেখেছিলেন— There is some soul of goodness in things evil)। কিংবা অন্য ভাবে দেখলে, শিল্পরূপের যাদুস্পর্শে অসুন্দর সুন্দরে রূপান্তরিত হচ্ছে। তাই সংসারে যেটা আমরা ঘৃণার চোখে দেখি, যেটা সহ্য করা কষ্টকর, সেটাই যখন আবার কাব্যের বা শিল্পের উপাদানরূপে আসে তখন আমাদের মুগ্ধ করে। অ্যারিস্টটল তাঁর কাব্যতত্ত্ব-গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে 'মাইমেসিস্' ("রূপ-দান") প্রসঙ্গে বলেছেন, যে-সব শিল্প মাইমেসিস্-মূলক, অর্থাৎ যেখানে রূপ রয়েছে, সেগুলি থেকে সকলের আনন্দ পাওয়া স্বাভাবিক। এটা তো আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা দেখতে পাই। অ্যারিস্টটল তাই বলেছেন— "কতকগুলি বস্তু আছে যেগুলি দেখা আমাদের পক্ষে কষ্টকর কিন্তু সেগুলিরই হুবহু প্রতিচ্ছবি আমাদের আনন্দ দেয়, যেমন জন্তুদের শরীর কিংবা মানুষের মৃতদেহ।" ফল্স্টাফের মতো বাচাল, মিথ্যাভাষী ও ভোগসর্বস্ব লোক আমাদের চেনামহলে থাকলে জুগুপ্সার উদ্রেক করে। কিন্তু সেই লোকই শেক্সপীয়রের হাতে কতই না চিত্তগ্রাহী হয়ে উঠেছে। চিত্রশিল্প থেকে Rembrandt-এর Anatomy Lesson ছবিটির বা Michelangeloর Pieta ছবিটির উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। শেষোক্ত ছবিটিতে মৃত খ্রীস্টকে মাতৃক্রোড়ে দেখা যাচ্ছে। দুঃসহ বেদনা কী অপরূপ লাবণ্য পরিগ্রহ করেছে জননীর মুখাবয়বে ; আর খ্রীস্টের কী সৌম্য কান্তি, যেন সুখনিদ্রায় শয়ান রয়েছেন। জীবনে যা অসম্পূর্ণ, কাব্যে তা

সম্পূর্ণ, জীবনে যা কাঁটা, কাব্যে তাই ফুল।' তাই সিডনি বলেন, প্রকৃতির ভুবন পিতলের, কবিই শুধু স্বর্ণময় ভুবনের সৃষ্টি করতে পারেন। 'ধ্বন্যালোক'-কার যথার্থই বলেছেন—

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে॥

সৌন্দর্যসৃষ্টির বিশেষ এক আনন্দ আছে, সে আনন্দ কবির। আর কবির এ আনন্দের সঙ্গে অহংকারও কম নেই। কবি এমন এক বস্তু সৃষ্টি করছেন যা কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে। অন্য সব সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী। গোলাপের রঙ, রমণীর যৌবন, পাখির গান— সব একদিন মুছে যাবে। কিন্তু কাব্য অক্ষয় হয়ে থাকবে, আর কাব্যের মধ্যে কবিও অমরতা পাবে। যেখানে সব সৌন্দর্য ভঙ্গুর সেখানে কবিই শুধু স্থায়ী সৌন্দর্যের সন্ধান দিচ্ছেন। তাই হরেস্ তাঁর একটি গাথায় লিখেছেন—"আমি একটি স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ শেষ করেছি যেটি তাম্রের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং পিরামিডের রাজকীয় রূপের চেয়ে উচ্চতর, বৃষ্টিতে যা গ্রাস করতে পারবে না, ক্ষিপ্ত উত্তর বায়ু বা অসংখ্য বর্ষপুঞ্জ বা পলাতক সময় ধ্বংস করতে পারবে না। সম্পূর্ণ মৃত্যু আমার হবে না, আমার অনেকটাই কৃতান্তের কবল থেকে পরিত্রাণ পাবে।"

## উইলিয়াম ব্লেক

১৭৫৭ - ১৮২৭

He was naked, and saw man naked, from the centre of his own crystal.

T. S. ELIOT

উইলিয়াম ব্লেক কবি, চিত্রশিল্পী ও মরমিয়া সাধক। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর লণ্ডন-নগরীতে তাঁর জন্ম হয়। সামান্য ব্যাপারীর পুত্র ব্লেকের সমস্ত জীবন দারিদ্র্য ও অখ্যাতির মধ্যে কেটেছে। সাধারণ বিদ্যালাভ তাঁর ভাগ্যে ছিল না। স্কুল-কলেজে অধ্যয়নের তিনি তেমন সুযোগ পান নি। চিত্রাঙ্কন শিক্ষণ-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করলেও প্রচলিত শিল্পরীতি ও শিল্প-আদর্শের প্রতি তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। রুবেন্‌সের শৈলী এবং শিল্পে জীবনের বাস্তব প্রতিফলন— এ দুই-ই তাঁর কাছে ছিল সমভাবে পরিত্যাজ্য। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিরক্ষর ক্যাথারিন বৌচারকে বিবাহ করেন। তাঁর এ বিবাহ সুখের হয়। কৈশোরেই ব্লেক কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন এবং তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পোয়েটিক্যাল স্কেচেস্' ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর নিজের ও অন্যান্য কবির বহু রচনার ব্লেক 'মিনা করা সংস্করণ' প্রকাশিত করেন; বিশেষতঃ 'দ্য বুক্ অফ্ জোব্', ব্লেয়ারের 'দ্য গ্রেভ্' ও দান্তের 'কমেদিয়া'র জন্য তাঁর চিত্রকর্ম প্রকৃতই অসামান্য। ব্লেকের কবিতার পূর্ণ রস গ্রহণের জন্য তাঁর ছবিগুলি কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা দরকার। চিত্রাঙ্কন ও খোদাইয়ের কাজেও তাঁর প্রতিভা পূর্ণভাবে বিকশিত। 'সংস্ অফ্ ইনোসেন্স্' প্রকাশিত হয় ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে, 'সংস্ অফ্ এক্স্‌পিরিয়েন্স্' ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে। জটিল ও দুর্বোধ্য পরবর্তী রচনাগুলির মধ্যে অধিকাংশ মূলতঃ রূপক। এগুলির মধ্যে

'দ্য বুক্ অফ্ ইউরিজেন্' (১৭৯৪), 'দ্য বুক্ অফ্ লস্' (১৭৯৫), 'মিল্‌টন' (১৮০৪) ও 'জেরুসালেম্' (আ. ১৮০৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জুলাই ব্লেকের মৃত্যু হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্লেক মহৎ কবিত্বের স্বীকৃতি পান নি; বিংশ শতাব্দীতে তাঁর কবিপ্রতিভাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ১৮৬৭ সালে যখন প্যাল্‌গ্রেভ তাঁর 'দ্য গোল্ডেন ট্রেজারি' সংকলন করেন তখন ব্লেকের একটি কবিতাও সে গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। রবীন্দ্রনাথের যাঁরা সমসাময়িক তাঁদের কাছে ব্লেক অনেকটা অনাবিষ্কৃত ছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে রোমান্টিক কবিদের কথা লিখতে গিয়ে অনায়াসে ব্লেককে বাদ দিতে পেরেছেন—

'বাল্যকালে যে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হল তখনকার দিনে সেটাকে আধুনিক বলে গণ্য করা চলত। কাব্য তখন একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল, কবি বার্নস থেকে তার শুরু। এই ঝোঁকে একসঙ্গে অনেকগুলি বড়ো বড়ো কবি দেখা দিয়েছিল। যথা, ওয়ার্ড্‌স্বার্থ, কোল্‌রিজ, শেলি, কীট্‌স।'

'নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ' কথাটি মানুষের সাংসারিক ভাগ্য সম্বন্ধে যেমন খাটে তেমনি সাহিত্য-মীমাংসার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে ব্লেককে তাঁর নিজের যুগে কবি রূপেই গণ্য করা হয় নি তাঁকেই আবার অনেক সমালোচক এখন শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবির মর্যাদা দিচ্ছেন। এমন-কি, তাঁকেই নূতন রোমান্টিকতার প্রবক্তা ধরা হচ্ছে। বার্নস্ কখনো কখনো প্রাচীন রীতির অনুসরণ করেছেন; তাঁর শৈলীতে পোপের যুগের প্রভাব দেখা যায়। ব্লেকের লেখায় কিন্তু 'নিও-ক্ল্যাসিক্যাল' রীতি দুর্লভ। তিনি মনে-প্রাণে রোমান্টিক। বিচারবুদ্ধি বা যুক্তিতর্ককে তিনি একেবারেই গুরুত্ব দেন নি। কল্পনাশক্তির বিকাশই তাঁর কাছে সর্বস্ব। বিচারবুদ্ধি মানবজাতিকে শৃঙ্খলিত করে; কল্পনার পথই মুক্তির পথ। কোল্‌রিজ ও শেলী পরবর্তী কালে 'ইম্যাজিনেশান্'-এর যে জয়গান গেয়েছেন তার উদাত্ত আলাপ আমরা ব্লেকের কম্বুকণ্ঠে শুনেছি। ব্লেকের কাছে সত্যকে উপলব্ধি করার দুটি মাত্র পথ। একটি প্রতীকের সাহায্যে; 'Jerusalem' কবিতা থেকে তাঁর নিজের উক্তি উদ্‌ধৃত করে বলা যায়—

For a tear is an intellectual thing,
And a sigh is the sword of an Angel King,
And the bitter groan of the martyr's woe
Is an arrow from the Almighty's bow.

আর-একটি অলৌকিক দৃষ্টি। ব্লেকের 'The Land of Dreams' কবিতার কথা মনে পড়ে—

Father, O father! what do we here
In this land of unbelief and fear?
The Land of Dreams is better far,
Above the light of the morning star.

ব্লেকের একেবারে প্রথম দিকের রচনাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল 'ম্যাড্ সং', 'টু মর্নিং', 'টু দ্য মিউজেস্' এবং দুখানি গান— 'মাই সিল্ক্স অ্যাণ্ড ফাইন অ্যারে' ও 'হাউ সুইট আই রোম্ড'। সানন্দে ও স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণশীল শিশুকে কিভাবে প্রেমের কুমার তাঁর উদ্যানে ভুলিয়ে নিয়ে গেলেন, এই হচ্ছে শেষোক্ত রচনাটির বিষয়বস্তু। শিশুটির মতো পাখিটিও সূর্যদেবতার জালে ধরা পড়ল। শিশুটি ও পাখিটি একাত্ম হয়ে গেল—

How sweet I roamed from field to field,
And tasted all the summer's pride,
Till I the prince of love beheld
Who in the sunny beams did glide!

He shewed me lilies for my hair
And blushing roses for my brow;
He led me through his gardens fair
Where all his golden pleasures grow.

With sweet May dews my wings were wet,
And Phoebus fired my vocal rage;
He caught me in his silken net
And shut me in his golden cage.

He loves to sit and hear me sing,
Then, laughing, sports and plays with me ;
Then stretches out my golden wing
And mocks my loss of liberty.

'Prince of love' বলতে সম্ভবতঃ যীশু বা পঞ্চশরকে বোঝানো হচ্ছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রেমের কুমারকে দেখছে, সরল নিষ্পাপ শিশু আনন্দ ও স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারছে ; তার পর কিন্তু প্রেমের স্বার্থ-সুখের অনুভূতি হওয়া মাত্র সে ফাঁদে আটকে পড়েছে। গোলাপ ও বাগান অভিজ্ঞতার একটি দিকের প্রকাশ— প্রেমের ঈর্ষাকাতর রূপের প্রতীক। বালপ্রৌঢ়ত্বের দিক থেকে চ্যাটার্টনের চেয়েও ব্লেক আমাদের দৃষ্টি অনেক বেশি আকর্ষণ করেন ; তাঁর বয়স চোদ্দ পূর্ণ হওয়ার আগেই ব্লেক এই গানটি রচনা করেন ; অথচ এমন সুললিত গাথা মিল্টনের মৃত্যুর পর আর বিশেষ শোনা যায় নি। ব্লেকের পরবর্তী কালের সাংকেতিক শৈলীর পূর্বাভাস এখানে যেমন পাওয়া যাচ্ছে— তেমন পাওয়া যাচ্ছে মননের দিকে ব্লেকের প্রবণতার একটা স্পষ্ট পরিচয়।

ব্লেকের পরিণত রচনাগুলিতে তাঁর রোমান্টিক, বিদ্রোহী সত্তা আরো পরিস্ফুট। 'পোয়েটিক্যাল স্কেচেস'-এ কিছু কিছু প্রচলিত শৈলীর প্রভাব দেখা যায়। 'সংস্ অফ্ ইনোসেন্স' থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী সমস্ত রচনায় ব্লেক সম্পূর্ণভাবে মৌলিক। সাধারণবুদ্ধি ও নিয়মানুবর্তনের যে প্রভাব অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুপ্রচলিত ছিল ব্লেক তার মূলোচ্ছেদ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। উন্মাদনা ও কল্পনা, আতিশয্য ও মনন, ব্লেকের কাছে এই ছিল জ্ঞানলোকের একমাত্র সোপান। 'Exuberance is Beauty'। তেজোদ্দীপ্ত প্রাণশক্তিকে ব্লেক জীবন-নির্ঝরের উৎস মনে করতেন। 'কামনাকে তারাই প্রশমিত করে যাদের কামনা প্রশমিত হওয়ার মতো দুর্বল।' ফ্রিয়েড্‌রিখ্ ভিল্‌হল্‌ম্ নীট্‌ঝে'র মতো তিনিও নির্দেশ দিতে পারতেন— 'বিপজ্জনকভাবে বাঁচো'। আধুনিক মনঃসমীক্ষণ ব্লেকের নিকট বহুলাংশে ঋণী। যে ব্লেককে লোকে এক সময় উন্মাদ ধরে নিয়েছিল সেই ব্লেকের রচনাবলী থেকেই ফ্রয়েড ও য়ুঙ্ যথেষ্ট অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা পেয়েছেন। বিচারবুদ্ধিকে ব্লেক সংসারের অশুভ শক্তি মনে করতেন, কারণ সেটা মানুষকে নিগড়িত করে

মাত্র। রুসোর মতো তিনিও মানুষের সৃষ্টি প্রথা ও প্রতিষ্ঠানকে কোনো মর্যাদা দিতেন না। তাঁর ধারণা ছিল, মানুষের আদিম অবস্থাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা। শৈশবে আদিম ভাব অনেকটা অবিকৃত থাকে তাই তাঁর কাছে শৈশবের এত মূল্য, তাঁর কবিতায় শৈশবের এত প্রাধান্য।

'দ্য সংস্ অফ্ ইনোসেন্স' ছোটোদের জন্য লেখা হলেও এর গভীরতা ও কাব্যমূল্য অসামান্য। ব্লেক শিশুকে ইংরাজী কাব্যে স্থায়ী আসন-দানের মাধ্যমে যে পথ নির্মাণ করে গেছেন ওয়ার্ডসোয়ার্থ সেই পথেই আরো এগিয়েছেন। শৈশবের নিষ্পাপ সারল্য সাধারণ অথচ সুন্দর ও অন্তরঙ্গভাবে ব্লেক তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। নিজে নিঃসন্তান হয়েও শিশুচরিত্রে যে অন্তর্দৃষ্টি ব্লেক লাভ করেছিলেন তা বিস্ময়কর। তাঁর ভাষা আটপৌরে অথচ লাবণ্যময়, ভাব সহজ অথচ প্রগাঢ়। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের কবিতাগুলির সঙ্গে ব্লেকের এই পর্যায়ের লেখার তুলনা করা হলে তা একেবারেই কষ্টকল্পনা হবে না। এই কবিতাগুলিতে ব্লেক নিজেই যেন শিশুর ভূমিকা নিয়েছেন। আর যে কবিতায় তিনি শিশু নন সেখানে তিনি যেন স্নেহময়ী জননী। এই যুগে ব্লেকের বোধ হয় বিশ্বাস ছিল যে প্রেমের উজ্জ্বল সূর্যালোকের কাছে মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার অন্ধকার নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। তাই কাব্যগ্রন্থের প্রথম ভূমিকাত্মক কবিতায় তিনি লিখেছেন—

And I made a rural pen,
And I stained the water clear,
And I wrote my happy songs
Every child may joy to hear.

ব্লেকের মতে কাব্যসৃষ্টির মূল কথা অনুপ্রেরণা। 'সংস্ অফ্ ইনোসেন্স্'-এর প্রথম কবিতায় সেই কথাটিই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এই সংকলনের অন্যান্য কবিতার মধ্যে প্রথমেই 'The Lamb'-এর নাম করা যেতে পারে। তাদের অন্তর্নিহিত সারল্যের জন্য শিশু, মেষশাবক ও যীশুকে ব্লেক এই কবিতায় সমানধর্মা রূপে গণ্য করেছেন। ঈশ্বর অকৃপণ-করে যে ঐশ্বর্য আমাদের দিয়েছেন তার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা এই কবিতায় সংগীতের সুরে ঝংকৃত। 'সংস্ অফ্ এক্সপিরিয়েন্স্' গ্রন্থের 'The Tyger' এই কবিতার যুগ্মক। 'Infant Joy' কবিতাটিতে দুই দিনের একটি নবজাত শিশুর নামকরণ

করা হয়েছে 'আনন্দ'। 'আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'। এর বিপরীত অনুভূতি রয়েছে 'সংস্ অফ্ এক্সপিরিয়েন্স্'-এর 'Infant Sorrow' কবিতাটিতে—

My mother groaned ! my father wept.
Into the dangerous world I leapt,
Helpless, naked, piping loud
Like a fiend hid in a cloud.

দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তদানীন্তন আন্দোলন ব্লেকের মনেও সাড়া জাগিয়েছিল ; তারই প্রকাশ 'The Little Black Boy' কবিতাটিতে। গাত্রবর্ণের পার্থক্যে শিশুসুলভ সারল্য বিকৃত হয় না। নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ বালকে প্রকৃতপক্ষে কোনো ভেদাভেদ নেই— এটাই ব্লেক এখানে বলতে চেয়েছেন। কোল্‌রিজের এটি অন্যতম প্রিয় কবিতা। এই প্রসঙ্গে 'The Chimney Sweeper' কবিতাটি উল্লেখ্য। বালকদের পক্ষে চিম্‌নি পরিষ্কারকের কাজ অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। তাদের বেদনারই বাণীরূপ এই কবিতা। স্বাভাবিক ভাবেই এই কবিতাটি চার্লস ল্যামের নিকট প্রিয় ছিল।

১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে যখন ব্লেক 'সংস্ অফ্ ইনোসেন্স্' এবং 'সংস্ অফ্ এক্সপিরিয়েন্স্' একসঙ্গে প্রকাশ করেন তখন তিনি নামপত্রে একটি গৌণ অভিধাও ব্যবহার করেন— 'Showing the Two Contrary States of the Human Soul'। ব্লেকের চিন্তায় বিরোধাভাসের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তিনি নিজেই বলেছেন—'Without Contraries Is No Progression'। এই বিরোধাভাসের সক্রিয় রূপ দেখার জন্য 'সংস্ অফ্ এক্সপিরিয়েন্স্' পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। 'সংস্ অফ্ ইনোসেন্স্' শুধু অবিমিশ্র মাধুর্য ও আলোকের ঝর্না নয়। এতে একদিকে যেমন রয়েছে 'দ্য একোয়িং গ্রীন্', 'ইন্‌ফ্যান্ট্ জয়', 'দ্য শেপার্ড' ও 'স্প্রিং' প্রভৃতি কবিতা যেগুলিতে গ্রামীণ পরিবেশে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের স্বাভাবিক সুখ বিবৃত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে 'দ্য স্কুলবয়', 'দ্য লিট্‌ল ব্ল্যাকবয়' ও 'দ্য চিম্‌নি-সুইপার' প্রভৃতি কবিতা যেগুলি অবহেলিত ও অত্যাচারিত শিশুদের বেদনায় উন্মথিত।

'দ্য সংস্ অফ্ এক্সপিরিয়েন্স্'-এর ভূমিকাত্মক কবিতায় ব্লেক বলেছেন— 'Hear the voice of the Bard ! Who present, past, and future

sees.' এই গ্রন্থের 'দ্য ফ্লাই' কবিতাটিতে একটি ক্ষুদ্র মক্ষিকার অস্তিত্বের মধ্যে ব্লেক নিখিল ভুবনের জীবন-স্পন্দন অনুভব করেছেন। মানুষ ও মক্ষিকার মধ্যে ব্লেক নিগূঢ় সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন, বার্ন্‌স যেমন মানুষ ও মূষিকের একই ভাগ্যলিপি পাঠ করেছিলেন। 'মিথ্যায় ঘেরে ছোটো কণাটিরে তুচ্ছ করিয়া দেখিলে'। যা কিছু প্রাণবান সে সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি ও তার প্রতিটির মধ্যে ঈশ্বর স্বয়ং বিদ্যমান। উপনিষদের ঋষিদের মতো ব্লেক সর্বেশ্বরবাদে আস্থাশীল ছিলেন ; সব কিছুর মধ্যে তিনি দিব্য শক্তির প্রকাশ দেখেছেন।

'The Tyger' কবিতাটি 'The Lamb' কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্যাঘ্রের স্রষ্টা সম্পর্কেও ব্লেক প্রশ্ন তুলেছেন—

Tyger ! Tyger ! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry ?

যে 'ভয়ংকর সুষমা' ব্লেক ব্যাঘ্রের মধ্যে দেখেছেন সেই ভয়ংকর সুষমা এই কবিতারও সম্পদ। উদাত্ত প্রস্তর-সংগীতের সুরে এই গীতিকবিতাটি ঝংকৃত। প্রচলিত 'tiger' বানান না ব্যবহার করে 'tyger' লেখার মধ্যেও ব্লেকের উদ্দেশ্য একই— আমাদের বিপন্ন বিস্ময়ের বোধকে আরো জাগ্রত করা। ব্যাঘ্রকে যে প্রশ্ন করা হয়েছে, 'Did he who made the Lamb make thee ?' সে প্রশ্নের উত্তর কবিতার মধ্যেই রয়েছে। মেলাবার যিনি তিনিই মেলাতে পারেন ; মেষশাবক ও ব্যাঘ্রকে তিনিই মিলিয়েছেন, মিলিয়েছেন অশুভের মর্ষণ ও শাসন। ব্যাঘ্রের উগ্রতার মধ্যে ঈশ্বরের রুদ্ররূপ, যেমন মেষশাবকের নম্রতার মধ্যে তাঁর শান্তরূপ। রক্ষক যিনি, প্রয়োজন হলে তাঁকেই সংহারকের ভূমিকা নিতে হয়। অভিজ্ঞতার নাগপাশ চূর্ণ করার জন্য আত্মার যে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন তারই প্রতিরূপ এই ব্যাঘ্র। চার্ল্‌স্ ল্যাম যখন এই কবিতাটিকে 'glorious' রূপে বর্ণনা করেছিলেন তখন তিনি কিন্তু এতটুকুও অতিরঞ্জন করেন নি।

'সংস্ অফ্ এক্সপিরিয়েন্স্'-এর আর-একটি অবিস্মরণীয় গীতিকবিতা Ah, Sunflower'। সূর্যমুখী ফুল ভাগ্যবিড়ম্বিত, কারণ সূর্যের গতির সঙ্গে তার নিজের লক্ষ্য নিয়ন্ত্রিত করলেও সে মাটির টানে বাঁধা রয়েছে

তাই যে-সব ভাগ্যহত নরনারীর অশান্ত জীবনের ব্যাকুল কামনা কোনোদিন চরিতার্থ হবে না তাদের সকলের প্রতীক এই সূর্যমুখী ফুল। পরিপূর্ণ জীবনের প্রাচুর্যে কোনোদিনই তারা মুক্তি পাবে না, কারণ তারাও তাদের পার্থিব অগ্নিচক্রে আবদ্ধ—

Ah, Sun-flower! weary of time,
Who countest the steps of the Sun,
Seeking after that sweet golden clime
Where the traveller's journey is done:
Where the Youth pined away with desire,
And the pale Virgins shrouded in snow
Arise from their graves, and aspire
Where my Sun-flower wishes to go.

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতিকবিদের মধ্যে ব্লেক অন্যতম। আটটি পঙ্‌ক্তিতে এরূপ সুললিত ও অনবদ্য লিরিক শুধু ইংরাজী ভাষায় কেন, পৃথিবীর যে কোনো ভাষাতেই দুর্লভ।

'The Clod and the Pebble' কবিতাটিতে প্রেমের দুই বিপরীত রূপ দেখানো হয়েছে। মাটির ঢেলা অন্যদের সেবায় নিজেকে ভুলে যায়, তাই তার কণ্ঠে আমরা শুনি—

পিরীতি কখনও চায় না নিজের সুখ,
নিজের তরে কোনো চিন্তা নাই,
অপরের তরে নিজে বরে দুখ,
নরকের নিরাশার মাঝে গড়ে স্বর্গ তাই।

আর স্বার্থমগ্ন নুড়ি নিজের সুখের জন্য সব কিছু গ্রাস করতে উদ্যত, তাই তার উক্তি—

পিরীতি সর্বদা চায় নিজের সন্তোষ,
নিজের সুখের তরে অন্যের বন্ধন,
অন্যের দুঃখেতে তার শুধুই উল্লাস,
স্বর্গের অবজ্ঞা মাঝে নরক সৃজন।

'The Sick Rose' কবিতাটিতে প্রেমের অপমৃত্যু দেখানো হয়েছে। স্বার্থপরতা

ও সংযমন এর কারণ। প্রেমের কুসুম অদৃশ্য কীটের দ্বারা দষ্ট, তাই রুগ্ণ গোলাপ মুমূর্ষু প্রেমের প্রতীক।

ব্লেক মরমী কবি— অনুভূতি তাঁর কাছে সব; অভিজ্ঞতা শুধু বিভ্রান্তির দ্বার। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তাঁর কাছে শুধু একটি দর্শনের তত্ত্ব বা ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত মাত্র ছিল না। মরমিয়া তত্ত্বের আলোচনা করার তাঁর প্রয়োজন হয় নি, মরমিয়া সাধনা তাঁর কাছে ছিল নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ। তাঁর সব কবিতায় এ সত্য ভাস্বর— সে কবিতা প্রথম কৈশোরে লেখাই হোক বা পরবর্তী কালের 'Milton'-এর মতো 'prophetic' রচনাই হোক। তিনি বিশ্বাস করেন 'Everything that lives is holy', মধুময় ধরণীর ধূলি। শৈশব থেকেই ব্লেক আশেপাশে দেবদূতদের অনুভব করেছেন, শুনেছেন পক্ষ-বিধূনন শব্দ। তাই তিনি 'The Marriage of Heaven and Hell' গ্রন্থে লিখেছেন— 'যদি অনুভূতির দ্বারগুলি পরিষ্কৃত থাকত, সব কিছুই মানুষের কাছে প্রকৃত— অর্থাৎ অনন্ত— রূপে প্রতিভাত হত।' তাই ব্লেক ময়ূরের অহমিকার মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা, ছাগের লালসায় ঈশ্বরের বদান্যতা, সিংহের ক্রোধে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও নারীর নগ্নতায় ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন। তাই তিনি তাঁর 'Auguries of Innocence' এই স্তবকটি দিয়ে আরম্ভ করেছেন—

> To see a World in a Grain of Sand
> And a Heaven in a Wild Flower,
> Hold Infinity in the palm of your hand
> And Eternity in an hour.

পরবর্তী কালে জেম্‌স জয়েস যেমন অতি তুচ্ছ ঘটনাতেও 'epiphany' খুঁজে পেতেন, ব্লেকও তেমন সিকতাবিন্দুর মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিরীক্ষণ করেছেন। তাঁর কবিতার সার্থকতা উপভোগে ততটা নয় যতটা উপলব্ধিতে।

# রবার্ট বার্নস্

১৭৫৯ - ১৭৯৬

...How verse may build a princely throne
On humble truth.

WORDSWORTH

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইংরাজী কবিতায় প্রাণের স্পন্দন অপেক্ষা বুদ্ধির দীপ্তিই বেশি ছিল। আলেক্‌জাণ্ডার পোপ এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর লেখায় ছন্দের ছটা আছে, ভাষার যাদু আছে। কিন্তু চিত্তের প্রকাশ নেই, কল্পনার বিকাশ নেই। রোমান্সের বর্ণবিন্যাস নেই। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হওয়ার কিছু আগে থেকেই কবিতায় আবার রোমান্সের সুরের মৃদুমন্দ ধ্বনি শোনা যায়। পরবর্তী কালে এই সুরের আলোতেই উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যাকাশ উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। ক্ল্যাসিকাল্ ও রোমান্টিক— এই দুই যুগের মাঝামাঝি যাঁরা আসছেন তাঁদের মধ্যে আছেন জেম্‌স টম্‌সন, অলিভার গোল্ডস্মিথ, টমাস গ্রে, উইলিয়াম কলিন্স, উইলিয়াম কুপার এবং জর্জ ক্র্যাব। এই অন্তর্বর্তীকালীন কবিদের কবিতায় রোমান্টিক নবজাগরণের পরিষ্কার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। উইলিয়াম ব্লেক ও রবার্ট বার্নস্‌কে অনেক সময় এঁদের সঙ্গে সম-শ্রেণীভুক্ত করা হয়। কিন্তু বস্তুতঃ ব্লেক ও বার্নস্ মনে প্রাণে রোমান্টিক এবং এঁদের রোমান্টিকতার দ্যুতি পরবর্তী রোমান্টিক যুগের পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কবি ওয়ার্ড-সোয়ার্থ, কোল্‌রিজ, বায়রন, শেলী ও কীট্‌সের কবিতার রোমান্টিক দ্যুতির মতোই সমুজ্জ্বল। ব্লেক ও বার্নস্-এর কবিতা ও গানেতেও শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মতো বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"একদিন সাহিত্যের আসরে পোপ ছিলেন নেতা। তাঁর ছিল

ঝক্‌ঝকে পালিস-করা লেখা ; কাটাকোটা ছাঁটাছোঁটা জোড়া দেওয়া দ্বিপদীর গাঁথনি। তাতে ছিল নিপুণ ভাষা ও তীক্ষ্ণ ভাবের উজ্জ্বলতা. রসধারার প্রবাহ ছিল না। শক্তি ছিল তাতে, তখনকার লোক তাতে প্রচুর আনন্দ পেয়েছিল। এমন সময় এলেন বার্নস্‌। তখনকার শান-বাঁধানো সাহিত্যের রাস্তা, যেখানে তক্‌মা-পরা কায়দাকানুনের চলাচল, তার উপর দিয়ে হঠাৎ তিনি প্রাণের বসন্ত-উৎসবের যাত্রীদের চালিয়ে নিলেন। এমন একটি সাহিত্যের রূপ আনলেন যেটা আগেকার সঙ্গে মিলল না। তার পর থেকে ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ, কোল্‌রিজ, শেলী, কীট্‌স আপন আপন কাব্যের স্বকীয় রূপ সৃষ্টি করে চললেন।" ব্লেক ও বার্নস্‌-এর কবিতায় যে রোমান্টিক ভাবধারা প্রবাহিত হয়েছে পরবর্তীকালে তাতেই এসেছে জোয়ার।

ব্লেক ও বার্নস্‌ দুজনেই প্রথম শ্রেণীর গীতিকার। গীতিকবিতা রচনায় দুজনেই সিদ্ধহস্ত। এঁদের বৈসাদৃশ্য কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রোমান্টিক কল্পনায় দুটি প্রধান দিক আছে। একটি দিকে মানব ও মৃত্তিকার সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে। আর-এক দিকে 'উচ্চতরে, আরো উচ্চতরে' মানুষের কল্পনা পাখা মেলে দেয়। বার্নস্‌ প্রধানতঃ প্রথমটির কবি এবং ব্লেক মূলতঃ দ্বিতীয়টির। ব্লেক আকাশ, বার্নস্‌ মৃত্তিকা। এই আকাশ ও মাটি এসে মিলবে ঊনবিংশ শতকের প্রথম প্রান্তে রোমান্টিক নবজাগরণের কবিদের রচনার মধ্যে।

বার্নস্‌ একাধিক অর্থে মৃত্তিকার সন্তান। "I was bred to the plough", তিনি বলেছেন। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি স্কট্‌ল্যাণ্ডের অন্তর্গত Ayr-এর নিকটবর্তী Alloway-তে এক দরিদ্র কৃষকের মাটির ঘরে বার্নস্‌-এর জন্ম হয়। সে সময় নিদারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছিল। বার্নস্‌-এর জন্মের কয়েকদিন পরেই এক প্রবল ঝড়ে তাঁদের মাটির বাড়ির ছাদ উড়ে যায়। মা নবজাত শিশুকে নিয়ে প্রতিবেশীর কাছে আশ্রয় নেন। অনেক বছর পরে বার্নস্‌ মন্তব্য করেছিলেন— "A novelist might perhaps have viewed the scene with satisfaction, but not so I।" তাঁর বাবা উইলিয়াম ছিলেন খাঁটি মানুষ। ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে তিনি জ্বালাময় দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। মা অ্যাগ্‌নেস্‌ ছিলেন অসামান্য লাবণ্যবতী। তাঁর অন্তর ছিল গানের আলোয় ভরা। তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারিণী।

ছয় বছর বয়সের সময় বার্নস্ গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়তে যান। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "I was a good deal noted for retentive memory" এবং "though it cost the schoolmaster some thrashings, I made an excellent English scholar"। ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষাও তিনি সামান্য একটু শিখেছিলেন। বাল্যাবস্থায় তিনি বেশি বই পড়ার সুযোগ পান নি। তাঁর প্রথম-পড়া বই হচ্ছে 'The Life of Hannibal'। স্থানীয় কর্মকারের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে তিনি 'The History of Sir William Wallace' পড়েন। কবির নিজের ভাষায়— এই গ্রন্থ "poured a Scottish prejudice into my veins, which will boil along there till the floodgates of life shut in eternal rest"। পরে অবশ্য বার্নস্ অনেক পড়াশুনা করেছিলেন। কিন্তু "Far seen in Greek, deep man o' letters" তিনি কোনোদিনই ছিলেন না। আর সেইজন্যই বোধ হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ কীটদষ্ট না হয়ে বহুপঠিত হচ্ছে।

বাল্যাবস্থা থেকেই রবার্টকে দারিদ্র্যের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। অনেকদিন সমগ্র পরিবারকে অনাহারে দিন কাটাতে হয়েছে। তেরো বছর বয়সে রবার্টকে চাষের কাজ পুরোদস্তুর আরম্ভ করে দিতে হয়। কৈশোরে এই নিদারুণ পরিশ্রমের ফলে এই সময় থেকেই বার্নস্-এর শরীর খারাপ হতে শুরু হয়। অবশ্য শস্যক্ষেত্রেও বার্নস্-এর হাতে বই দেখা যেত এবং কণ্ঠে গান শোনা যেত। পনেরো বছর বয়সে বার্নস্ কৃষির ব্যাপারে পিতার প্রধান নির্ভর হয়ে উঠেন। তাঁর তদানীন্তন জীবনের তিনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন—"the cheerless gloom of a hermit, and the unceasing moil of a galley slave"। সংসার চালানোর আর্থিক দিকের সব দুশ্চিন্তা উদ্‌বেগ বালক বার্নস্ তাঁর মা-বাবার সঙ্গে সমানভাবে ভোগ করেছেন।

তখনকার দিনে স্কটল্যাণ্ডে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে ক্ষেতের কাজ করত। পঞ্চদশবর্ষীয় বার্নস্-এর সঙ্গিনী ছিল একটি চতুর্দশী কিশোরী। এই মেয়েটির নাম ছিল নেলি কার্কপ্যাট্রিক। এই 'মুগ্ধকারিণী' মেয়েটিই বার্নস্-এর প্রথম গানের প্রেরণা। গানটি হচ্ছে—"Once I loved a Bonnie Lass"। এই থেকেই বার্নস্-এর সংগীত রচনার আরম্ভ।

১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে পুরাতন গৃহ ছেড়ে বার্নস্-পরিবারকে পঞ্চাশ মাইল দূরের

টার্‌বোল্‌টনে উঠে আসতে হয়। এখানে আসার পর বার্নস্ স্থানীয় বিতর্ক-সভায় যোগদান করেন ও একটি নৃত্য-শিক্ষালয়ে শিক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁর বাবা এই নৃত্যশিক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এই সময় থেকেই পুত্রের প্রতি মনোভাবের মধ্যে একটা বিরাগের লক্ষণ প্রতীয়মান হত। একটু ল্যাটিন শেখারও বার্নস্ চেষ্টা করেন। কিন্তু এদিকে তিনি ছিলেন ব্রাউনিঙ-এর নায়ক ফ্রা লিপো লিপি'র শিষ্য। ফ্রা লিপো লিপি লাটিন ভাষার শুধু 'আমো' ('আমি ভালোবাসি') কথাটি শিখেছিলেন। শিষ্যবিদ্যা পটীয়সী। বার্নস্ ভার্জিল অবধি এগিয়েছিলেন। তিনি নিজেই সকৌতুকে বলেছেন, একটি মন্ত্র তিনি খুব নিপুণভাবে শিখেছিলেন। সেটি হচ্ছে 'Omnia vincit amor' ('প্রেম সর্বজয়ী')।

১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালটা বার্নস্ ভূমি পরিমাপের কাজ শেখার জন্য কার্কঅস্‌ওয়াল্‌ড্-এ কাটান। এইখানে তিনি আরো দুটি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন— 'কি করে পানপাত্র পূর্ণ করতে হয়' ও 'নির্ভয়ে সুরামত্তদের কলহে যোগ দিতে হয়'। পুরুষ ও নারী-চরিত্র সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতাও তিনি অর্জন করেন।

এর পরের চার বৎসর বার্নস্-এর জীবনে খুব উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নি, অবশ্য Alison Begbie-র সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা বাদ দিলে (এই মেয়েটিই তাঁর পরবর্তী কবিতার Mary Morison)। বার্নস্ যখন তাঁকে বিবাহ করার প্রস্তাব করেন তখন তিনি অসম্মত হন।

এই সময় বার্নস্ উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করেছিলেন। মেয়েদের তিনি ভালো না বেসে থাকতে পারতেন না। গ্রামের অনেক মেয়ের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। কবিতায় এঁদের অনেককে তিনি তাঁর ভাষার সৌন্দর্যে অমর করে রেখেছেন। নারী তাঁর কাছে "dear, deluding woman, the joy of joys"। একজন সাধারণ মেয়েও তাঁর কবিকল্পনার আলোকে অপরূপা হয়ে উঠত। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—"My passions, once lighted up, rage like so many devils, till they find vent in rhyme।"

কৃষি থেকে জীবিকা-নির্বাহের আশা ত্যাগ করে ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে বার্নস্ Irvine-এ যান তাঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে শন তৈরি করার কাজ শিখতে। একদিন অগ্নিকাণ্ডের ফলে তাঁদের দোকান ভস্মীভূত হওয়ায় বার্নস্‌কে বাধ্য

হয়ে ফিরে আসতে হয়। এর পরের বছর তাঁর ভগ্নহৃদয় পিতার মৃত্যু হয়। অমানুষিক পরিশ্রম ও অপরিসীম দারিদ্র্য তাঁর মৃত্যুকে এগিয়ে আনে। মৃত্যুশয্যায় তিনি বার্নস্‌কে বলেন, 'Robbie, আমি তোমার ভবিষ্যতের আশঙ্কা নিয়ে মরছি। আমার কাছে অঙ্গীকার করো, তুমি ভালো হবে।'

'রব্-ই' বাবার হাত হাতে নিয়ে অঙ্গীকার করেছিলেন। সে অঙ্গীকারের মর্যাদা তিনি রাখতে পারেন নি।

বাবার মৃত্যুর পর বার্নস্ Mossgiel-এ চাষের কাজ আরম্ভ করেন। এই-খানেই তাঁর Jean Armour-এর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়।

দারিদ্র্য ও নিজের চারিত্রিক দুর্বলতায় বিব্রত বার্নস্ দেশান্তরে গিয়ে বাস করার সিদ্ধান্ত করে জ্যামাইকা যাওয়া স্থির করেন। যাওয়ার আগে তিনি নিজের কতকগুলি প্রথম দিকের রচনার একটা সংকলন করেন। কিছু অর্থ-লাভের কল্পনা ছিল আর ছিল জন্মভূমিতে নিজের কিছু স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাওয়ার আশা। 'রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে'।

গ্রন্থকারকে মাত্র কুড়ি পাউণ্ড পারিশ্রমিক দিয়ে Kilmarnock-এর John Wilson ছয় শত গ্রন্থ মুদ্রণে সম্মত হন। 'The Cotter's Saturday Night', 'To a Mouse' এবং আরো কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা এই সংকলনের অন্তর্গত ছিল। জ্যামাইকা যাওয়ার জন্য টিকিট কেনা হয়ে গিয়েছিল। জাহাজ ছাড়ার আগের দিন রাত্রিতে বার্নস্ তাঁর জন্মভূমিকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন—

> Farewell, old Coila's hills and dales,
> Her heathy moors and winding vales ;
> The scenes where wretched Fancy roves
> Pursuing past unhappy loves !
> Farewell, my friends ! Farewell, my foes !
> My peace with these, my love with those ;
> The bursting tears my heart declare,
> Farewell, my bonnie banks of Ayr !

The Gloomy Night



পরের দিন সকালে বার্নস্ মত পরিবর্তন করলেন। প্রখ্যাত সমালোচক ডক্টর ব্ল্যাক্‌লক তাঁর নবপ্রকাশিত গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। লোকের

মুখে মুখে তাঁর বইয়ের সুখ্যাতি। বার্নস্-এর মনে নতুন আশার সঞ্চার হল। তিনি জ্যামাইকায় না গিয়ে রাজধানী এডিনবরায় গেলেন। সেখানে এই কৃষক-কবিকে নিয়ে 'ধন্য, ধন্য' পড়ে গেল। বিদগ্ধসমাজ মুগ্ধ। শহরের সর্বশ্রেণীর নরনারী সমাদরের জয়মাল্য নিয়ে বরণ করে নিলেন নতুন কবি বার্নস্‌কে। বায়রনের মতো তিনিও বলতে পারতেন—"I awoke one morning and found myself famous"।

এই আকস্মিক জনপ্রিয়তার স্রোতে বার্নস্ নিজের উদারতা বিসর্জন দেন নি। আত্মশ্লাঘায় নিজেকে স্ফীত করে তোলেন নি। তাঁর গৌরব তিনি সহজ অনাড়ম্বর ভাবে শান্তচিত্তে বহন করেছেন প্রকৃত বীরের মতো। তবে এডিনবরার প্রভাবশালী মহলের ব্যবহারে অনেক সময় একটা 'পৃষ্ঠপোষকতার ভাব' ছিল। সেটা লক্ষ্য করে বার্নস্ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। এই আদর-অভ্যর্থনা কিন্তু বেশি স্থায়ী হল না। স্কটল্যাণ্ডের যে সহৃদয়মণ্ডলী বার্নস্-এর কবিতার জয়গান গেয়েছিলেন তাঁরা তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতার কথা জানতে পেরে হতবাক্ হলেন। পরের বছর তিনি যখন এডিনবরায় এলেন তখন সে সংগীত স্তব্ধ হয়ে গেছে।

যশের মুকুটে অনেক সময় ব্যথার কাঁটা লুকানো থাকে, এ কথা বুঝেছিলেন রবার্ট বার্নস্। তিনি লিখেছেন—

Nae treasures, nor pleasures,
Could make us happy lang ;
The heart aye's the part aye
That makes us right or wrang.

Epistle to Davie

বার্নস্-এর জীবনের শেষ কয়বছর মর্মন্তুদ দুঃখে কেটেছে। কিন্তু প্রায় সারা জীবনই দুঃখে কাটলেও দুঃখ কোনোদিন তাঁর মনের আনন্দের উৎসকে শুষ্ক করে দিতে পারে নি। প্রাণ খুলে তিনি হাসতে পারতেন। রঙ্গপরিহাসের প্রতি তাঁর ছিল স্বাভাবিক টান। আলাপচারী বার্নস্ তাঁর বন্ধুদের চিত্ত জয় করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি চিঠিও আন্তরিকতায় ও অন্তরঙ্গতায় চিত্তহারী হয়ে উঠেছে। তাঁর মধ্যে প্রচুর আশার প্রস্রবণ রয়েছে। সত্যই, তাঁর জীবন বেদনাবিধুর হলেও ক্রন্দনশীল লোক তিনি নন। দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করত

কিন্তু তাঁর মনে দাগ কাটতে পারত না। বার্নস্-এর এই আশা আনন্দ উদ্দীপনা সব কিছুরই মূলে আছে হৃদয়ের স্বত-উৎসারিত প্রীতি ও স্নেহ।

১৭৮৮ সালে তিনি Dumfries-এর কাছে Ellisland Farm কেনেন। অবিচলিতানুরাগা Jean Armourকে বিবাহ করে তিনি এখানে বসবাস শুরু করেন। এই নীড়-বাঁধার স্বপ্ন তিনি অনেক দিন ধরে দেখে এসেছেন। ভোগের সুখে শান্তি নেই ; আর কি স্বল্পস্থায়ী, কি ক্ষণভঙ্গুর সে সুখ !

But pleasures are like poppies spread—
You seize the flow'r, its bloom is shed ;
Or like the snow falls in the river—
A moment white— then melts for ever.

Tam O' Shanter

তিনি জানতেন—

The heart benevolent and kind
The most resembles God.

A Winter Night

আর অন্তরের করুণায় প্লাবিত করার প্রথম স্থান 'একটুকু গৃহকোণ'।

To make a happy fire-side clime
To weans and wife,
That's the true pathos and sublime
Of human life.

To Dr. Blacklock

বার্নস্-এর 'fire-side clime' 'happy' করার জন্য বার্নস্‌কে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বরাবর সংগ্রাম করতে হয়েছে। বিবাহের পরের বছর তিনি আবগারি বিভাগে কাজ পান। এই কাজ ছিল পরিশ্রমসাপেক্ষ। এই কাজের সামান্য বেতন ও কবিতার আয়ে তাঁর সংসার মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে পারত। কিন্তু শৌণ্ডিকালয়ের মোহ তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। পরিশ্রম ও উচ্ছৃঙ্খলতা-মিশ্রিত তাঁর শেষ জীবনের তমসার মাঝে তাঁর অসামান্য গীতিপ্রতিভা আলোকস্তম্ভের মতো ফুটে উঠেছে। 'Bonnie Doon,' 'My

Love is like a Red, Red Rose,' 'Auld Lang Syne' প্রভৃতি গীতি-গুচ্ছ বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ হয়ে রয়েছে।

১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে ২১শে জুলাই মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে বাতজনিত জ্বরে রবার্ট বার্নস্-এর মৃত্যু হয়। মরণকে তিনি একবার সম্বোধন করেছিলেন "The poor man's dearest friend, the kindest, and the best!" তাঁর শেষ চিঠিতে তিনি এক বন্ধুর কাছে টাকার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন পিয়াদার টাকার তাগাদা থেকে বাঁচবার জন্য। আর তাঁর একটি শেষের কবিতায় তিনি Jessie Lewars কে ভালোবাসা জানিয়েছেন। বার্নস্ যখন অসুস্থ ছিলেন তখন এই কোমলপ্রাণা মেয়েটি বার্নস্-এর শুশ্রূষায় সাহায্য করেছিলেন। সুন্দর সুমধুর গানে অকুণ্ঠ, সীমাহীন প্রেম—

O wert thou in the cauld blast
   On yonder lea, on yonder lea,
My plaidie to the angry airt,
   I'd shelter thee, I'd shelter thee.

...

Or were I in the wildest waste,
   Sae black and bare, sae black and bare,
The desert were a paradise,
   If thou wert there, if thou wert there.

নিজের জন্য বার্নস্ যে সমাধি-লিপি লেখেন তাতে তিনি নিজের দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতা ক্ষমা করেন নি—

Is there a man whose judgment clear
Can others teach the course to steer,
Yet runs himself life's mad career
      Wild as the wave?
Here pause, and, through the starting tear,
      Survey this grave.
The poor inhabitant below
Was quick to learn and wise to know,

And keenly felt the friendly glow
And softer flame ;
But thoughtlss follies laid him low
And stained his name.
Reader, attend ! whether thy soul
Soars fancy's flights beyond the pole.
Or darkling grubs this earthly hole
In low pursuit ;
Know, prudent, cautious self-control
Is wisdom's root.

মনে প্রাণে রোমাণ্টিক হলেও বার্নস্-এর ইংরাজী কবিতায় পোপ প্রভৃতি ক্লাসিকাল গোষ্ঠীর কবিদের ভঙ্গী ও শৈলীর ছাপ অনেক স্থলে দেখতে পাওয়া যায়। ইয়ং, গ্রে, গোল্ডস্মিথ, ফার্গুসন প্রভৃতি কবিদের দ্বারাও বার্নস্ প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে বার্নস্-এর ব্যঙ্গকবিতাগুলি 'ক্ল্যাসিকাল' ধরনের। এই শ্রেণীর কবিতা রচনায় বার্নস্ দক্ষ শিল্পী। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তাঁর একটা স্বাভাবিক নৈপুণ্য আছে। সর্বপ্রকারের ভণ্ডামি ছল শঠতা ও প্রবঞ্চনাকে তিনি তীব্র কশাঘাত করেছেন। অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিক্ত তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'The Holy Fair' ও 'Holy Willie's Prayer' উল্লেখযোগ্য। নৈর্ব্যক্তিক হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন Tam O' Shanter কবিতাটি। ভৌতিক কাহিনী কবিতায় কত কৌতুককর হতে পারে তা 'Tam O' Shanter' না পড়লে বোঝা যায় না। এতে অনেক 'মজা' আছে। বার্নস্-এর নিজের কথাই মনে পড়ে—

Some rhyme a neebor's name to lash ;
Some rhyme ( vain thought ! ) for needfu' cash ;
Some rhyme to court the country clash,
An' raise a din ;
For me, an aim I never fash ;
I rhyme for fun.

Epistle to James Smith

কবিব নিজের মতে Tam O' Shanter তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা। কার্লাইল্ কবিতাটিকে 'a piece of sparkling rhetoric' বলে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু ব্যঙ্গরসের কবির চেয়েও তাঁর বড়ো মহত্ত্ব হচ্ছে যে তিনি জনগণের কবি। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তাঁর কোমল প্রাণে বার বার আঘাত করেছে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার তাঁর যেমন বেজেছে এমন খুব কম লোকেরই হয়।

Man's inhumanity to man
Makes countless thousands mourn !
Man was made to mourn

এরই প্রতিধ্বনি পরে আমরা ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতায় শুনেছি। বাঙালী চণ্ডীদাস গেয়েছিলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' স্কচ বার্নস্ গাইলেন—

'A man's a man for a' that.'

Is there, for honest poverty,
That hings his head, and a' that ?
The coward-slave ! We pass him by,
We dare be poor for a' that !
For a' that, and a' that,
Our toils obscure, and a' that ;
The rank is but the guinea's stamp :
The man's the gowd, for a' that.
For a' that and a' that

শুধু মানুষ নয়, পশু পক্ষী ফুল সব কিছুর সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করেন। তাই হলচালনার সময় যে মূষিকটিকে তিনি বাস্তুচ্যুত করেছিলেন তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছেন—

I'm truly sorry Man's Dominion
Has broken Nature's social union.
An' justifies th'ill opinion
Which makes thee startle

At me, thy poor, earth-born companion,
An' fellow-mortal !

তার পর মূষিক ও মানুষের নিগূঢ় সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন—

The best-laid schemes o' mice an' men
Gang aft agley.

To a Mouse

যে ডেজি-ফুলটিকে তিনি উন্মূলিত করেছিলেন তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এই To a Mountain Daisy কবিতাটি হেরিকের Daffodils কবিতাটি মনে করিয়ে দেয়।

প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে বার্নস্-এর মতো সহজ সুন্দর ও অকপট-ভাবে অনেকদিন লেখা হয় নি। তিনি তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন ও স্কচ্ উপভাষার সরল লালিত্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। সেই-জন্যই তাঁর গীতিকবিতাগুলি ও গানগুলি অন্তর স্পর্শ করে। তাঁকে পৃথিবীর সেরা গীতিকার বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। পুরাতন সুরে তিনি অনেক নতুন গান লিখেছেন। অনেক পুরাতন গানকে নবীন রূপ দিয়েছেন। মানুষ প্রকৃতি ও প্রেমকে তিনি কতভাবেই না দেখেছেন। তাঁর Auld Lang Syne এক বিশ্ববিশ্রুত গান।

We twa hae run about the braes,
And pu'd the gowans fine ;
But we've wander'd mony a weary foot
Sin' auld lang syne.

We twa hae paidl't i' the burn,
Frae mornin' sun till dine ;
But seas between us braid hae roar'd
Sin' auld lang syne.

এ সবেরই অসাধারণ সৌন্দর্য আছে। কিন্তু অদ্ভুত অপূর্ব সুন্দর তাঁর প্রেমের কবিতা। প্রেমের কবিতার এ ললিত সারল্য দুর্লভ।

My love is like a red, red rose
That's newly sprung in June

My love is like the melodie
That's sweetly play'd in tune.

So fair art thou, my bonnie lass,
So deep in love am I :
And I will love thee still, my dear,
Till a' the seas gang dry.

কিংবা—

I'll ne'er blame my partial fancy,
Naething could resist my Nancy,
Bnt to see her was to love her,
Love but her, and love for ever.

Had we never lov'd sae kindly,
Had we never lov'd sae blindly,
Never met— or never parted,
We had ne'er been broken-hearted.

Ae Fond Kiss

কিংবা—

The wan moon is setting ayont the white wave,
And Time is setting with me. oh —

Open the Door to Me, Oh

যে পঙ্‌ক্তি দুটি সম্বন্ধে য়েট্‌স বলেছেন, "There are no lines with more melancholy beauty than these by Burns।"

য়েট্‌স সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আয়ার্ল্যাণ্ডের হৃদয় কবি য়েট্‌সের কাব্যে ব্যক্ত হয়েছে। স্কট্‌ল্যাণ্ডের হৃদয়ও ব্যক্ত হয়েছে কবি বার্নস্‌-এর কাব্যে। আর সে হৃদয় বিশ্বমানবের হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত।

# উইলিয়াম ওয়ার্ডসোয়ার্থ

১৭৭০ - ১৮৫০

This laurel greener from the brows
Of him that utter'd nothing base.

TENNYSON

ওয়ার্ডসোয়ার্থ তাঁর 'Thoughts of a Briton on the Subjugation of Switzerland' শীর্ষক বিখ্যাত সনেটে লিখেছেন—

Two Voices are there ; one is of the sea,
One of the mountains ; each a mighty Voice,
In both from age to age thou didst rejoice,
They were thy chosen music, Liberty !

জেম্‌স স্টীফেন এর যে প্যারডি করেছেন, তাও কম বিখ্যাত নয়—

Two voices are there : one is of the deep ;...
And one is of an old half-witted sheep
Which bleats articulate monotony,...
And Wordsworth, both are thine.

স্টীফেন যে দুটি স্বরের উল্লেখ করেছেন, সে দুটি স্বরই যে ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই দুটি স্বরের বৈষম্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এমন-কি কথিত আছে, কবির দেশের এক চর্মকার একজন মার্কিন পর্যটককে বলেছিল, "Wordsworth is a great poet, sir, but sometimes he is damned childish."। দুটি স্বর আছে সত্য, কিন্তু দুটি স্বরই আমাদের শোনা উচিত। যে দ্বিতীয় স্বরটি আমরা 'The Idiot Boy'

প্রভৃতি কবিতায় ও অন্যান্য অনেক উৎকৃষ্ট কবিতার নিকৃষ্ট অংশগুলিতে পাই সে স্বরটি প্রথম স্বরের মতোই ওয়ার্ডসোয়ার্থের ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর এই-সব সত্ত্বেও তিনি ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম।

১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের ৭ই এপ্রিল উত্তর ইংলণ্ডের কাম্বার্ল্যাণ্ডের অন্তর্গত ককারমাউথে উইলিয়াম ওয়ার্ডসোয়ার্থের জন্ম হয়। তাঁর বাবা জন্ ওয়ার্ডসোয়ার্থ ছিলেন অ্যাটর্নি। তাঁর মায়ের নাম অ্যান্। ওয়ার্ডসোয়ার্থদের আদি বাড়ি ছিল ইয়র্ক্শায়ারে।

১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে ওয়ার্ডসোয়ার্থের মায়ের মৃত্যু হয়। এই বছরই তাঁকে হক্স্হেডের পুরাতন গ্র্যামার স্কুলে পড়ার জন্য পাঠানো হয়। তিনি গ্রামে যে কুটীরে থাকতেন সেটিকে এখনও 'ওয়ার্ডসোয়ার্থের কুটীর' বলা হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর জন্ ওয়ার্ডসোয়ার্থ তাঁর মনের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। পাঁচ বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে ওয়ার্ডসোয়ার্থ কেম্ব্রিজের St. John's কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেছেন ও কাব্যানুরাগী হয়ে উঠেছেন। তাঁর কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় তিনি লেখাপড়ায় অনেক এগিয়েছিলেন, বিশেষ করে অঙ্কশাস্ত্রে। কলেজ-জীবনের প্রথম দিকে তাই তিনি নিজের ইচ্ছামত শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনা পড়ার ও ইতালীয় কাব্যচর্চা করার অনেক সুযোগ পেতেন।

১৭৮৭ থেকে ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ওয়ার্ডসোয়ার্থ কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন করেন। ইতিমধ্যে ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ফ্রান্সে প্রথম বেড়াতে যান। আড়াই মাস ধরে তিনি ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ড পরিদর্শন করেন। এর কিছুদিন পরে ওয়ার্ডসোয়ার্থ দ্বিতীয়বার ফ্রান্সে যান। ফ্রান্সে থাকার সময় তিনি Annette Vallon নামে একটি মহিলাকে ভালোবাসেন। তাঁদের একটি মেয়ে হয়। মেয়েটির নাম Caroline। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে রাজা ষোড়শ লুই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার কিছুদিন পরেই ওয়ার্ডসোয়ার্থ ফিরে আসেন। তখন তাঁর কিছুটা মোহভঙ্গ হলেও যে বৈপ্লবিক নব-প্রভাতকে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন তা একেবারে মন থেকে মুছে যায় নি। অভ্যুদয়ের উষালোকে বেঁচে থাকতে পারাকে তো তিনি একদিন বিশেষ সৌভাগ্য বলে মনে করেছিলেন। আর যৌবনাবস্থায় বেঁচে থাকা স্বর্গলাভের সমান।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ওয়ার্ডসোয়ার্থের 'An Evening Walk' ও 'Descriptive Sketches' প্রকাশিত হয়। এর দু বছর পরে রেস্‌ডাউনে কোল্‌রিজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে দুই বন্ধুতে সমার্‌সেট্‌শায়ারে বসবাস শুরু করেন। তাঁরা দুজন আশপাশের পাহাড়-পর্বতে ঘুরে বেড়াতেন ও কাব্যের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করতেন। ওয়ার্ডসোয়ার্থের বোন ডরোথি তাঁদের সঙ্গে থাকতেন। দুই কবিহৃদয়ের মৈত্রীর প্রথম বহিঃপ্রকাশ 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স' (১৭৯৮)। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে এই বইটির স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক দিন পরে লুপ্তপ্রায় রোমান্টিক কাব্যের সুর আবার সুস্পষ্ট ভাবে ধ্বনিত হলো এই গ্রন্থটিতে। ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শ-ঘেঁষা কৃত্রিম রীতি-নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইতিপূর্বেই ইংরেজী কবিতায় দেখা গিয়েছিল। ছোটো এই কবিতার বইটি সেই সফল বিদ্রোহের প্রথম জয়স্তম্ভ। তাই সাহিত্যের ইতিহাসে ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে নূতন রোমান্টিক যুগের সূচক বলে পরিচিত।

'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স' নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ওয়ার্ডসোয়ার্থের 'টিনটার্ন্ অ্যাবি' ও 'মাইকেল্' এবং কোল্‌রিজের 'দি এন্‌শেন্ট্ ম্যারীনার্'-এর মতো কবিতা, যেগুলিকে বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ ধরা হয়, এই গ্রন্থের অন্তর্গত। 'এ স্লাম্‌বার ডিড্ মাই স্পিরিট্ সীল্' ও 'দ্য নাইটিঙ্গেল্'-এর মতো উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র কবিতাও মণিমুক্তোর মতো ইতস্ততঃ ছড়ানো। অনেকগুলি কবিতাই স্বতন্ত্র প্রকৃতির হওয়াতে সংকলনের বৈচিত্র্য অনেক বেড়েছে। উনষাটটি কবিতার মধ্যে কিছু কিছু অপকৃষ্ট কবিতা থাকা স্বাভাবিক, তবে সেগুলি কোল্‌রিজের ভাষায় 'so many light or inferior coins in a rouleau of gold, not so much alloy in a weight of bullion'। ('Biographia Literaria', Chapter IV.)

যখন 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স'-এর পরিকল্পনা হয় তখন কোল্‌রিজের বয়স ছাব্বিশ ও ওয়ার্ডসোয়ার্থের আটাশ। বয়সে তরুণ হলেও তাঁদের অনেক কবিতাতেই পরিণতির ছাপ এসেছে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এমন কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ করা যেটির কাব্যগুলিতে পাঠক নিসর্গে ও মানব-সংসারে পরিব্যাপ্ত শাশ্বত আনন্দের সন্ধান পাবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের দিকে প্রবণতা এই গ্রন্থে পরিস্ফুট হবে না। কবিদ্বয়ের লক্ষ্য হবে আন্তরিকতাকে প্রধান স্থান দেওয়া এবং মানুষের সাধারণ ও আদিম ভাবাবেগগুলিকে সহজ

ভাবে প্রকাশ করা। লোকসাহিত্যের কবিতাকে ( ballads ) তাঁরা তাঁদের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কারণ এই কবিতার মধ্যে কৃত্রিমতা নেই, এ কবিতা স্বত-উৎসারিত। তবে তাঁদের নিজেদের কবিতাতে গীতিকাব্যের সুরও শোনা যাবে কারণ তাঁরা মূলতঃ রোমান্টিক কবি। তাই তাঁদের গ্রন্থের উপযুক্ত নাম 'লিরিক্যাল্ ব্যালাড্স্'। গ্রন্থে সংযোজিত ওয়ার্ডসোয়ার্থের ভূমিকাটিও বিশেষ মূল্যবান।

'লিরিক্যল ব্যালাড্স' প্রকাশিত হওয়ার পর ওয়ার্ডসোয়ার্থ তাঁর বোন ডরোথি ও বন্ধু কোল্‌রিজের সঙ্গে জার্মানিতে যান। সেখানে তিনি যে কয়েক মাস ছিলেন সেই কয়েক মাসে তাঁর চিন্তাধারার কোনো উল্লেখযোগ্য রূপান্তর বা তাঁর প্রতিভার কোনো বিশেষ স্ফুরণ হয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে অবকাশের আনন্দ তিনি পূর্ণভাবে উপভোগ করেছিলেন। 'Lucy Gray', 'Ruth' প্রভৃতি তাঁর এই সময়ের লেখা কবিতাগুলিতে সারল্য ও সৌন্দর্যের বিশেষ সমন্বয় দেখা যায়।

ফিরে আসার পর ওয়ার্ডসোয়ার্থ নয়নাভিরাম লেক্ ডিস্ট্রিক্টে স্থায়িভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁর বোন ডরোথিও এখানে ছিলেন। প্রথমে ওয়ার্ডসোয়ার্থ Grasmere-এর Dove Cottage-এ ছিলেন ( ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ), পরে আর্থিক উন্নতি হলে তিনি Lake Windermere-এর কাছে Rydal Mount-এ ( প্রশস্ততর গৃহে ) থাকেন। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এইখানেই ছিলেন। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ওয়ার্ডসোয়ার্থ সরকারী চাকুরি পান। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে তিনি চাকুরিতে ইস্তফা দেন।

১৮০২ খ্রীস্টাব্দে ৪ঠা অক্টোবর ডরোথির বান্ধবী Mary Hutchinson-এর সঙ্গে ওয়ার্ডসোয়ার্থের বিবাহ হয়। এঁর সম্বন্ধেই ওয়ার্ডসোয়ার্থ তাঁর সুপরিচিত 'She was a phantom of delight' কবিতাটি লিখেছেন। তাঁর বিবাহিত জীবন ছিল সুখশান্তিপূর্ণ। মেরি ছিলেন প্রিয়সঙ্গিনী ও সুগৃহিণী। তবে ডরোথি ওয়ার্ডসোয়ার্থ বা কোল্‌রিজ ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতায় যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, মেরি তা পারেন নি।

ওয়ার্ডসোয়ার্থ ছিলেন সংযত ও সরল রুচির মানুষ। সাদাসিধা বহি-র্জীবনের সঙ্গে তিনি আদর্শবাদী অন্তর্জীবন পছন্দ করতেন। উদারহৃদয় কবির অবশ্য বন্ধুর সংখ্যা বেশি ছিল না। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধুদের মধ্যে Sir George

Beaumont অন্যতম। নিজের কাব্য সম্বন্ধে অনেক চিঠি ওয়ার্ডসোয়ার্থ তাঁকে লিখেছিলেন।

কবির অন্তর্জীবনের বিকাশের ইতিবৃত্ত 'The Prelude' ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রথম লিখতে আরম্ভ করেন ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে ও শেষ করেন ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে। (তিনি ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে কাব্যটির সংশোধন করেন ও তাঁর মৃত্যুর পর এটি প্রকাশিত হয়।) এই কাব্যটি 'The Recluse' কাব্যের মুখবন্ধ-রূপে ওয়ার্ডসোয়ার্থ রচনা করেছিলেন। 'The Recluse' ওয়ার্ডসোয়ার্থ লিখে যেতে পারেন নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল, তিনি 'পৃথিবীতে প্রথম যথার্থ দর্শনমূলক কাব্য' রচনা করবেন। এর সামান্য একটু অংশ মাত্র তিনি লিখতে পেরেছিলেন, সেটি 'The Excursion' নামে পরিচিত।

'The Prelude' উদাত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত ও চতুর্দশ সর্গে বিভক্ত। সমালোচক সেলিন্‌কোর্ট গ্রন্থটির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এটিকে 'essential living document for the interpretation of Wordsworth's life and manner' রূপে বর্ণনা করেছেন। শৈশব থেকে ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মানসিক ও আত্মিক শক্তির বিকাশের যে ইতিহাস আমরা এই কাব্যে পাই তাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে— কবির বাল্য ও যৌবন, ফরাসী বিপ্লবের সময় কবির ফ্রান্সের অভিজ্ঞতা ও এই অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ারূপে নিসর্গ ও মানব-মনের নিগূঢ় সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর মরমিয়া মতবাদের উদ্ভব। কাব্যরূপে 'প্রেলিউড্'-এর মহত্ব অনস্বীকার্য। কোনো কোনো স্থানে শিল্পগত ত্রুটি রয়েছে, কিন্তু 'গুণসন্নিপাতে' সে ত্রুটি সহজেই 'নিমজ্জিত' হয়। মহাকাব্যের ধ্বনিমাধুর্য ও অর্থগৌরব অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর হয়। হার্বার্ট রীড্ যথার্থই বলেছেন, 'প্রেলিউড অনুভূতিশীল মানবের মহাকাব্য'।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডসোয়ার্থের পরিচয়ের গণ্ডি বিস্তৃত হতে থাকে। কীট্সের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ও কীট্স তাঁর ভক্ত হন। তাঁর অন্যান্য অনুরাগীদের মধ্যে Samuel Rogers, Sir Henry Taylor ও Crabb Robinson ও অক্সফোর্ডের কাব্যের অধ্যাপক John Keble-এর নাম করা যেতে পারে। দীর্ঘদিন জনগণের উপেক্ষা লাভ করার পর তাঁর শেষজীবনে ওয়ার্ডসোয়ার্থ খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিলেন। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে ওয়ার্ডসোয়ার্থ সাধারণের কাছে সুপরিচিত ছিলেন না। তাই Francis

Jeffrey তাঁর Edinburgh Review পত্রিকায় 'Excursion'-এর সমালোচনা লেখার সময় 'This will never do' দিয়ে আরম্ভ করতে দ্বিধা করেন নি। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে সাদি-র মৃত্যুর পর ওয়ার্ডসোয়ার্থকে রাজকবি পদে বরণ করা হয়। কিন্তু এর অনেক আগেই তাঁর কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা ফুরিয়ে গেছে। শেষ কয়েক বছরে তিনি ভালো কবিতা বিশেষ লিখতে পারেন নি। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে দুষ্মন্ত যখন প্রথম প্রবেশ করলেন তখন তাঁর প্রধান অনুভূতি হয়েছিল আশ্রমের শান্ত পরিবেশের। তাই প্রবেশের পর তাঁর প্রথম উক্তি হচ্ছে—'শান্তমিদমাশ্রমপদম্'। ওয়ার্ডসোয়ার্থের কাব্যজগতে প্রথম প্রবেশেই আমাদেরও প্রধান অনুভূতি হয় শান্তরসের ও দুষ্মন্তের উক্তির ব্যঙ্গ্য অর্থে প্রতিধ্বনি করতে ইচ্ছা হয়। ওয়ার্ডসোয়ার্থ নিজেই তাঁর Hart-Leap Well কবিতায় বলেছেন—

The moving accident is not my trade ;
To freeze the blood I have no ready arts :
'Tis my delight, alone in summer shade,
To pipe a simple song for thinking hearts.

সোনার তরী কাব্যের 'পুরস্কার' কবিতার কবির মতো ওয়ার্ডসোয়ার্থও যেন তাঁর জীবনদেবতাকে বলেছেন—

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি,
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি,
পুষ্পের মতো সংগীতগুলি
ফুটাই আকাশভালে।

কাব্যের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে 'লিরিক্যাল ব্যালাড্স'-এর ভূমিকায় ওয়ার্ডসোয়ার্থ লিখেছেন— ভাবাবেগ শান্তিতে সমাহিত হলে কাব্যের উৎপত্তি হয়। এ কথা অন্তত তাঁর নিজের কবিতা সম্বন্ধে বেশ প্রযোজ্য।

প্রকৃতির পরিণত-কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থের কাছে প্রকৃতির স্থির গম্ভীর ভাবের আবেদনের মতো এত মর্মস্পর্শী আর কিছু নেই। এ কথা তিনি অনেক কবিতায় অনেক বার বলেছেন, তবে 'Lines composed a few miles above Tintern Abbey' কবিতায় যত সহজ ও সুললিতভাবে বলেছেন এমন বোধ হয়

আর কোথাও নয়। বাল্যকালে তিনি অন্যান্য ছেলেদের মতোই খেলাধুলা ও ছুটাছুটি করে স্থূল আনন্দ পেয়েছেন। প্রকৃতির কোনো সৌন্দর্য সম্পর্কে কোনো বিশেষ সচেতনতা তাঁর ছিল না। তার পর যৌবনোন্মেষে ওয়ার্ডসোয়ার্থ যখন প্রথম প্রকৃতির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে আকৃষ্ট হলেন তখন সে আকর্ষণের মূলে ছিল উদ্দামতা ও আবেগ। কারণ প্রকৃতি তখন তাঁর কাছে সর্বস্ব। ধ্বনিমুখর জলপ্রপাত কামনার ধনের মতো তাঁর হৃদয়কে উদ্‌বেল করে তুলত। উঁচু পাহাড়, পর্বত, ঘন কালো বন, তাদের রঙ, তাদের আকার, এই-সবের জন্য তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে উঠতেন। এই মনোভাবের পূর্ণতার জন্য কোনো মানসমাধুরীর প্রয়োজন ছিল না, কিংবা কোনো দৃষ্টিরাগশূন্য আকর্ষণের।

তার পর কালের গতিতে এই যন্ত্রণাময় আনন্দ ও এই বিভ্রান্তিকর উল্লাস একদিন হারিয়ে গেল। কিন্তু এর জন্য তাঁর কোনো খেদ নেই, কোনো অনুযোগ নেই। অন্যান্য সম্পদে লাভবান হয়ে এই ক্ষতির জন্য তিনি যথেষ্ট পুরস্কার পেয়েছেন। কারণ তিনি প্রকৃতিকে দেখতে শিখেছেন, যে ভাবে অপরিণতবুদ্ধি যৌবনে দেখতেন সে ভাবে নয়; কিন্তু অনেক সময়েই তিনি মানবতার স্থির বিষণ্ণ ঝর্ঝর-সংগীত শুনেছেন, বেসুর নয়, কর্কশ নয়, যদিও প্রচুর শক্তি রয়েছে পবিত্র করার ও শান্ত করার। আর তিনি এমন এক উপস্থিতি উপলব্ধি করেছেন যা তাঁকে উন্নত চিন্তার আনন্দে চঞ্চল করে। আরো অনেক বেশি গভীরভাবে অনুস্যূত কোনো জিনিসের মহতী অনুভূতি, যার আবাস হল অস্তোন্মুখ রবির রশ্মি-আভা, এবং বিশাল সমুদ্র আর প্রাণময় বাতাস, এবং সুনীল আকাশ আর মানুষের মনে; একটা গতি আর একটা চেতনা, যা সমস্ত চিন্তাশীল জিনিসকে, সমস্ত চিন্তার সমস্ত বিষয়বস্তুকে, অনুপ্রাণিত করে এবং সমস্ত জিনিসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। তাই তিনি ভালোবাসেন প্রান্তর ও অরণ্যকে এবং পর্বতকে; আর শ্যামলা এ ধরণীতে থেকে যা কিছু দেখা যায় সে সমস্তকে— চক্ষু ও কর্ণের সমস্ত বিশাল জগৎকে যা তারা অর্ধেকটা সৃষ্টি করে এবং যা তারা অনুভব করে দুই-ই। নিজের মনের পবিত্রতম চিন্তার প্রধান আশ্রয়, নিজের হৃদয়ের ধাত্রী, পরিচালক ও অভিভাবক এবং নিজের সমস্ত চিন্ময় প্রাণের অন্তরাত্মাকে প্রকৃতিতে ও ইন্দ্রিয়ের ভাষার মধ্যে চিনে নিতে পেরে তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠেছে।

জগৎ জুড়ে উদার সুরে যে আনন্দ গান বেজে চলেছে তার ধ্বনি ওয়ার্ড-

সোয়ার্থের হৃদয়ে গভীর অনুরণন জাগিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—'বিশ্বের সঙ্গে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ সংঘাতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যসংগীত বাজিয়া উঠিয়াছিল।' প্রকৃতির মধ্যে ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রাণের সাড়া পেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতির প্রাণের সঙ্গে মানুষের মন একতানে বাঁধা যায়। মানুষের হৃদয়তন্ত্রী যদি প্রকৃতির সুরে বাজে, তা হলে মানুষ জীবনের যথার্থ সার্থকতা খুঁজে পায়। তখন সেই পরম লগ্নে জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখের রহস্যকে আর অতটা ভার বলে মনে হয় না। তখন এই সমস্ত দুর্বোধ্য জগতের গুরু ও ক্লান্ত চাপ লঘু হয়ে আসে। সেই শান্ত ও পুণ্য অনুভূতির প্রভাবে ধীরে ধীরে আমাদের অন্নময় প্রাণ প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়, আমাদের দেহ ঘুমিয়ে পড়ে, আমরা জাগ্রত আত্মায় রূপান্তরিত হই। সুরসঙ্গতির শক্তিতে ও আনন্দের গভীর শক্তিতে যে নয়ন স্থির ও অচপল হয়ে উঠেছে তাই দিয়ে আমরা সব কিছুর প্রাণকেন্দ্রে দৃষ্টিপাত করি।

প্রকৃতির মধ্যে ওয়ার্ডসোয়ার্থ শান্তি, সৌন্দর্য ও ঐশী-শক্তির প্রকাশ খুঁজে পেয়েছিলেন। প্রকৃতির চেতন প্রাণ আনন্দ ও ভালোবাসা অনুভব করতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। 'Lines Written in Early Spring' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

> And 'tis my faith that every flower
> Enjoys the air it breathes.

'The Leech-Gatherer, or, Resolution and Independence' কবিতাতেও আমরা দেখি—

> All things that love the sun are out of doors ;
> The sky rejoices in the morning's birth.

নিসর্গ-শোভার নিছক নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনা যে ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতায় একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু সেটা ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতার সম্পূর্ণ গৌণ অঙ্গ। এই দিক থেকে কীট্‌স বা টেনিসনের সঙ্গে ওয়ার্ডসোয়ার্থের পার্থক্য সুস্পষ্ট। কীট্‌স বা টেনিসন যখন নিসর্গের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের বিশ্লেষণে ব্যস্ত তখন ওয়ার্ডসোয়ার্থের সমস্ত মন ভাব ও কল্পনার সাহায্যে নিসর্গের মধ্যে অতীন্দ্রিয় বাণীর সন্ধানে মগ্ন।

আর সে বাণী শুধু গিরিকন্দরে বা সমুদ্রবক্ষে লুকিয়ে নেই। সে বাণী

ছড়িয়ে রয়েছে— ডেজি বা ড্যাফোডিল বা সেলান্‌ডাইনের মতো সাধারণ ফুলের হাসিতে, কোকিলের ডাকে, লিনেট্‌ পাখির গানে, প্রজাপতির পাখায়। আকাশে রামধনু দেখে চিরদিন তাঁর হৃদয় নেচে উঠেছে। যা ক্ষুদ্র, যা তুচ্ছ, যা সাধারণ, যা প্রাত্যহিক পরিচয়ে ক্লিষ্ট, সে-সব জিনিস ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতায় কল্পনার আলোয় অপরূপভাবে ফুটেছে। যা বিরাট, যা বিশাল, যা অনন্ত শুধু সেইটাই ওয়ার্ডসোয়ার্থের উপাস্য নয়। ক্ষুদ্রের মধ্যে তিনি মহৎকে দেখেছেন, সীমার মাঝে ভূমার পূজা করেছেন। 'The Tables Turned' কবিতায় বলেছেন—

...Let Nature be your Teacher.

She has a world of ready wealth,
Our minds and hearts to bless—
Spontaneous wisdom breathed by health,
Truth breathed by cheerfulness.

One impulse from a vernal wood
May teach you more of man,
Of moral evil and of good,
Than all the sages can.

ইংরেজী সাহিত্যের নিসর্গ-কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডসোয়ার্থের স্থান পুরোভাগে। 'The Prelude', 'The Excursion', 'Lines Written a Few Miles above Tintern Abbey', 'Ode on Intimations of Immortality from Recollection of Early Childhood', 'Lucy'-সম্পর্কিত পাঁচটি খণ্ডকবিতা ( যেগুলি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতার মধ্যে স্থান পাবে ), 'The world is too much with us' ( এটি চতুর্দশপদী কবিতা— সনেট্‌-লেখকরূপে ইংরেজী সাহিত্যে ওয়ার্ডসোয়ার্থের বিশিষ্ট স্থান আছে ), 'Yarrow Visited' প্রভৃতি কবিতা ওয়ার্ডসোয়ার্থের শ্রেষ্ঠ নিসর্গ-কবিতার মধ্যে পড়ে।

শুধু বিশ্ব-নিখিলের প্রাকৃতিক শোভা ও আধ্যাত্মিক বাণী নিয়ে ওয়ার্ডসোয়ার্থ জীবন কাটিয়ে দেন নি। মানুষের সুখ-দুঃখের ঢেউ তাঁর মনে বার বার আঘাত করেছে। ওয়ার্ডসোয়ার্থ নিজেই তাঁর 'The Prelude' কাব্যে বলেছেন—

My theme
No other than the very heart of man.

সবার উপরে তিনি মানুষকে স্থান দেন নি, সে স্থান প্রকৃতির জন্য সংরক্ষিত। অবশ্য এক অর্থে ওয়ার্ডসোয়ার্থের কাছে মানুষও প্রকৃতির অঙ্গ। প্রাচীন আর্য ঋষির কাছে যেমন, এ যুগের রবীন্দ্রনাথের কাছে যেমন, ওয়ার্ডসোয়ার্থের কাছেও তেমন চেতন অচেতন পরিদৃশ্যমান সব কিছুই ঐশী লীলার প্রকাশ।

এক সময় তাঁর জীবনে এসেছিল যখন ওয়ার্ডসোয়ার্থ মানুষকে প্রায় সর্বোচ্চ আসন দিয়েছিলেন। তখন ফরাসী-বিপ্লবের সময়। স্বাধীনতা, মৈত্রী ও সাম্যের বাণীতে পাশ্চাত্ত্য জগৎ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। ওয়ার্ডসোয়ার্থ তখন মানুষের মহিমার উপলব্ধিতে আনন্দমগ্ন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন ফ্রান্সের কাছে স্বাধীনতার চেয়ে নেপোলিয়নের মূল্য বেশি তখন তিনি মনে নিদারুণ আঘাত পেলেন। পরে নিসর্গের মধ্যে তিনি আশাভঙ্গের সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে ওয়ার্ডসোয়ার্থ রক্ষণশীল হয়ে পড়েছিলেন এবং এইজন্য ব্রাউনিঙ তাঁকে 'ভ্রষ্ট নেতা' বলে অভিহিত করেন।

'Michael', 'The Leech-Gatherer, or Resolution and Independence' প্রভৃতি কবিতায় রোমান্টিক মানবতাবাদের প্রকাশ রয়েছে। Hazlitt তাঁর 'Spirit of the Age'-এ বলেছেন— He sees nothing loftier than human hopes, nothing deeper than the human heart সাধারণমানুষের সরল অনুভূতিগুলি ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতায় নূতন রূপ পেয়েছে। মানুষকে তিনি যে মর্যাদা দিয়েছেন, তা নরনারী, ধনী-দরিদ্র, যুবক-বৃদ্ধ, শিশু-কিশোর-নির্বিশেষে দিয়েছেন। একাকিনী যে সাধারণ মেয়ে শস্যক্ষেত্রে গান গেয়েছে, কিংবা শহরের পথে পাখির গানে উতলা হয়ে দিবাস্বপ্নের জাল বুনেছে, কিংবা যে শিকারী বৃদ্ধবয়সে অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে, কিংবা যে জরাজীর্ণ ভিক্ষুক সঙ্গীহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই-সব সামান্য জনের কথা দরদ দিয়ে লিখে ওয়ার্ডসোয়ার্থ অসামান্য করে তুলেছেন। মানুষের দুঃখের মূলে যে অনেক সময় মানুষের অবিচার, নির্বুদ্ধিতা ও দুষ্টতা থাকে, সে কথা ভেবে বারংবার কবি ব্যথিত হয়েছেন—

To her fair works did Nature link
The human soul that through me ran ;

And much it grieved my heart to think
What man has made of man.

Lines Written in Early Spring

মানুষের শক্তি কম নয়। বহু কবিতায় ওয়ার্ডসোয়ার্থ মানুষের অপরাজেয় মনের জয়গান গেয়েছেন। মেষপালক মাইকেলের যে চরিত্র তিনি 'Michael' কবিতায় এঁকেছেন তাতে সত্যের সঙ্গে সারল্য ও দৃঢ়তার সমন্বয় সমস্ত কবিতাটিতে ট্র্যাজিক স্থর এনেছে। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানুষকে সংগ্রাম করতে হবে—

Farewell, farewell the heart that lives alone,
Housed, in a dream, at distance from the Kind !
Such happiness, wherever it be known,
Is to be pitied ; for 'tis surely blind.

But welcome fortitude, and patient cheer,
And frequent sights of what is to be borne !
Such sights, or worse, as are before me here.—
Not without hope we suffer and we mourn.

Elegiac stanzas, suggested by a picture of Peele
Castle, in a storm, painted by Sir George Beaumont.

আর নৈতিক বিধিও যে উপেক্ষা করলে চলবে না সে কথা 'Ode to Duty', 'Character of the Happy Warrior' প্রভৃতি কবিতায় ওয়ার্ডসোয়ার্থ উদাত্ত ভাষায় আমাদের জানিয়েছেন।

'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স' গ্রন্থে সংযোজিত ভূমিকা-দুটিতে ওয়ার্ডসোয়ার্থ সেই সময়কার কবিতায় প্রচলিত বিশেষ ধরনের কাব্যিক ভাষার কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর নিজের রচনাগুলির সত্য নিরূপণ করেছেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য হল, প্রথমতঃ ছকে-বাঁধা কেতাবী শব্দসমষ্টি কবিতায় পরিত্যাগ করতে হবে এবং সাধারণ মানুষেরা, এমন-কি কৃষকেরাও, যখন সজীবভাবে ও আবেগের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তখন যে ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, ভালো গদ্যের সঙ্গে ভালো কবিতার ভাষার কোনো পার্থক্য নেই। কোনো কোনো দিক থেকে যদিও ওয়ার্ডসোয়ার্থের

মতবাদে আতিশয্য দোষ রয়েছে ( এবং কোল্‌রিজ প্রমুখ সমালোচকেরা এইজন্য ওয়ার্ডসোয়ার্থের কঠোর সমালোচনা করেছেন ), এই ভূমিকাগুলিতে যে অনেক মূল্যবান উক্তি রয়েছে সে কথা স্বীকার করতে হবে।

মিল্টন ও বার্নস্‌ ছিলেন ওয়ার্ডসোয়ার্থের প্রিয় লেখকদের অন্যতম। তাঁদের প্রভাব তাঁর লেখায় প্রায়ই চোখে পড়ে। তাঁর অনেক পঙ্‌ক্তিই আমাদের মিল্টনের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু মিল্টনের মতো তাঁর নিজস্ব কাব্যশৈলী নেই। নিজস্ব শৈলীর যেখানে চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানে অনেক সময় ফল হয়েছে বাগাড়ম্বর। তাই বলা হয়েছে — He has no style. এটা ম্যাথিউ আর্নল্ডের কথা। তিনি অবশ্য নিজেই বলেছেন—

But Wordsworth's poetry, when he is at his best, is inevitable, as inevitable as Nature herself. It might seem that Nature not only gave him the matter for his poem, but wrote his poem for him.

প্রথমেই বলা হয়েছে, ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতায় ত্রুটিবিচ্যুতির অভাব নেই। অহমিকার আতিশয্য তাঁর কবিতার অনেক স্থানে উদ্‌বেজক হয়ে উঠেছে। প্রেমের কবিতা তিনি লেখেন নি বললেই চলে। হাস্যরসের অনুভূতির অভাবও লক্ষ্য করার বিষয়। প্রকৃতির অনেক বিশাল বর্ণাঢ্য দিক তাঁর কবিতায় রূপ পায় নি। প্রকৃতির মঙ্গলরূপ নিয়ে তাঁর ব্যাকুলতা, প্রকৃতির রুদ্ররূপ তাঁর দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষণ করে নি। অনেক কিছু ওয়ার্ডসোয়ার্থে নেই, কিন্তু যা আছে তা একান্তই অসামান্য ও দুর্লভ। William Watson-এর Wordsworth's Grave কবিতার কথা মনে পড়ে—

Not Milton's keen, translunar music thine ;
    Not Shakespeare's cloudless, boundless human view ;
Not Shelley's flush of rose on peaks divine ;
    Nor yet the wizard twilight Coleridge knew.
What hadst thou that could make so large amends
    For all thou hadst not and thy peers possessed,
Motion and fire, swift means to radiant ends ?—
    Thou hadst, for weary feet, the gift of rest.

# স্যামুএল টেলর কোল্‌রিজ

১৭৭২ - ১৮৩৪

His genius... had angelic wings, and fed on manna.

HAZLITT

কোল্‌রিজ তাঁর 'Biographia Literaria' গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায়ে শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে 'myriad-minded' বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। এ কথাটি অবশ্য সম্পূর্ণরূপে তাঁর সৃষ্টি নয়। একজন গ্রীক সাধুর এই কথাটির প্রথম প্রয়োগ থেকে তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন। কথাটি শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে খুব সুন্দরভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। কোল্‌রিজ সম্বন্ধেও আমরা কথাটি ব্যবহার করতে পারি। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা নানাদিকে বিকশিত হয়েছিল, যদিও অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণ বিকাশ ব্যাহত হয়েছিল। তাঁর সুহৃদ চার্লস ল্যাম তাঁকে 'Logician, Metaphysician, Bard!' বলে সম্বোধন করেছেন। কবিত্বশক্তি ও দার্শনিক প্রজ্ঞার এমন মণিকাঞ্চনযোগ সাহিত্যের ইতিহাসে কমই দেখা যায়।

ডেভনশায়ার-এর অন্তর্গত Ottery St. Mary-তে ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের ২১শে অক্টোবর এক দরিদ্র পরিবারের চতুর্দশ সন্তানরূপে কোল্‌রিজের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন ধর্মযাজক। বাল্যাবস্থাতে কোল্‌রিজ পিতৃহীন হন। দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বিখ্যাত আবাসিক বিদ্যালয় Christ's Hospital-এ কোল্‌রিজের শিক্ষা আরম্ভ হয়। (এই প্রসঙ্গে ল্যাম-এর Christ's Hospital রচনাটি স্মরণীয়।) বিদ্যালয়-জীবন ছিল কঠিন শাসনে বাঁধা। লেখাপড়ার অবহেলার বিধান ছিল কঠোর শাস্তি। ছাত্রদের জন্য যে খাদ্য বরাদ্দ ছিল তা ছিল যেমন অপর্যাপ্ত তেমন নিকৃষ্ট। মাঝে মাঝে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের একদিনের জন্য ছুটি দেওয়া হত। কোল্‌রিজের মতো গৃহহীন ও

বন্ধুহীন ছেলেদের কাছে এই ছুটির দিনগুলি আনন্দের পরিবর্তে বিভীষিকার সৃষ্টি করত। আবহাওয়া ভালো থাকলে ছুটির দিনে কোল্‌রিজ অনেকক্ষণ New River নদীতে সন্তরণ করতেন, তার পর তীরে বসে রৌদ্র উপভোগ করতেন। কিন্তু বেশি ঠাণ্ডা পড়লে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো কিংবা বাজারের এক কোণে একলা দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকত না। এই-সব সত্ত্বেও কোল্‌রিজ বিদ্যালয়-জীবন মোটামুটি খুশি মনেই কাটিয়েছেন। কারণ তিনি কল্পলোকেই অনেক সময় কাটিয়ে দিতেন এবং তখন বাস্তব জগতের কোনো সমস্যাই তাঁকে পীড়িত করতে পারত না। বই পড়ার ঝোঁক তাঁর খুব বেশি ছিল এবং স্থানীয় সাধারণ পাঠাগার থেকে বই নিয়ে তিনি এক দিনে দুখানা করে বই শেষ করতেন। যখন ডাক্তারী বই পড়তেন তখন ভাবতেন তাঁকে চিকিৎসক হতেই হবে। আবার দর্শনের বই পড়তে পড়তে ভাবতেন দার্শনিক হতে না পারলে জীবনটাই বৃথা।

আঠারো বছর বয়সে কোল্‌রিজ কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হন। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনও মানসিক অস্থিরতার মধ্যে কেটেছে। মুখের অন্যান্য অংশের তুলনায় তাঁর চোখ ছিল অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল। পোশাক-পরিচ্ছদে অযত্নের ছাপ ছিল সুস্পষ্ট।

কেম্‌ব্রিজে থাকার দ্বিতীয় বছরে তিনি কলেজ থেকে পালিয়ে গিয়ে অশ্বারোহী সেনাদলে নাম লেখান ( অশ্বারোহণে তিনি অবশ্য ছিলেন অপটু )। নিজের পরিচয় দেন একটা কাল্পনিক নামে— Silus Titus Comberback। কিছুদিন পরে কোল্‌রিজ ধরা পড়ে যান ও তাঁকে আবার কেম্‌ব্রিজে ফিরে যেতে হয়।

ছাত্রাবস্থায় অক্সফোর্ডে বেড়াতে গিয়ে কোল্‌রিজের রবার্ট সাদি-র সঙ্গে আলাপ হয়। এর কিছুদিন পরেই সাদি তাঁর বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনী এডিথ ফ্রিকারের সঙ্গে কোল্‌রিজের পরিচয় করিয়ে দেন। অল্পদিনের মধ্যে এঁর বড়ো বোন সারা ফ্রিকারকে কোল্‌রিজ ভালোবাসেন। সাদি ও কোল্‌রিজ দুজনেরই বিবাহ করার জন্য অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। দুই কবি-বন্ধুতে মিলে স্থির করলেন, আমেরিকায় গিয়ে Pennsylvania রাজ্যের Susquehanna নদীর ধারে প্লেটোর Republic-এর মতো সমস্ত মানবজাতির জন্য এক নূতন আদর্শ সমাজ গঠন করবেন। এই নূতন তন্ত্রের নাম হবে Pantisocracy। কুড়ি হাজারের

মতো টাকা সংগ্রহ করলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তাঁরা ভেবেছিলেন এই অর্থ সংগ্রহ করার কাজ মোটেই কঠিন হবে না। কিন্তু দেখা গেল, পার্থিব স্বর্গরাজ্যে যেতে ইচ্ছুক লোকের সংখ্যা অনেক হলেও অর্থের ব্যাপারে আনুকূল্য বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং স্বর্গরাজ্য গড়ার কল্পনা স্বপ্নই থেকে গেল, বাস্তবে রূপায়িত হল না।

কোল্‌রিজের প্রথম কবিতার বই এই সময় প্রকাশিত হয়। এর জন্য কোল্‌রিজ সাত-আটশো টাকা পান। এই টাকা বিশ্বজনের জন্য স্বর্গরাজ্য গড়ার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর হলেও দুটি প্রাণীর সুখনীড় রচনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ডিগ্রী না নিয়েই কোল্‌রিজ কলেজ ছেড়ে দিলেন। সাদি এডিথ ফ্রিকারকে বিবাহ করলেন। সারা ফ্রিকারকে বিবাহ করে কোল্‌রিজ Bristol-এর একটি কুটীরে গার্হস্থ্য জীবন আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কোল্‌রিজের দাম্পত্য জীবন খুব সুখের হয় নি। তবে তার জন্য কোল্‌রিজের নিজের দায়িত্ব কম নয়।

কোল্‌রিজ ভেবেছিলেন লেখকরূপেই জীবিকা নির্বাহ করবেন। তাঁর উদ্যোগে The Watchman নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হল। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল সত্যের প্রচারের দ্বারা হৃদয়ের প্রসার। সাধারণ পাঠকেরা পত্রিকায় যে-সব জিনিস খোঁজেন সেই-সব বিষয় উপেক্ষা করে নিজে যা ভালো মনে করেন সেই-সব ধরনের রচনা দিয়ে কোল্‌রিজ তাঁর পত্রিকার পৃষ্ঠা পূর্ণ করতে লাগলেন। গ্রাহকেরা একে একে বিরূপ হয়ে উঠলেন। দশখানি সংখ্যার পর The Watchman-এর প্রকাশ বন্ধ হল। কোল্‌রিজ যেখানে থাকতেন তার মাত্র তিন মাইল দূরে থাকতেন আর-একজন তরুণ ভাবুক উইলিয়াম ওয়ার্ডসোয়ার্থ। দুই কবির পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হয়। প্রায়ই তাঁরা দুজনে এক সঙ্গে কাটাতেন। শহর থেকে দূরে নির্জন পথে-প্রান্তরে তাঁরা অনেক বেড়াতেন এবং কাব্য ও কাব্যাতিরিক্ত অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন ও স্বপ্ন দেখতেন। ওয়ার্ডসোয়ার্থের বোন ডরোথি ওয়ার্ডসোয়ার্থ অনেক সময় তাঁদের সঙ্গে থাকতেন।

১৭৯৭ সালে দুই বন্ধুতে যুগান্তকারী 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স' কাব্যগ্রন্থের পরিকল্পনা করেন ও পরের বছর সেটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি ইংরাজী সাহিত্যে নবযুগের প্রথম সুস্পষ্ট সূচনা ও এর প্রকাশের বছর থেকে সাধারণতঃ নূতন

রোমাণ্টিক যুগের সূত্রপাত ধরা হয়। এই গ্রন্থটিতে দুই কবিরই কবিতা রয়েছে, কিন্তু কবিদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। কোল্‌রিজ নিজেই 'Biographia Literaria' গ্রন্থে লিখেছেন যে তিনি চেয়েছিলেন তাঁর 'প্রচেষ্টা অতিপ্রাকৃত, অন্ততঃ রোমাণ্টিক, ব্যক্তি ও চরিত্রের প্রতি চালিত হবে; তবুও এমনভাবে যাতে আমাদের অন্তঃপ্রকৃতি থেকে একটা পর্যাপ্ত মানবিক রস ও সত্যের আভাস সঞ্চারিত হয় যার ফলে এই কল্পনার ছায়ামূর্তিগুলির নিমিত্ত— বিশেষ ক্ষণের জন্য সেই অপ্রত্যয়ের ইচ্ছাকৃত অপসারণ, যা হচ্ছে কাব্যধর্ম— আহরণ করা যায়।'

ওয়ার্ডসোয়ার্থদের সঙ্গে জার্মানীতে বেড়াতে যাওয়া কোল্‌রিজের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এখানকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছুদিন দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দেড় মাসের মধ্যে তিনি জার্মান ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন ও শিলার-এর Wallenstein নাটকের শেষ দুই খণ্ডের অনুবাদ করেন। পরবর্তী জীবনে কাণ্ট্ ও অন্যান্য জার্মান দার্শনিকের রচনাবলী তাঁর চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর কবিজীবনের সবচেয়ে সমৃদ্ধ সময় গেছে ১৭৯৭ থেকে ১৮০৩ সাল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই কোল্‌রিজের শরীর ভাঙতে আরম্ভ করে। বাতব্যাধির নিদারুণ যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার আর কোনো উপায় না পেয়ে তিনি অহিফেন সেবন আরম্ভ করেন। এই অহিফেনই তাঁর কাল হল। প্রথম প্রথম অহিফেন মন্ত্রের মতো কাজ করত, অসুখের সব যন্ত্রণা চলে যেত। তার পর দিন পনেরো পরে যখন এটায় তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেলেন তখন আর এতে কোনো কাজ হত না। কিন্তু অভ্যাস তখন নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। অহিফেন না হলে তাঁর চলত না, ক্রমে তিনি অহিফেনের দাস হয়ে পড়লেন। অসুখের যন্ত্রণার সঙ্গে নেশার জালা তাঁকে অস্থির করে তুলল। অহিফেনের মাদক-বিষে তাঁর দেহ মন জর্জরিত হল। অসামান্য প্রতিভার অবক্ষয়ের সূচনা হল। তিনি নিজেই 'ডিজেকশন: অ্যান ওড্' কবিতায় এই ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা করেছেন—

But now afflictions bow me down to earth:
Nor care I that they rob me of my mirth;
    But oh, each visitation

Suspends what Nature gave me at my birth,
My shaping spirit of Imagination.

কোল্‌রিজের বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনেরা এই অভ্যাসের শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। কোল্‌রিজ নিজেও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কিছুদিনের জন্য মাঝে মাঝে সাময়িক বিরতি ছাড়া আর কিছু হয় নি। ক্বচিৎ কখনো তাঁর শরীর অল্পদিনের জন্য ভালো হয়েছে, তিনি মনের প্রফুল্লতা ফিরে পেয়েছেন। এ ছাড়া তাঁর বাকি জীবনের সবটাই মোটামুটি নিরবচ্ছিন্ন বিষণ্ণতায় কেটেছে। কখনো কখনো তীব্র আত্মগ্লানিতে তিনি অভিভূত হয়েছেন। তাঁর এক বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুকে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন— In that one crime of opium, what crimes have I not made myself guilty of — ingratitude to my Maker, and to my benefactors— injustice and unnatural cruelty to my children, self-contempt for my rejected promise— breach, nay, too often falsehood.

তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিতে অবশ্য মালিন্য আসে নি। তাঁর কবিত্বশক্তিও মাঝে মাঝে অদ্ভুত জ্যোতিতে স্ফুরিত হয়েছে। কিন্তু একাগ্রতা ও মনঃসংযোগের ক্ষমতা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেছে। ১৮০৯ সালে কোল্‌রিজ দর্শন ও রাজনীতি-বিষয়ক পত্রিকা The Friend সম্পাদনা করেন। তবে সে কেবল কয়েক মাসের জন্য। মল্টা ও ইটালিতে গিয়েও কোল্‌রিজ স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারেন নি। বন্ধুদের বিশেষ অনুরোধে তিনি লণ্ডনে কয়েকটা বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলি সমাদৃত হয়েছিল। পরে তিনি আরো কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এইগুলি ছিল শেক্সপীয়ার ও মিল্টন সম্বন্ধে। বক্তৃতার জন্য তাঁর কোনোরকম পূর্বপ্রস্তুতি থাকত না, অথচ তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে যেতেন এবং শ্রোতৃবৃন্দকে তাঁর চিন্তার গভীরতায় ও ভাষার সৌষ্ঠবে মোহিত করে রাখতেন। ১৮২৫ সালে তাঁর 'এড্‌স টু রিফ্লেকশন' প্রকাশিত হয়। এর প্রথমটি ইংরাজদের জার্মান চিন্তার পরিচয় দিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মনোমালিন্য, অর্থের জন্য দুশ্চিন্তা ইত্যাদিতে ১৮১৯ সালে কোল্‌রিজের মনের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। তার উপর তিনি নূতন আঘাত পেলেন। লেখাপড়ায় পুত্র হার্টলের কৃতিত্ব কোল্‌রিজের খুব আনন্দ ও গর্বের বিষয় ছিল। এই বছর হার্টলেকে অমিতাচারের জন্য অক্সফোর্ড

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। পুত্রের অধঃপতনের মূলে পৈত্রিক চিত্ত-দৌর্বল্য প্রতিফলিত দেখে কোল্‌রিজ মর্মপীড়া অনুভব করলেন। তাঁর স্বাস্থ্য আরো খারাপ হল, তিনি অহিফেনের নেশায় আরো বেশি অভিভূত হলেন। ১৮১৯ সাল থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি ভগ্নস্বাস্থ্যে কাটিয়েছেন। মাঝে মাঝে কিছু শারীরিক উন্নতি হয়েছে বটে কিন্তু তা স্বল্পস্থায়ী। সাহিত্য-সাধনার পালা সাঙ্গ হয়ে গেছে। জীবনের শেষ দশ বছর অসাধারন প্রতিভা-বান কথকরূপে তিনি সমধিক পরিচিত। কোল্‌রিজ হাইগেটে থাকার সময় প্রতি বৃহস্পতিবার বহু লোক তাঁর কথা শুনতে আসতেন। এঁদের মধ্যে সেই সময়কার অনেক মনীষীও ছিলেন। বিচিত্র স্খলিত কণ্ঠে তিনি নানা বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতেন। ১৮৩০ থেকে ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত কোল্‌রিজ প্রায় শয্যাগত ছিলেন। এই সময় হ্যারিয়েট মার্টিনো, এমার্সন প্রভৃতি অনেকে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৮১৬ সালের পর থেকে জেম্‌স গিলম্যান নামে একজন উদারচেতা চিকিৎসক হাইগেটে কোল্‌রিজের সযত্ন পরিচর্যা করেন।

অনেক দিন আগে থেকেই কোল্‌রিজ মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন। ১৮৩৩ সালে তিনি নিজের সমাধিলিপি রচনা করেন—

Beneath this sod
A poet lies or that which once seemed he.
O, lift one thought in prayer to S. T. C. ;
That he who many a year with toil of breath
Found death in life, may here find life in death !

১৮৩৪ সালে ২৫শে জুলাই সকাল সাড়ে ছটার সময় কোল্‌রিজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এর এক মুহূর্ত পরে ঘরের কোণে রাখা হাস্‌নুহানা ফুটে উঠল। সারা ঘর হল সুরভি-বিধুর।

চিন্তাশীলতার দিক থেকে কোল্‌রিজের মহত্ত্ব কতখানি সেটা বিতর্কের বিষয় হলেও তাঁর অলোকসাধারণ ব্যক্তিত্ব অবিসংবাদিত। তীক্ষ্ণ কল্পনা-শক্তি, সূক্ষ্ম হাস্যরসানুভূতি, প্রখর বিচার-বোধ, বন্ধুত্ব করার আশ্চর্য ক্ষমতা, সাহিত্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সাহিত্যের জন্য প্রগাঢ় অনুরাগ— এইসব গুণাবলী তাঁর ব্যক্তিত্বকে রমণীয় করে তুলেছিল। তাঁর চারিত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে তিনি

ছিলেন মহাপ্রাণ। তাঁর মৃত্যুতে অনেকেই মর্মাহত হয়েছিলেন। চার্লস লাম বন্ধু-বিয়োগের শোক কোনোদিন কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কথাবার্তা কইতে কইতে মাঝে মাঝে 'কোল্‌রিজ আর নেই' বলে তিনি আর্ত চীৎকার করে উঠতেন। কয়েক মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। কোল্‌রিজের মৃত্যু-সংবাদ শুনে ওয়ার্ডসোয়ার্থ অস্ফুটোক্তি করেছিলেন— 'He was the most wonderful man that I have ever known।'

কাব্যলক্ষীকে কোল্‌রিজ আজীবন সমগ্র হৃদয় দিয়ে অর্চনা করেন নি। জীবনের উত্তরার্ধে তিনি রাজনীতি, সমালোচনা এবং ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত বিষয়েই বেশি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শুধু প্রথম যৌবনে তিনি ছিলেন কাব্য-লক্ষীর একনিষ্ঠ পূজারী। কবিতা কোল্‌রিজ বেশি লেখেন নি। কিন্তু যা লিখেছেন তার শিল্পমূল্য অসামান্য। তাঁর রচনাবলী কতকগুলি খণ্ডের সমষ্টি-রূপেই আমাদের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করে, পরিপূর্ণের সুষমা বিশেষ চোখে পড়ে না। তাঁর লেখায় আছে হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি। ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতার যে জ্যোতি তা কোনোদিন জলে স্থলে ছিল না। না থাকলেও সে আলোর সঙ্গে পৃথিবীর গন্ধ জড়ানো আছে। কোল্‌রিজের লেখায় যে আলোর ঝল্‌কানি অপার্থিব তার দ্যুতি। যে বর্ণবিন্যাসে তাঁর কবিতা অপরূপ হয়ে উঠেছে সে রঙে কল্পলোকের ইন্দ্রধনুর প্রতিচ্ছবি। যে অমর্ত্য অনুপ্রেরণা এ কবিতার উৎস, যে অপার্থিব চিত্রকল্প এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তা কোল্‌রিজের একান্ত নিজস্ব। বিশ্বসাহিত্যে এর তুলনা বিরল। তাঁর কাব্যে অপূর্ব এক স্বপ্নলোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। অত্যাশ্চর্য অতলস্পর্শী রহস্যের ব্যঞ্জনায় তাঁর কবিতা স্পন্দিত।

তাঁর সর্বাধিক পরিচিত ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'দ্য রাইম অফ্ দি এনশেণ্ট ম্যারিনার'-এ কোল্‌রিজ অলৌকিককে লৌকিক করে তুলবার চেষ্টা করেছেন। অনাড়ম্বর ভাষায় লেখা এ কবিতাটি 'ক্রিস্টাবেল' ও 'কুব্‌লা খান্‌'-এর মতো ইংরাজী সাহিত্যের সম্পদ। ছড়ায় প্রচলিত চার পঙ্‌ক্তির শ্লোকে কবিতাটি লেখা হয়েছে। দক্ষিণ মেরুর দিকে তাড়িত একটি জাহাজে যে-সব রহস্যময় ও ভৌতিক ব্যাপার ঘটবে তার যে ছবি কোল্‌রিজ মানসমুকুরে দেখেছিলেন, শব্দচিত্রে তারই জীবন্ত আলেখ্য আমাদের জন্য তুলে ধরেছেন।

তিনজন সুবেশ তরুণ কোনো বিবাহের প্রীতিভোজন-উৎসবে যোগদানের

জন্য যাচ্ছিল। এদের একজনকে এক বৃদ্ধ নাবিক নিজের কাহিনী শোনানোর জন্য জোর করে থামাল। নাবিকটির লম্বা শাদা দাড়ি, চোখ জল্‌জল্‌ করছে। তরুণটি নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করার পর নাবিকটির গল্প আরম্ভ হল। প্রবল এক ঝড় এসে তাদের জাহাজকে দক্ষিণ দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে দক্ষিণ মেরুর কাছে মেরুতুষারের মধ্যে জাহাজ এসে পড়ল। তার পর কুয়াশার মধ্য দিয়ে এক অ্যালবাট্রস-পাখি উড়ে এল। জাহাজের সকলে তাকে সাগ্রহে স্বাগত জানাল। এই অ্যালবাট্রস জাহাজটিকে বরফের ভিতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু শেষে প্রাচীন নাবিকটি তীরবিদ্ধ করে এই ভালো পাখিকে হত্যা করল। অ্যালবাট্রসের শুভ প্রভাবে জাহাজ বিষুবরেখা পৌঁছানো পর্যন্ত উত্তর দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু শুভ পাখিটিকে হত্যা করার প্রতিক্রিয়া এইবার আরম্ভ হল। বাতাস একেবারে বন্ধ হয়ে গেল আর জাহাজের গতি হল স্তব্ধ। দিনের পর দিন এইভাবে কেটে গেল। পটে আঁকা ছবির মতো জাহাজ নীরব নিথর হয়ে রইল। আর অকস্মাৎ শান্ত সাগরবক্ষে যেখানে কর্দমাক্ত প্রাণীরা মন্থরভাবে নড়াচড়া করছে সেখানে একটা জাহাজ ভেসে এল। এক অদ্ভুত 'অশরীরী' জাহাজ। জাহাজের পাটাতনের উপর 'মৃত্যু' ও 'মৃত্যুময় জীবন' প্রাচীন নাবিক ও তার খালাসীদের জন্য পাশা খেলছে। একে একে দুশো জন লোক প্রাণহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত বেঁচে রইল শুধু প্রাচীন নাবিক, তার গলার অ্যালবাট্রসের মৃতদেহ ঝুলছে। তার শুষ্ককণ্ঠে প্রার্থনা-বাণী রুদ্ধ হয়ে গেছে। জলেতে যে সাপগুলি জাহাজের গায়ে জড়িয়েছিল সেগুলির জন্য কখন তার মন করুণায় ভরে উঠল। অ্যাল্‌-বাট্রস তার গলা থেকে পড়ে গেল আর বৃষ্টি শুরু হল। বাতাস উঠল, জাহাজ সাগরবক্ষে আবার ভেসে চলল। মৃত খালাসীরা নিঃশব্দে উঠে যে যার কাজ আরম্ভ করল।

এ দিকে মাঝে মাঝে উৎসবযাত্রী ভয়াবহ নাবিকের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে চলেছে, কিন্তু বৃথাই। বৃদ্ধ নাবিক তার গল্প বলে চলল। অনন্ত ক্ষণ তাকে নিদারুণ বিভীষিকা ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে কাটাতে হয়েছে। তার পর সে অচৈতন্য হয়ে পড়ল। যখন জ্ঞান হল দেখল তার নিজের দেশের বন্দরের দিকে জাহাজ এগিয়ে চলেছে। অদ্ভুত এক জাহাজ আসছে দেখে পোতাধ্যক্ষ ও একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এগিয়ে এলেন। হঠাৎ

একটা বিকট শব্দ করে জাহাজটা জলের তলায় হারিয়ে গেল। আর আশ্চর্য, নাবিকটি দেখল সে পোতাধ্যক্ষের নৌকায় রয়েছে। বৃদ্ধ নাবিকটি তার পর থেকে ঘুরে ঘুরে তার জীবনের এই ভয়বিচিত্র অভিজ্ঞতা বলে বেড়াচ্ছে—

Farewell, farewell ! but this I tell
To thee, thou Wedding-Guest !
He prayeth well who loveth well
Both man and bird and beast.

হঠাৎ প্রাচীন নাবিকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আর বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত অতিথিটি ?

He went like one that hath been stunned,
And is of sense forlorn :
A sadder and a wiser man,
He rose the morrow morn.

কবিতার শুরুতে রক্তগোলাপের মতো সুন্দরী নববধূর প্রবেশ থেকে কবিতার শেষে চন্দ্রালোক-প্লাবিত বন্দরে নাবিকের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সমস্ত 'দ্য রাইম অফ দি এনশেণ্ট ম্যারিনার' রোমাণ্টিক ছবিতে ভরা। কিন্তু এই রোমাণ্টিক ছবিগুলি এমন পরিমিতভাবে আঁকা হয়েছে যে তা সাধারণত ক্ল্যাসিকাল শিল্পরীতিতেই দেখা যায়। এই গীতিকাব্যধর্মী ছড়ায় কোল্‌রিজ শব্দচয়নে বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। নিসর্গের খুঁটিনাটি বর্ণনার সঙ্গে অতি-প্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে লৌকিক-অলৌকিকের ভেদ লুপ্ত হয়ে গেছে এবং অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

'ক্রিস্টাবেল' কবিতায় অতিপ্রাকৃত বিষয় 'দ্য রাইম অফ দি এনশেণ্ট ম্যারিনার'-এর মতো সহজ ও প্রত্যক্ষভাবে আসে নি। এই কবিতায় কোল্‌রিজ ব্যঞ্জনার সাহায্যে ভয় ও রহস্যকে ঘনীভূত করার চেষ্টা করেছেন। একজন পিশাচ সুন্দরী রমণীর ছদ্মবেশে কিভাবে একটি শান্তস্বভাব বালিকাকে প্রতারণা করবে তাই নিয়ে এ কাহিনীর শুরু। বালিকাটির নাম ক্রিস্টাবেল (খ্রীস্টের নামের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মতো), মধ্যযুগের বিশিষ্ট সামন্ত সার্ লিওলাইনের একমাত্র সন্তান। ক্রিস্টাবেলের জন্মের সময়ই তার মার মৃত্যু হয়। একদিন রাত্রিকালে বনের মধ্যে মেয়েটি একটা ওক গাছের নীচে

এক সুন্দরী রমণী-মূর্তি দেখতে পায়। রমণীর নাম জেরাল্‌ডিন; সে বলে তাকে বলপূর্বক অপহরণ করে আনা হয়েছে। তার এ কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য ভাবে সে বলতে না পারলেও সরল-প্রকৃতির ক্রিস্টাবেলের পক্ষে তাকে অবিশ্বাস করা কঠিন হয়। ক্রিস্টাবেল জেরাল্‌ডিন্‌কে আশ্রয় দেওয়ার জন্য নিজের ঘরে নিয়ে যায়; নিয়ে যাওয়ার সময় ও পরে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত লক্ষণ দেখা যায়। ক্রিস্টাবেলের মাতার সূক্ষ্ম-আত্মার আবির্ভাব হয় কন্যার প্রতি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করার জন্য; কিন্তু সেই বিদেহী আত্মাকে বিতাড়ন করার জন্য জেরাল্‌ডিন্‌কে তৎপর হতে দেখা যায়। জেরাল্‌ডিনের নির্দেশ-অনুসারে নিরাবরণ ক্রিস্টাবেল শয্যা গ্রহণ করে। জেরাল্‌ডিন্‌ নিজেও আবরণ উন্মোচন করতে আরম্ভ করে। তার পর সে নিজেও শয্যা গ্রহণ করে এবং ক্রিস্টাবেলকে বাহুলগ্ন করে। ক্রিস্টাবেল মন্ত্রমুগ্ধ হয়; জেরাল্‌ডিনের কোনো গোপন কথাই তার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।

'ক্রিস্টাবেল' কাব্যের দ্বিতীয় ভাগে 'লেক কান্ট্রি' অঞ্চলের দৃশ্যাবলী ও সার্‌ ওআল্‌টার স্কটের কাহিনী-কাব্যের প্রভাব বিশেষ ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। এই অধ্যায়ে জেরাল্‌ডিন্‌ সার্‌ লিওলাইন্‌কে জানায় যে সে তাঁর শত্রু লর্ড রোলাঁর কন্যা। ক্রিস্টাবেল চায় জেরাল্‌ডিন্‌ চলে যাবে এবং তার বাবাকে সে সেই মর্মে অনুরোধও করে, কিন্তু জেরাল্‌ডিন্‌ সার্‌ লিওলাইন্‌কে বশীভূত করে ফেলে। তিনি লর্ড রোলাঁর কাছে বৈতালিক ব্রেসিকে পাঠান জেরাল্‌-ডিনের নিরাপত্তার সংবাদ দিয়ে আসার জন্য। এই কাহিনীকে অনেকে রূপক মনে করেন ও নানা ধরনের ব্যাখ্যা দেন কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই কষ্ট-কল্পিত।

কোল্‌রিজ 'ক্রিস্টাবেল' কাব্যের দুটি অধ্যায় লিখেছেন, শেষ করে যেতে পারেন নি। শিল্পকলার দিক থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়টি প্রথম অধ্যায়ের তুলনায় একটু নিকৃষ্ট। এই কবিতায় ছন্দের প্রয়োগে স্কট্‌ বায়রন প্রভৃতি কবিদের কোল্‌রিজ নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন। মধ্যযুগের রহস্য-সংস্কারে ঘেরা জীবন কোল্‌রিজের কবিতায় রোমাণ্টিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। অতিপ্রাকৃতের অবতারণা বিশ্বাসযোগ্য। অপ্রচলিত ছন্দেব অস্বাভাবিক গতিভঙ্গীতে অতিপ্রাকৃত তরঙ্গায়িত। সুস্পষ্ট ও সাংকেতিক চিত্রকল্পও অতিপ্রাকৃতকে প্রতিষ্ঠিত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

'কুব্‌লা খান্‌' কোল্‌রিজের আর-একটি সার্থক কবিতা। বিশাল এক বিলাস-ভবন নির্মাণরত প্রাচ্যের একজন সম্রাটের কাহিনী কোল্‌রিজ স্বপ্নের ঘোরে কল্পনা করেন। এই স্বপ্নদৃষ্ট কবিতার খানিকটা যখন লেখা হয়ে গেছে তখন একজন লোক কোল্‌রিজের সঙ্গে দেখা করতে আসায় তাঁকে পাশের ঘরে যেতে হয়। সেই লোকটির সঙ্গে ঘণ্টাখানেক আলোচনার পর কোল্‌রিজ যখন ফিরে এলেন তখন আর কিছুতেই কবিতার বাকি অংশটা তাঁর মনে পড়ল না। স্বপ্নবীণার তার তখন ছিঁড়ে গেছে। যে বিচিত্র সুর-ঝংকার একঘণ্টা আগে তাঁকে নিবিষ্ট করে রেখেছিল এখন তা একেবারে নীরব। ভাষার লাবণ্যে ও চিত্রকল্পের সৌন্দর্যে অনুপম একটি কবিতা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। এই কবিতার জগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের সম্পর্ক নেই। এ এক অভিনব স্বপ্নলোক। এর সৃষ্টিতে ছন্দ ও শব্দচয়ন তাঁকে অনেক সাহায্য করেছে—

In Xanadu did Kubla Khan
A stately pleasure-dome decree ;
Where Alph, the sacred river, ran
Through caverns measureless to man
Down to a sunless sea.

এই তিনটি কবিতাই কোল্‌রিজের কবিকীর্তিকে অক্ষয় করে রাখবে। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য ভালো কবিতার মধ্যে রয়েছে 'ডিজেকশন : অ্যান ওড্‌' 'ফ্রস্ট অ্যাট মিডনাইট', 'ইয়ুথ অ্যাণ্ড এজ', 'ওয়ার্ক উইদাউট হোপ', 'ফ্রান্স : অ্যান ওড্‌' ইত্যাদি। প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত উক্তি প্রথমোক্ত কবিতাটিতে রয়েছে—

...we receive but what we give,
And in our life alone does Nature live :
Ours is her wedding-garment, ours her shroud !

কান্ত-কোমল 'লাভ' কবিতাটিও অপূর্ব। এই কবিতারই প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি হল—

All thoughts, all passions, all delights,
Whatever stirs this mortal frame,

All are but ministers of Love,
And feed his sacred flame.

কোল্‌রিজের সাহিত্য-সমালোচনার একটি বিশেষ মূল্যবান স্থান আছে। শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। যে হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি আমরা তাঁর কবিতায় দেখেছি তা তাঁর সমালোচনাতেও দেখি। কবিতার মতো সমালোচনাতেও খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাব অনেক রয়েছে, রয়েছে পীড়াদায়ক অসম্পূর্ণতা। কিন্তু 'Biographia Literaria' এ-সব সত্ত্বেও সমালোচনার ইতিহাসে জয়স্তম্ভরূপে বিরাজ করছে। কোল্‌রিজ ওয়ার্ডসোয়ার্থের যে সমালোচনা করেছেন তা বুদ্ধিদীপ্ত ও যুক্তিপূর্ণ। কবির কল্পনা-শক্তিকে ( Imagination ) কোল্‌রিজ ফ্যান্সি থেকে পৃথক করেছেন। গ্রীক ভাষার সাহায্য নিয়ে তিনি কবির এই বিশেষ উদ্ভাবনী ধর্মের একটি সুন্দর বিশেষণ ব্যবহার করেছেন— esemplastic ['shaping into one']। শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে যে ক্ল্যাসিকাল ধারণা চলে আসছিল, 'a wild irregular genius, in whom great aults are compensated by great beauties,' তার বিরুদ্ধে যে-সব রোমান্টিক কবি ও সমালোচকেরা নূতন মতবাদের প্রচার করেন কোল্‌রিজ তাঁদের নেতৃত্ব করেন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন— 'The judgment of Shakespeare is commensurate with his genius'।

চার্লস ল্যামের শেষ লেখায় ছয়টি শব্দে কোল্‌রিজের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাতে তাঁর সমগ্র জীবন ও সাহিত্যের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে— 'he had a hunger for eternity'। কোল্‌রিজের নিজের ভাষায় তাঁর সম্বন্ধে বলতে ইচ্ছা যায়—

···he on honey-dew hath fed,
And drunk the milk of Paradise.

## জর্জ গর্ডন্ বায়রন
১৭৮৮ - ১৮২৪

He is an Apollo— Apollyon, beautiful and satanic.

L. JOHNSON

বায়রনকে আজ অনেকেই ওয়ার্ডসোয়ার্থ কোল্‌রিজ শেলী বা কীট্‌সের সমশ্রেণী-ভুক্ত কবি বলে স্বীকার করতে চাইবেন না। ওই-সব কবিদের সঙ্গে তুলনায় বায়রনকে অনেক বেশি পার্থিব মনে হয়। সাংসারিক জগতের ঊর্ধ্বে যে জ্ঞান ও আনন্দের স্বর্গলোক আছে সেখানে তাঁর প্রবেশ অবারিত ছিল না। কয়েকটা গীতিকবিতা বাদ দিলে, বায়রনের রচনাগুলি সাধারণত পড়া হয় রঙ্গব্যঙ্গের দৃষ্টান্তরূপে। ব্যঙ্গকবিতা, যত ভালোই হোক, ব্যঙ্গকবিতা। কাব্যমালঞ্চের এক অনুজ্জ্বল প্রান্তে তার স্থান। তবে বায়রনের পরিহাসবিজল্পন কাব্যরসসিক্ত হওয়ায় তার একটি বিশেষ সৌন্দর্য ও মূল্য আছে এবং সে সৌন্দর্য ও মূল্য অসামান্য।

১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি লণ্ডন নগরীতে জর্জ গর্ডন্ বায়রনের জন্ম হয়। তাঁর পিতা খামখেয়ালী প্রকৃতির লোক ছিলেন ও বায়রনের যখন তিন বৎসর বয়স তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। বায়রনের মা বড়োঘরের মেয়ে ছিলেন, তিনি শান্তস্বভাবের ছিলেন না। কখনো অতিরিক্ত আদর দিয়ে ও কখনো অতিরিক্ত তিরস্কার করে তিনি বায়রনের স্বভাব চিরদিনের মতো নষ্ট করে দেন। ছোটোবেলায় দশ বছর বায়রন মায়ের সঙ্গে অ্যাবারডীনে কাটান। তাঁদের ভাড়াবাড়িতে থাকতে হয় কারণ তাঁর মামার সম্পত্তি তাঁর বাবা ফ্রান্সে থাকার সময় শেষ করে দেন। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর দাদুর ( বাবার কাকা ) মৃত্যুর পর বায়রন 'লর্ড' খেতাবের উত্তরাধিকারী হন।

বায়রন প্রথমে অ্যাবার্‌ডীনের গ্র্যামার স্কুলে পড়েছিলেন। পরে তিনি হ্যারোর বিখ্যাত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন (১৮০১ - ১৮০৫)। এখানে পড়ার সময় তিনি ক্রিকেট খেলায় ও মুষ্টিযুদ্ধে কৃতিত্ব দেখান। সন্তরণেও নৈপুণ্য লাভ করেন। ইটন্ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্যালয়ের ক্রিকেট খেলায় তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাল্যকাল থেকে তাঁর প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত ধরনের— কখনো বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন ও সকলকে এড়িয়ে চলতেন, আবার কখনো খেলাধুলা ও নাচ-গান-হল্লায় যোগ দিয়ে ছাত্রদের নেতৃত্ব করতেন। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রিনিটি কলেজে তাঁর বৃহত্তর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। এখানে পড়ার সময় ইতিহাস ও কথাসাহিত্যে তাঁর সব চেয়ে বেশি অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। কেম্‌ব্রিজে তাঁর অন্তরঙ্গতম বন্ধু ছিলেন জন্ ক্যাম্ হব্‌হাউস্। কেম্‌ব্রিজে বায়রনের জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা আরম্ভ হয় ও তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দ অবধি বায়রন কেম্‌ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এই বৎসর তিনি এম্.এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

বায়রন অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন, কিন্তু তাঁর একটি পায়ের ত্রুটি থাকায় তাঁকে খুঁড়িয়ে চলতে হত। এই ত্রুটি সম্বন্ধে তাঁর আত্মসচেতনতা স্পর্শকাতর্যে পরিণত হয়।

কেম্‌ব্রিজে ছাত্রাবস্থায় বায়রনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আওয়ার্‌স অফ আই-ড্‌লনেস' ( ১৮০৭ ) প্রকাশিত হয়। তরুণ কবির প্রথম কবিতায় যে ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি সাধারণত থাকে এই গ্রন্থেও তা ছিল। 'Edinburgh Review' পত্রিকায় গ্রন্থটির তীব্র সমালোচনা করা হয় (১৮০৮)। বায়রন প্রতিশোধ নেন 'English Bards and Scotch Reviewers' ( মার্চ ১৮০৮ ) লিখে। এই বিদ্রূপাত্মক কাব্যে তিনি সমকালীন প্রায় প্রত্যেক লেখককেই ব্যঙ্গের কশাঘাত করেন। সার ওআল্‌টার স্কটও বাদ যান নি। বিদ্রূপাত্মক কবিতা লেখায় যে বায়রনের প্রতিভা আছে তা এই কাব্য থেকে বোঝা যায়।

১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে বায়রন 'হাউস অফ লর্ড্‌স'-এ আসন লাভ করেন। এই বছর জুলাই মাসে তিনি বিদেশ যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন বন্ধু হব্‌হাউস। দু বছর ধরে স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি ইউরোপের নানা দেশে তিনি ভ্রমণ করেন। বেশির ভাগ সময় তিনি গ্রীস দেশে কাটান। এথেন্স নগরীতে তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনী 'Childe Harold's Pilgrimage' লিখতে

আরম্ভ করেন। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসেন ও কাব্যটির প্রথম দুই সর্গ প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, একদিন সকালে ঘুম ভেঙে গেলে তিনি দেখলেন তিনি বিখ্যাত হয়ে গেছেন ('I awoke one morning and found myself famous')। সমস্ত লণ্ডন নগরীতে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তরুণ ভাববিলাসী কবিকে রাজধানী নায়কোচিত মর্যাদায় সম্মানিত করল। চার বছর ধরে চলল প্রশংসার স্রোত। বায়রন এই জনপ্রিয়তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন ও তাঁর নতুন নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হতে লাগল। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে 'দ্য জাওআর' ও 'দ্য ব্রাইড অফ অ্যাবিডোস' প্রকাশিত হয় ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে 'দ্য করসেয়ার' ও 'লারা', ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে 'হিব্রু' মেলোডীস এবং ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে 'দ্য সীজ অফ করিন্থ' ও 'পারিসিয়ানা'। প্রথমটি প্রকাশিত হওয়ার পর বায়রন রোমান্টিক কাহিনী-কবিতার লেখকরূপে স্কটের স্থান অধিকার করেন এবং প্রতিটি নূতন কাব্যের প্রকাশে তাঁর খ্যাতি ক্রমবর্ধমান হয়ে ওঠে। ক্রমশ তিনি সমসাময়িক কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পান ও সমগ্র ইউরোপে শ্রেষ্ঠ সমকালীন কবি-রূপে গণ্য হন।

১৮১১ খ্রীস্টাব্দে বায়রনের সঙ্গে লেডি ক্যারোলাইন ল্যামের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে বায়রন নটিংহ্যামের বিদ্রোহী তন্তুবায়দের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। লর্ড সভার এক স্মরণীয় ভাষণে তিনি তুরস্কের সর্বাধিক অনগ্রসর প্রদেশগুলির জনগণের অবস্থার সঙ্গে তন্তুবায়দের হীন দুর্দশার তুলনা করেন। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি ড্রুরি লেন নাট্যশালার পরিচালক সমিতির সদস্য হন ও রঙ্গমঞ্চের ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। সামাজিক জীবনের নতুন নতুন দিকে তাঁর প্রতিষ্ঠা হতে থাকে।

এর পর তাঁর ভাগ্যে আকস্মিক পরিবর্তন আসে। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দের ২রা জানুয়ারি সার র‍্যাল্‌ফ মিল্‌ব্যাঙ্কের একমাত্র কন্যা আনা ইসাবেলের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। এই বিবাহ কিন্তু সুখের হয় নি। বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে কন্যা অ্যাডার জন্মের পর তাঁর স্ত্রী তাঁকে পরিত্যাগ করলেন। তিনি বললেন, ক্রূরপ্রকৃতি বায়রনের মস্তিষ্কই শুধু বিকৃত নয়, মনও। বায়রন সমাজের বিরাগভাজন হলেন। সেই বছরই তিনি ইংল্যাণ্ড ছেড়ে চলে গেলেন। আর কোনোদিন ফিরে আসেন নি।

বায়রন প্রথমে বেলজিয়াম ও পরে সুইট্জারল্যাণ্ডে গেলেন। জেনিভার সরোবরের ধারে কয়েক সপ্তাহ তিনি শেলীর সঙ্গে বেশ আনন্দে কাটান। এই সময় তিনি 'চাইল্ড হ্যারল্ড'-এর তৃতীয় সর্গ রচনা করেন ও নভেম্বর মাসে ( ১৮১৬ ) সেটি প্রকাশিত হয়। সুইট্জারল্যাণ্ড থেকে বায়রন ভেনিস্ ও রোম নগরীতে যান এবং সেখানে 'চাইল্ড হ্যারল্ড'-এর চতুর্থ ও শেষ সর্গ রচনা করেন ( এপ্রিল ১৮১৭ )। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে ভেনিসে বায়রনের জীবন ছিল চরম উচ্ছৃঙ্খলতার জীবন। এখানে তিনি 'বেপ্পো' রচনা করেন।

১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে বায়রন 'Don Juan' কাব্য লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে টেরেসা গুইচিয়োলি নাম্নী একটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া ও মার্জিতরুচি ইতালীয় মহিলার সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। ইনি কিছুদিন বায়রনের সঙ্গে ছিলেন, প্রথমে ভেনিসে এবং পরে র্যাভেনা ও পিসাতে।

ইতালীয় বিপ্লবীদের বায়রন প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করেন। পিসাতে শেলীর সহযোগিতায় তিনি 'Liberal' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। এই পত্রিকাতেই বায়রনের শ্রেষ্ঠ বিদ্রূপাত্মক রচনা 'দ্য ভিসন অফ জাজমেণ্ট' প্রকাশিত হয়।

গ্রীসকে বায়রন গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তাই গ্রীকদের দুঃখ সহজেই তাঁর অন্তর স্পর্শ করে। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি গ্রীকদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিলেন। দশ হাজার পাউণ্ড তিনি গ্রীকদের দান করলেন ও তুর্কীদের বিরুদ্ধে তাঁদের সাহায্য করবার জন্য যাত্রা করলেন। মিসোলাঙ্গিতে এক সৈন্যদলের নেতৃত্বের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত করা হল। বিশেষ কিছু করতে পারার আগেই বায়রন জ্বরে আক্রান্ত হন। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল মিসোলাঙ্গিতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর দেহ ইংল্যাণ্ডে আনা হয় ও নটিংহ্যামে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃত্যুকালে তাঁর শেষ কাব্য 'Don Juan' অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বায়রনের শেষ কথা একটি গ্রীক উক্তি— যার অর্থ— "এখন ঘুমের সময় এসেছে।" সুইন্বার্নের সুরে আমরা বলতে পারি, তাঁর আগে পিছে সব কিছু অসমাপ্ত রেখে অনেক ঝঞ্ঝাট ও অনেক জয়লাভের পর বায়রন ঘুমিয়ে পড়েছেন। খুব কম লোকেই তাঁর চেয়ে বেশি ক্লান্তি নিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী হয়; তাঁর চেয়ে বেশি নির্ভীকতা নিয়ে বোধ হয় কেউ নয়।

রোমাণ্টিক কবি নিজের চেতনার রঙে পান্নাকে সবুজ দেখেন ; নিজের চেতনার রক্তিমাতেই চুনী তাঁর কাছে রাঙা হয়ে ওঠে। রোমাণ্টিক কবিরা সকলেই অল্পবিস্তর আত্মকেন্দ্রিক। আর তাঁদের কবিতার মাধুর্যের মূলে আত্মসংবেদনার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বায়রনের ক্ষেত্রে কিন্তু এই আত্মকেন্দ্রিকতা অনেক বেশি ব্যাপকরূপে প্রকাশ পেয়েছে ও মাঝে মাঝে এত তীব্রভাবে পরিস্ফুট হয়েছে যে তার ফলে তাঁর কবিতার কাব্যসৌন্দর্যের যথেষ্ট হানি ঘটেছে। উদগ্র আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে সময় সময় একটা রুগ্ণতার ছায়া এসে পড়েছে। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'as a serious writer, he had only one subject, himself'। কীট্স তাঁকে আত্মপূজারী ( self-worshipper ) আখ্যা দিয়েছেন।

নিজের দৈহিক ত্রুটিকে বায়রন জয় করতে চেয়েছিলেন অন্য দিকে শক্তির পরিচয় দিয়ে। দানবের শক্তি থাকা ভালো কিন্তু দানবের মতো সেই শক্তির অপব্যবহার করা হল আসুরিকতা। বায়রনের চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে আসুরিকতা প্রকাশ পেয়েছে। কবি নিজে এই ধরনের জীবনযাত্রায় শান্তি পান নি। নিজেকে সব সময় তিনি 'একা' ভেবেছেন, সারা জীবন একাকীত্বের যাতনায় জলেছেন। তাঁর ছিল অনেক গুণ আর বহুমুখী প্রতিভা। মহৎ স্বভাবের অনেক লক্ষণ ছিল তাঁর প্রকৃতিতে। কিন্তু এ-সবের সঙ্গে আবার ছিল অনেক সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি। তাঁর 'ম্যান্ফ্রেড' নাট্যকাব্যে অ্যাবট ম্যান্ফ্রেড সম্বন্ধে বলেছেন—

> This should have been a noble creature : he
> Hath all the energy which should have made
> A goodly frame of glorious elements,
> Had they been wisely mingled. As it is,
> It is an awful chaos : light and darkness
> And mind and dust, and passion and pure thoughts
> Mixed and contending without end or order,
> All dormant or destructive...

এ কথাগুলি বায়রন সম্বন্ধেও খাটে। বায়রন যেন এখানে আত্মবিশ্লেষণ করে গেছেন।

তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ 'ম্যান্‌ফ্রেড' নাটকটি বায়রনের অন্তর্জীবনের আলেখ্য। সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে বায়রন বারংবার বিদ্রোহ করেছেন। সেই বিদ্রোহের প্রথম সফল ও সুস্পষ্ট প্রকাশরূপে 'ম্যান্‌ফ্রেড'-এর মূল্য আছে। নায়ক ম্যান্‌ফ্রেড বায়রন নিজেই। সব সময় বায়রন নিজেই তাঁর কাব্য, নাট্যকাব্য ও কাহিনী-কবিতার নায়ক। শুধু নায়কই নন, কাব্য ও নাটকগুলির প্রথম কথা বায়রন, শেষকথাও বায়রন। মেকলের ভাষায়— 'He is himself the beginning, the middle, and the end, of all his own poetry, the hero of every tale, tbe chief object in every landscape'। বায়রনীয় নায়ক অবশ্য ফরাসী লেখক শাতেব্রিয়াঁর নায়কদের দ্বারা খানিকটা প্রভাবিত হয়েছে, বিশেষ করে রেনের দ্বারা। শাতেব্রিয়াঁর নায়কেরাও ভাববিলাসী এবং বিষণ্ণ প্রকৃতির। তারাও আত্মকেন্দ্রিকতার আবর্তে আলোড়িত।

নিঃসঙ্গ ও স্পর্শকাতর ম্যান্‌ফ্রেড গভীর হতাশার সম্মুখীন। তবু নিজের ভাগ্য জয় করার অধিকার অর্জন করার জন্য সে সংগ্রাম করে চলেছে। প্রথম অঙ্কে, আল্পস পর্বতের উপর গথিক দুর্গে চিন্তামগ্ন অবস্থায় ম্যান্‌ফ্রেডকে দেখা যায়। জীবনের তৃষ্ণা তার মিটে গেছে। অশুভ আশঙ্কায় তার হৃদয় তন্দ্রাহীন। তার নয়নের নিমীলন হয় শুধু অন্তরে নিরীক্ষণ করার জন্য। দুঃখের কাছ থেকে অনেক শেখার আছে, দুঃখই জ্ঞান। জ্ঞানের তরু কোনোদিন জীবনের মুকুলে মঞ্জরিত হয়ে ওঠে না— The tree of Knowledge is not that of Life। বিশ্বের স্বরূপ যাদের মধ্যে রয়েছে সেই আত্মাদের ম্যান্‌ফ্রেড আহ্বান জানাল। তাদের কাছে দাবি জানাল বিস্মরণের— আত্মবিস্মৃতিতে সে বিলীন হতে চায়। কিন্তু এ বর প্রদান আত্মাদের সাধ্যাতীত। ম্যান্‌ফ্রেড তখন চাইল তারা মূর্তি পরিগ্রহ করুক। ম্যান্‌ফ্রেডের ভাগ্যতারকা সপ্তম আত্মাটির এক লাবণ্যময়ী নারীরূপে আবির্ভাব হল। ম্যান্‌ফ্রেড তার কাছে যেতে চাইল; মূর্তি মিলিয়ে গেল, ম্যান্‌ফ্রেড জ্ঞান হারাল।

বেঁচে থাকার ম্যান্‌ফ্রেডের কোনো স্পৃহা নেই। সে আত্মহত্যা করতে উদ্যত, এমন সময় একজন ব্যাধ এসে তাকে বাধা দিল ও এক পার্বত্য কুটিরে নিয়ে গেল।

দ্বিতীয় অঙ্কে আমরা ব্যাধকে দেখি ম্যান্‌ফ্রেডকে সান্ত্বনা দিতে। ম্যান্‌ফ্রেডকে অব্যবস্থিতচিত্ত ভেবে সে ম্যান্‌ফ্রেডকে সাধু সঙ্গ করার জন্য পরামর্শ

দেবে। ম্যান্‌ফ্রেড বলবে কোনো মানুষকেই সে নিজের দুর্দশার দ্বারা সংক্রামিত করতে চায় না। এক অশুভ শক্তি তাকে অভিভূত করে রেখেছে, কিন্তু এ শক্তির উৎস তার অন্তর নয়। যারা তাকে ভালোবাসে তাদের বিনাশের মধ্যে এই অশুভের প্রকাশ হয়।

পাহাড়ে ভ্রাম্যমান ম্যান্‌ফ্রেডের সঙ্গে আল্পস পর্বতের ডাকিনীর সাক্ষাৎ হল। সে ম্যান্‌ফ্রেডকে সাহায্য করতে চাইল। ম্যান্‌ফ্রেড নিজের দুঃখের কাহিনী তাকে শোনাল—"যৌবনের প্রারম্ভ থেকে, আমার চৈতন্য অন্যান্য মানুষের আত্মার সঙ্গে কোনো যোগ রাখে না, মানুষের চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখে না। তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার তৃষ্ণা আমার ছিল না। তাদের জীবনের লক্ষ্য আমার ছিল না। আমার আনন্দ, আমার দুঃখ, আমার ভাবাবেগ, আমার শক্তি, আমাকে ভিন্ন করে তুলেছিল। নিজের দেহ রক্তমাংসের হলেও রক্তমাংসের শরীর যাদের, তাদের প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি ছিল না।"

ডাকিনী প্রস্তাব করল, ম্যান্‌ফ্রেড তার অনুগামী হোক। ম্যান্‌ফ্রেড যদি তার বাধ্য হয় তা হলে সে ম্যান্‌ফ্রেডের ইচ্ছা পূর্ণ করবে। ম্যান্‌ফ্রেড অস্বীকার করে বলল, পারিপার্শ্বিকের প্রতি যত ঘৃণাই থাক্-না কেন, মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। "কাল ও আতঙ্কের হাতে আমরা ক্রীড়নক : দিনের পর দিন আমাদের উপর সন্তর্পণে এসে পড়ছে ও আমাদের কাছে থেকে সন্তর্পণে গ্রাস করছে : তবুও আমরা বেঁচে থাকি জীবনের জন্য তীব্র ঘৃণা নিয়ে, আর মৃত্যুভয়ে এখনো শঙ্কিত হয়ে।"

রাত্রি আসছে। ম্যান্‌ফ্রেড তার ভাগ্যদেবতাকে আহ্বান জানাল।

তৃতীয় অঙ্কে ম্যান্‌ফ্রেড শান্ত সমাহিত। নিয়তির বিধানের জন্য সে অপেক্ষা করে রয়েছে। ধর্মযাজক এল তার আত্মাকে রক্ষা করার জন্য। ম্যান্‌ফ্রেড বলল, তার যা কিছু পাপ সে তো দেবতার কাছে; ধর্মযাজকের কোনো ভূমিকাই নেই। ধর্মযাজক অনেক বোঝাল, কিন্তু যে মানুষ চিরকাল একা থেকেছে সে তার জীবনের ছকের কোনো পরিবর্তন করতে পারে ও যে জনগণকে সে চিরকাল ঘৃণা করে এসেছে, তাদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে এ কথা ম্যান্‌ফ্রেড কিছুতেই স্বীকার করল না। ধর্মযাজক শেষ পর্যন্ত ম্যান্‌ফ্রেডের আধ্যাত্মিক মঙ্গল সাধন করতে পারার আশা ছেড়ে দিল। পরে ম্যান্‌ফ্রেডের আত্মাকে বশে আনার জন্য ধর্মযাজকের সঙ্গে অপ্সরেরাও চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু ম্যান্ফ্রেড একাকী দাঁড়িয়ে আছে, অপরাজেয় স্বতন্ত্র মানুষ। তার আত্মা সে শুধু মৃত্যুর হাতেই সমর্পণ করল, স্বর্গ বা নরক এরূপ কোনো বিশেষ স্থানের জন্য তা নির্দিষ্ট নয়। মৃত্যুর জন্য সে প্রস্তুত, কিন্তু যে আত্মনিবেদনে তার মন সাড়া দেয় না তার জন্য সে প্রস্তুত নয়—

Away ! I'll die as I have lived— alone.

ম্যান্ফ্রেডের শেষ কথা—

Old man ! 'tis not difficult to die.

যে গীতিকবিতার সুরের রেশ 'ম্যান্ফ্রেড' নাটকে মাঝে মাঝে শোনা যায় তার পূর্ণতা পাওয়া যায় বায়রনের কয়েকটি সুন্দর গীতিকবিতায় যেগুলি বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লিরিকগুলির মধ্যে স্থান পাবে। যেমন—

She walks in beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies.

মেঘহারা নিশি ও নক্ষত্রময় নভোমণ্ডলের নিশীথিনীর মতো— সে নারী লাবণ্য-সঞ্চারিণী। বায়রনও যে গভীর ও নিষ্কলুষভাবে ভালোবাসতে পারতেন, এই চিত্তহারী কবিতা তার সাক্ষ্য হয়ে আছে। কিংবা সেই অপূর্ব কবিতাটি যেটিতে তিনি তাঁর মানসীকে বলেছেন—আর কোনো রূপকন্যার তোমার মতো মায়াজাল নেই; আর তোমার মধুর কণ্ঠস্বর আমার কাছে জলরাশিতে সংগীতের ঝংকারের মতো। আর-একটি কবিতায় তিনি দুঃখ করেছেন, জ্যোৎস্না-রাতে তাঁদের বেড়াতে যাওয়ার পালা শেষ হল—

So we'll go no more a-roving
So late into the night.

মাঝে মাঝে এগুলি পড়তে পড়তে শেলীর রচনার কথা মনে পড়ে। অবশ্য বায়রনের এই ধরনের গীতিকবিতার সংখ্যা স্বল্প। শেলীর রচনা গীতিকাব্য-প্রধান, তিনি অজস্র গীতিকবিতা লিখেছেন। বায়রনের রচনা ব্যঙ্গপ্রধান বলা যেতে পারে। অবশ্য শেলীর সঙ্গে বায়রনের অন্য অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। এঁরা দুজনেই বিদ্রোহী কবি, বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছেন কম্বুকণ্ঠে। স্বাধীনতার দৃপ্ত পূজারী এঁরা, স্বাতন্ত্র্য-সূর্যের উদয়দূত। বায়রনের নানা কবিতায় স্বাধীনতার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে—

The mountains look on Marathon
And Marathon looks on the sea ;

And musing there an hour alone,
I dreamed that Greece might yet be free.

যে 'Don Juan'-এর অন্তর্গত 'দি আইলস অফ গ্রীস' থেকে পঙ্‌ক্তি কয়টি উদ্ধৃত হয়েছে, সেটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে 'মেবার পাহাড়! মেবার পাহাড়!' রচনার অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। অবশ্য শেলীর মতো বায়রন অন্য অর্থেও বিদ্রোহী কবি। সমাজের হৃদয়হীন ব্যবস্থা, অর্থহীন প্রথা ও নিষ্ঠুর অ-শাসনের বিরুদ্ধে তাঁরা বরাবর বিদ্রোহ করেছেন। যে সমাজে অন্যায় ও ভণ্ডামির প্রতাপ, যে সমাজ মানুষকে মর্যাদা দেয় না, সেই সমাজের বিরুদ্ধে তাঁদের চিরন্তন সংগ্রাম। বায়রন যদিও শেলীর মতো ন্যায় সত্য ও প্রেমকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেন নি, তবু তিনি সমাজ-সংসারের ও মানবচরিত্রের অনেক দীনতা ও হীনতাকে বিদ্রূপের কশাঘাত করতে দ্বিধা করেন নি।

ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকবিদের মধ্যে বায়রন অন্যতম। তাঁর অধিকাংশ ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার পর্যায়ে পড়ে। বিশেষ করে 'The Vision of Judgment' ও 'Don Juan'। তাঁর বিদ্রূপের লক্ষ্য শুধু রাজনৈতিক বিষয় নয়, জাতির জীবনের সব কিছু পুঞ্জীভূত ভণ্ডামি চটক আড়ম্বর ও অত্যাচার। যে ভাবাবেগ ও তীব্র কৌতুক তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য, তা তাঁর ব্যঙ্গকবিতাকে তীক্ষ্ণতর করে তুলেছে। তাই ব্যঙ্গকবিরূপেই তিনি সর্বোত্তম। তাঁর প্রথম দিকের বিদ্রূপাত্মক রচনায় ড্রাইডেন, পোপ ( যাকে তিনি ইংরাজ কবিকুলের চূড়ামণি মনে করতেন ) প্রভৃতি কবিদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাঁর পরিণত রচনা শক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ততার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস ও বিদ্রূপাত্মক রচনার দিকে সাধারণত রোমান্টিক কবিদের প্রবণতা দেখা যায় না। বায়রন রোমান্টিক যুগের মানুষ হয়েও এ দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই তাঁর বিদ্রূপাত্মক রচনাও রোমান্টিক হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতায় ব্যঙ্গ ও কাব্যের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর হাস্যরস কল্পনার আলোয় আলোকিত। একাধারে এক দিকে শ্লেষ অনুপ্রাস, ব্যঞ্জনার ছড়াছড়ি আর অন্য দিকে অনুভূতির উচ্ছলতা ও করুণ রসের অনুরণন। এই প্রকার রোমান্টিক রঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ।

সাদী তাঁর 'A Vision of Judgment' ( ১৮২১ )-এ রাজা তৃতীয় জর্জের প্রশস্তি করেছিলেন ও প্রসঙ্গত বায়রনকে খানিকটা কটাক্ষ করেছিলেন।

বায়রন এর উত্তর দিয়েছেন তাঁর 'The Vision of Judgment' ( ১৮২১ ) প্যারডি কবিতায়। এতে তৃতীয় জর্জ ও সাদী তো বিদ্রূপবাণে জর্জরিত হয়েছেনই, ওয়ার্ডসোয়ার্থ কোল্‌রিজও একেবারে বাদ যান নি। ব্যক্তিগত ব্যঙ্গকাব্যরূপে 'The Vision of Judgment'-এর স্থান সর্বোচ্চ শিখরে।

ব্যঙ্গপ্রধান মহাকাব্য 'Don Juan'-এর ষোলোটি সর্গ। এটি প্রায় আগা-গোড়াই আট পঙ্‌ক্তির ইতালীয় ছন্দ *ottava rima*-তে লেখা। সকলকে অগ্রাহ্য করে যা-খুশি তাই করার একটা ভাব এই কাব্যে রয়েছে এবং সেটা লেখার ভঙ্গীতে পাওয়া যায়। সামাজিক দুর্নীতি, ইংরাজদের নৈতিক কপটতা ও চারিত্রিক দুর্বলতা এবং শাসন ও সমরের ব্যাপারে ইউরোপের নেতৃবৃন্দের নির্বোধ ও নির্দয় নীতিকে এই কাব্যে বায়রন বার বার তীব্র ও তিক্তভাবে উপহাস করেছেন। লালসা এ কাব্যে সহস্র শাখা বিস্তার করে রয়েছে। আয়তনের বিশালতা, পরিধির বিরাটত্ব, বিবিধ বিষয়ের অবতারণার দিক থেকে ব্যঙ্গাত্মক মহাকাব্য 'Don Juan' অতুলনীয়।

'Don Juan' কাব্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সুন্দর বর্ণনা আছে। তীক্ষ্ণ তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি আর প্রকৃতিকে তিনি যেমন দেখেছেন তেমন বর্ণনা করেছেন। বর্ণনায় বায়রন সিদ্ধহস্ত। এই প্রসঙ্গে স্বতঃই 'চাইল্ড হ্যারল্ডস পিলগ্রিমেজ'-এর কথা মনে পড়ে, বিশেষ করে এই কাব্যের তৃতীয় সর্গের কথা। বায়রনের শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে এ কাব্য অন্যতম। এর হতাশ খামখেয়ালী নায়কের ( বায়রন স্বয়ং ছদ্মবেশে ) মোহভঙ্গ হয়েছে। পার্থিব জীবনের প্রতি এসেছে জুগুপ্সা। তার বিষাদের মধ্যে একটা বিলাসের ভাব আছে। পাপে তার কুণ্ঠা নেই, পাপের কালিমায় সে লিপ্ত। নিজের কাছ থেকে সে পালাতে চায়, তাই এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলেছে তার পরিক্রমণ।

বায়রনের জীবনে যেমন তাঁর কবিতায়ও তেমন, মদোন্মত্ততা আত্মম্ভরিতা, মানব-বিদ্বেষ ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রাচুর্য। আবার অপরের জন্য সহানুভূতি, অত্যাচারিতের জন্য অনুকম্পা, অন্যের জন্য মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য আত্মত্যাগ এ-সবেরও অভাব নেই। অত্যাচার শঠতা ও প্রবঞ্চনাকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করেছেন ও তাদের বিরুদ্ধে অদম্য সাহস ও শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

অদম্য শক্তি, দুর্বার বেগ বায়রনের কবিতাতে অসাধারণ তীব্রতা এনে

দিয়েছে। এত দ্রুতভাবে তিনি কবিতা রচনা করতেন যে তা আশ্চর্যকর ( এইজন্য তাঁর কবিতায় অনেক শিল্পগত ত্রুটি থেকে গেছে ও তাঁর ভাষা মাঝে মাঝে ব্যাকরণ-দোষে দুষ্ট )। শুধু অধৈর্যই এর কারণ নয়। রচনার উদ্দীপনা যখন সবচেয়ে বেশি থাকে তখনই তিনি লিখে ফেলতে চান। তাঁর ভয় ছিল, দেরি করলে কল্পনায় ম্লানিমা এসে পড়তে পারে। তিনি নিজেই বলেছেন, 'If I miss my first spring, I go back to my jungle again'। কাব্যের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, কাব্য হচ্ছে 'the lava of the imagination, whose eruption prevents earthquake', এবং তাঁর কল্পলোক থেকে গদ্য ও কবিতা বেরিয়ে এসেছে প্রকৃতির প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো।

# পার্সি বিশ্ শেলী

১৭৯২ - ১৮২২

**Shelley, lyric lord of England's lordliest Singers...**

SWINBURNE

ইংরাজী কাব্যকুঞ্জের কলকণ্ঠ বিহঙ্গ হলেন পার্সি বিশ্ শেলী। তিনি যখন 'To a Skylark' কবিতার প্রথম শ্লোকে লিখলেন—

Hail to thee, blithe Spirit !
Bird thou never wert,
That from Heaven, or near it,
Pourest thy full heart
In profuse strains of unpremeditated art,

তখন নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেরই স্তুতিগীতি রচনা করেছিলেন। 'A Defence of Poetry'-নিবন্ধে শেলী নিজেই কবিকে নাইটিঙ্গেল-পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন— 'A poet is a nightingale who sits in darkness and sings to cheer its own solitude with sweet sounds.' শেলীকে যদি আমরা পাখির সঙ্গে তুলনা করি, তা হলে বলতে হয় তিনি একাধারে স্কাই-লার্ক ও নাইটিঙ্গেল। তাঁর প্রথম রূপটি স্মরণ করে তরুণ ব্রাউনিং তাঁকে Sun-treader বা সূর্যচারী বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। শেলী নিজে দ্বিতীয় রূপটি অপরূপভাবে এঁকেছেন তাঁর 'Adonais' কবিতায়—

…one frail Form,
A phantom among men ; companionless
As the last cloud of an expiring storm

Whose thunder is its knell ; he, as I guess,
Had gazed on Nature's naked loveliness,
Actaeon-like, and now he fled astray
With feeble steps o'er the world's wilderness,
And his own thoughts, along that rugged way,
Pursued, like raging hounds, their father and their prey.

কখনো শেলী স্বর্গতারকা স্বর্যচারী মুক্তপক্ষ চাতক, কখনো তমসাবৃত গীতিমুখর নিঃসঙ্গ নাইটিঙ্গেল। তবে মুক্তপক্ষ চাতক রূপেই হোক বা নিঃসঙ্গ নাইটিঙ্গেল রূপেই হোক, সব সময় শেলী কণ্ঠে গান নিয়েছেন ও সে গানের হৃদয়-দোলানো সুরে কবিতাকুঞ্জ ঝংকৃত।

সাসেক্স-এর অন্তর্গত ওয়ার্নহ্যাম-এ ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা অগস্ট শেলী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা টিমোথি শেলী ছিলেন ধনী সম্ভ্রান্তবংশীয় ও পার্লামেন্টের সদস্য। শেলীর পিতামহ ছিলেন স্যার বিশ্ শেলী। স্নেহ-পরায়ণা সহোদরাদের মধ্যে শেলীর বাল্যকাল সুখে কেটেছে। তাঁর পিতামহ তাঁকে বেশ স্নেহ করতেন এবং পিতামহ ও ভাইবোনদের কাছে শেলী ভূত-প্রেত, দানব-যক্ষ, রাক্ষস-ডাকিনী প্রভৃতি অনেক অলৌকিক প্রাণীর অদ্ভুত চিত্তাকর্ষক কাহিনী বলতেন। তবে শেলীর মা শেলীর কোমল ও নারীসুলভ-প্রকৃতি পছন্দ করতেন না।

দশ বছর বয়সের সময় শেলী আইলওয়ার্থ-এর সিঅন্ হাউস্ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ আরম্ভ করেন। এখানে তিনি তত সুখী ছিলেন না বটে তবে অনেকের সঙ্গে এখানে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। রাসায়নিক পরীক্ষা দিতে তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইটন-এর প্রখ্যাত বিদ্যালয়ের ছাত্র হন। এখানে উইলিয়ম গড্উইন-এর লেখা 'Enquiry into Political Justice' গ্রন্থটি শেলী অধ্যয়ন করেন। তাঁর জীবনে এই গ্রন্থটির গভীর ও স্থায়ী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

অপার্থিব অতিপ্রাকৃত বিষয়ের প্রতি শেলীর সহজাত আকর্ষণ ইটনে আরো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ভূতপ্রেতদের প্রত্যক্ষ করার জন্য তিনি নানা ক্রিয়াকলাপ শুরু করেন। এইসব অবশ্য শীঘ্রই তাঁর শিক্ষকদের দৃষ্টিগোচর হয় ও তাঁরা এর জন্য শেলীর উপর যথেষ্ট অত্যাচার আরম্ভ করেন। এমন-কি, শেলীকে

'পাগল' আখ্যা দিয়ে অন্যান্য ছাত্রদেরও এই অত্যাচারে অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। অত্যাচারীদের নেতা ছিলেন প্রধান শিক্ষক ডক্টর কীট্। এমন-কি, ডক্টর কীটের বিবরণী অনুসারে শেলীর বাবাও শেলীকে অবাধ্য দুর্বিনীত ও বিদ্রোহী ছাত্র বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং বিদ্যালয়ের দীর্ঘাবকাশের সময় শেলী যখন বাড়ি আসতেন তখন তিনি শেলীকে উৎপীড়ন করতেন। সামান্য নিপীড়নও স্পর্শকাতর শেলীর কাছে অসহনীয় মনে হত। তাই ডক্টর কীট ও টিমোথি শেলীকে তিনি অসভ্য বর্বর ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারতেন না। তাঁদের চরিত্রে অবশ্য সত্যই খানিকটা বর্বরতার ভাব ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই শেলী গ্রন্থকার-রূপে পরিচিত হয়েছেন। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে শেলীর প্রথম গ্রন্থ 'Zastrozzi' ( উপন্যাস ) প্রকাশিত হয়। এর পরে তাঁর ও তাঁর বোন এলিজাবেথের কবিতা নিয়ে 'Original Poetry by Victor and Cazire' প্রকাশিত হয়। এই বছরই তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হন। অক্সফোর্ডে টমাস জেফার্সন হগ্-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও সৌহার্দ্য হয়। এই সময় তিনি ও হগ যুগ্মভাবে 'Posthumous Fragments of Margaret Nicholson' ও তিনি পৃথকভাবে 'St. Irvyne' রচনা করেন। অক্সফোর্ডে পড়ার সময় শেলীর আকৃতি ভাবভঙ্গী ও চিন্তাধারা, সব কিছুর মধ্যেই একটা বৈপ্লবিক ভাব, একটা বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। স্বভাবতই তিনি কর্তৃপক্ষের সুনজরে ছিলেন না। এর পর তিনি যখন হগের সঙ্গে যুগ্মভাবে 'নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তা' ( 'The Necessity of Atheism' ) সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখলেন তখন তাঁরা দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হলেন। অপমানিত লাঞ্ছিত শেলী বাড়ি ফিরে গেলেন। সেখানে নূতন বিপদ। তাঁর বাবা তখন তাঁকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন।

বন্ধু হগের সঙ্গে শেলী লণ্ডন নগরীতে এলেন। সেখানে গডউইন, লে হাণ্ট ও এই গোষ্ঠীর অন্যান্যদের সঙ্গে শেলীর পরিচয় হয়। আর পরিচয় হয় তাঁর বোনের এক সহপাঠিনী হ্যারিয়েট ওয়েস্টব্রুক-এর সঙ্গে। হ্যারিয়েটকে তিনি ভালোবাসলেন, ভালোবাসার চেয়েও বেশি যা অনুভব করলেন তা হল সম-বেদনা। হ্যারিয়েটের পিতাও শেলীর পিতার মতো অত্যাচারী। তিনি মেয়ের ইচ্ছার উপর নিজের ইচ্ছা আরোপ করতে দ্বিধা করেন নি। পৃথিবীর সব

নিপীড়িতদের জন্য শেলী সব সময় মর্মবেদনা অনুভব করেছেন ও সকল দুঃখীর দুঃখ দূর করার সংকল্প বার বার গ্রহণ করেছেন। তা ছাড়া অত্যাচারীর দণ্ড বিধান করা তিনি কর্তব্য বলে মনে করেন। তিনি এগিয়ে এলেন হ্যারিয়েটকে উদ্ধার করার জন্য— ঠিক যেমন করে রূপকথার রাজপুত্র রাজকন্যাকে রাক্ষসের হাত থেকে উদ্ধার করতে আসে। তার পর তিনি হ্যারিয়েটকে নিয়ে গোপনে এডিনবারায় পালিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁদের বিয়ে হল। শেলীর বয়স তখন উনিশ, হ্যারিয়েটের ষোলো। বিয়ের পর হ্যারিয়েটের বাবা দম্পতির জন্য আড়াই হাজার টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন।

শেলী ও হ্যারিয়েট আয়ারল্যাণ্ডে এলেন। শেলীর ইচ্ছা ছিল, আইরিশদের তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করবেন। জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। তাঁর দৃপ্ত আদর্শবাদ আয়ারল্যাণ্ডের সাধারণ লোকের কাছে প্রলাপ-বাক্য বলে মনে হল। শেলী ও হ্যারিয়েটকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হল।

ফিরে এসে শেলী লিনমাউথ-এ একটি ছোটো বাড়ি ভাড়া নিলেন। এখানে শেলী, হ্যারিয়েট ও হ্যারিয়েটের অবিবাহিতা ভগিনী ইলিজা থাকতেন। ইলিজা ছিলেন তাঁদের জীবনের দুষ্টগ্রহ স্বরূপ। হ্যারিয়েট শেলীকে ভুল বুঝলেন, ইলিজা তাঁকে যন্ত্রণা দিতে লাগলেন ও সমাজে তিনি সমালোচনার পাত্র হয়ে উঠলেন। শেলীর জীবন বিষময় হয়ে উঠল। কিন্তু শেলী কাব্যের জগতে আশ্রয় খুঁজে পেলেন। সেখানে কোনো জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই, দুঃখ নেই, দৈন্য নেই। হতাশার কালিমায় তা ক্লিষ্ট নয়। সেখানে পরিবেশ কল্পনার ইন্দ্রধনুর ছটায় দীপ্ত। সেখানে প্রেম আছে, সত্য আছে, আছে আলো, জ্ঞান ও করুণা। আছে সঞ্জীবনী আশা।

গড্উইনের মতবাদ এই সময় শেলীকে প্রগাঢ়ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। শেলী তাঁকে চিঠি লিখলেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। গড্উইন তাঁর এই নবীন ভক্তর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিলেন। গড্উইনের সঙ্গে দেখা করার জন্য শেলী লণ্ডনে গেলেন। গড্উইনকে দেখে অবশ্য শেলীকে একটু নিরাশই হতে হল। আর এই বহুবিবাহিত ব্যক্তিটির পারিবারিক অশান্তিও শেলীর চোখে পড়ল। কিন্তু গড্উইন-এর প্রথম বিবাহের এক সন্তান সপ্তদশী মেরি ওলস্টোনক্রাফ্ট গডউইন শেলীকে মুগ্ধ করলেন। লাবণ্যময়ী

এই মেয়েটির বুদ্ধিমত্তা শেলীকে বিস্মিত করল। মেরির সোনালি কেশপাশে ও অনিন্দ্য নয়নের দৃষ্টিজালে জড়িয়ে পড়লেন শেলী। হ্যারিয়েটের সঙ্গে তাঁর মনের মিল হয় নি। দাম্পত্য জীবনে অশান্তি বেড়ে চলেছিল। তা ছাড়া অন্যের প্রতি হ্যারিয়েটের গোপন অনুরাগের কথাও তাঁর অজানা ছিল না। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে মেরিকে নিয়ে তিনি গোপনে পালিয়ে গেলেন। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হ্যারিয়েট আত্মহত্যা করেন। হ্যারিয়েটের মৃত্যুর পর শেলী ও মেরির বিবাহ হয়। এই বছরেই শেলী 'Hymn to Intellectual Beauty' রচনা করেন। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে শেলী ও হ্যারিয়েটের সন্তান ইয়ানথে ও চার্লস বিশ্-এর দেখাশোনার ভার শেলীর উপর না দিয়ে ধর্মাধিকরণ থেকে অন্য অভিভাবকের নিয়োগ করা হয়।

১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে শেলী মেরি ও মেরির দুই সন্তান উইলিয়াম ও ক্লারাকে নিয়ে ইতালিতে গেলেন। এই বছর তিনি প্লেটোর 'Symposium'-এর অনুবাদ করেন ও 'Lines Written among the Euganean Hills' রচনা করেন। তাঁর কন্যা ক্লারার মৃত্যু তাঁর গভীর দুঃখের কারণ হয়। এই বছরই তিনি 'Prometheus Unbound' লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে রোম নগরীতে শেলী 'Prometheus Unbound' নাটকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক এবং ট্রাজেডি 'The Cenci' রচনা করেন। এই সময় প্রিয় পুত্র উইলিয়ামের মৃত্যুতে শেলী মর্মান্তিক আঘাত পান। 'Ode to the West Wind' ও 'Prometheus Unbound'-এর চতুর্থ অঙ্ক এর পরের রচনা। এই সময় মেরির সন্তান পার্সির জন্ম হয়। এর পরের বছরও শেলীর জীবন যাযাবরের মতো কেটেছে। ইতালির এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে চলেছে তাঁর পরিক্রমা। আর চলেছে তাঁর কবিতা লেখা। 'Arethusa,' 'Ode to a Skylark', 'Letter to Maria Gisborne,' 'The Witch of Atlas' ও 'Epipsychidion' প্রভৃতি কবিতা এই সময়ের রচনা। এমিলিয়া ভিভিয়ানি নামে যে মহিলাটির প্রতি শেলী কিছুদিনের জন্য আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনিই শেলীকে 'Epipsychidion' লেখার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। আর তাঁকে মনে করে তাঁর উদ্দেশে লেখা এই কবিতাটি শেলীর মহত্তম প্রেমের কবিতা। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে শেলী বন্ধু টমাস লাভ্ পীকক্-এর 'Four Ages of Poetry' নিবন্ধের একটি উত্তর দেন। এটি হল শেলীর বিখ্যাত গদ্যরচনা

'The Defence of Poetry'। এই বছরেই কীট্স্-এর মৃত্যু-সংবাদে ব্যথিত হয়ে তিনি শোকগাথা 'Adonais' রচনা করেন।

জীবনের শেষ কয়েক বছর শেলী কয়েকজন বন্ধুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন হগ, লে হান্ট, বায়রন, ট্রেলনে ও এডোয়ার্ড উইলিয়ামস। এডোয়ার্ড উইলিয়ামসের পত্নী জেন্‌কে শেলী ভালোবেসেছিলেন ও তাঁর কয়েকটি শেষের কবিতা এই জেনের উদ্দেশেই লেখা।

১৮২২ খ্রীস্টাব্দের ৮ই জুলাই শেলী ও তাঁর বন্ধু উইলিয়ামস লেহর্ন থেকে নৌকা (এটির শেলী নাম রেখেছিলেন Ariel) করে ফেরার সময় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় নৌকাটি ডুবে যায়। ১৮ই জুলাই শেলীর ভেসে ওঠা মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাঁর পোশাক ও পোশাকের পকেটে কীট্সের কাব্যগ্রন্থ ও ঈস্কাইলাসের নাটক দেখেই শুধু তাঁকে চেনা গিয়েছিল। কিছুদিন পরে তাঁর মৃতদেহ দাহ করা হয় ও ভস্মাবশেষ রোম নগরীর Protestant Cemetery-তে রাখা হয়, যে সমাধিক্ষেত্রের সম্বন্ধে শেলী নিজেই বলেছিলেন— "এমন সুন্দর স্থানে কবর থাকবে ভাবলে মৃত্যুকে লোকে ভালোবেসে ফেলতে পারে।"

শেলীর অনেক গুণ ছিল। অনুভূতির গভীরতা আদর্শবাদ উদারতা বদান্যতা প্রভৃতি তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম ছিল। তবে আত্মবিচারের বিশেষ শক্তি তাঁর ছিল না। নিজের কবিতা থেকে তিনি নিজেকে পৃথক্ করে রাখতে পারেন নি। তাঁর কবিতায় তিনি বারবার অতি সুকুমার নিষ্পাপ মহাপ্রাণ কবি রূপে নিজের ছবি এঁকেছেন। দেখিয়েছেন সংসারের চক্রে এই মহৎ কবির লাঞ্ছনা। এ থেকে যদি আমরা মনে করি তাঁর চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব ছিল বা উদ্দেশ্য-সাধনের প্রচেষ্টা তাঁর ছিল না, তা হলে আমরা ভুল করব। তাঁর আকৃতিতে সৌন্দর্য, প্রকৃতিতে কমনীয়তা, ভাবভঙ্গিতে নভোচারিতা, ব্যবহারে আবেগপ্রবণতা ছিল বটে, কিন্তু ব্যক্তিত্বে শক্তি ও ঋজুতার অভাব ছিল না। তাঁর কবিতাতে যেমন দুই স্বর— নাইটিঙ্গেলের ও স্কাইলার্কের— তাঁর চরিত্রে সেইরকম পেলবতা ও কঠোরতা দুই-ই ছিল।

অনেক নারীর সঙ্গে শেলীর অন্তরঙ্গতা থাকলেও এবং তিনি বন্ধনহীন প্রেমে বিশ্বাস করলেও তাঁর চরিত্রে একটা পবিত্রতার ভাব ছিল যেটা শেষ পর্যন্ত কলুষিত হয় নি। এই চারিত্রিক পবিত্রতার ভাব ছিল না বলেই

বায়রনের উচ্ছৃঙ্খলতা শুধুই উচ্ছৃঙ্খলতা। শেলী নারীর মধ্যে শুধু সঙ্গিনীকেই খোঁজেন নি, তাঁর 'নিজের আত্মার সহোদরা'কেও বুদ্ধির স্তরে খুঁজেছেন। এই অন্তহীন অন্বেষণের মোহ তাঁকে অনেক সময় ঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় তিনি কৈশোরসুলভ কতকগুলি ধারণা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। 'নিজের আত্মার সহোদরা'-কে ('sister of his soul') যে কোনোদিন বাস্তবে পাওয়া যায় না, সে সোনার হরিণ যে শুধু দৃষ্টি এড়ায়, পালিয়ে বেড়ায়, ইঙ্গিতে ডাক দিয়ে যায়, কোনোদিন ধরা দেয় না— এ সত্য তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। সুন্দরী ছায়ার পানে যে তরুকে চিরদিন চেয়ে থাকতে হয়, সে তার আপন বলেই তাকে সে পায় না, এ কথা তিনি বুঝতে পারেন নি। এইটাই তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডি।

চড়াই পাখি খাবার খুঁটে খাচ্ছে, এই দৃশ্য দেখতে দেখতে যদি কবি তাঁর সত্তা চড়াই পাখির সত্তায় হারিয়ে ফেলেন তবে বুঝতে হবে তাঁর সেই মহৎ শিল্পগুণটি আছে, কীট্স যার নাম দিয়েছেন Negative Capability। নিজের অস্তিত্বকে সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেলে অন্যের অস্তিত্বে তা খুঁজে পাওয়া, এইটাই সে ক্ষমতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। শেক্সপীয়রের এই ক্ষমতার প্রাচুর্য ছিল। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হওয়ার মূলে তাঁর Negative Capability-র অনেকখানি দান রয়েছে। প্রকৃত শিল্পী সব সময় নিজের ব্যক্তিগত সত্তা ও শিল্পীসত্তাকে পৃথক রাখবেন। কীট্স তা পারতেন। শেলী কিন্তু পারেন নি। তাঁর শক্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাই কীট্স তাঁকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন— 'You might curb your magnanimity, and be more of an artist, and load every rift of your subject with ore।' কীট্স বুঝেছিলেন, শেলীর কবিতার শিল্পগত ত্রুটির জন্য শেলীর আত্মপ্রধান প্রকৃতির অনেকটা দায়িত্ব রয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন, শেলী নিজেকে ও নিজের মতবাদকে ভুলে গিয়ে কবিতার কাব্যাংশে মনোনিবেশ করুন ও তাঁর কবিতায় অন্যান্য সব জিনিস ছাপিয়ে ফুটে উঠুক স্বর্ণসুষমার অভিনব দীপ্তি। শেলীর কবিতায় আমরা সব সময় শেলীর সান্নিধ্য অনুভব করি। এই আত্মকেন্দ্রিকতার দিক থেকে ওয়ার্ডসোয়ার্থের সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে। আর ওয়ার্ডসোয়ার্থের মতো তিনিও সাধারণত যে-সব বিষয় তাঁর প্রিয় বেছে

বেছে সেই-সব বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তা ছাড়া সামান্য মাত্র আবরণের অন্তরালে তিনি নিজেও নিজের কবিতায় অনেক বার দেখা দিয়েছেন; প্রেমের অনেক কবিতা লিখেছেন যা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত। কিন্তু শেলীকে সব চেয়ে চেনা যায় তাঁর কবিতার পরিবেশ থেকে। এ পরিবেশ একান্তভাবে শেলীর নিজস্ব। কয়েক প্রকার নির্দিষ্ট চিত্রকল্পের বারংবার প্রয়োগ করে, কয়েকটি বিশেষ বর্ণের বিন্যাস করে, ভাষায় একটি বিশেষ ভঙ্গি দিয়ে, সংগীতের একটি বিশেষ ঝংকার তুলে শেলী এক সম্পূর্ণভাবে শেলীময় জগৎ স্থষ্টি করেছেন। এ এক বিচিত্র আলো-আঁধারির জগৎ। এখানে মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আবার এখানে আছে উজ্জ্বল আলোর প্রকাশ। এ যেন পার্থিব জগৎ থেকে অনেক দূরের কোনো দেশ। কিন্তু কল্পনার সাহায্যে সেখানে আমাদের প্রবেশ বাধাহীন।

শেলীর যুগের অন্যান্য কবিদের অনেকেরই পরে ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে মোহ-ভঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু শেলীর বিশ্বাস অটুট ছিল। অল্পদিনের জন্য ফ্রান্সে দুর্দিন ফিরে এলেও সুদিন আসার বিলম্ব ছিল না বলে তাঁর ধারণা ছিল। তাই তিনি 'The Revolt of Islam'-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন— 'আমার মনে হচ্ছে, মানবজাতি তাদের আচ্ছন্নভাব কাটিয়ে উঠছে। এক মন্থর ধারাবাহিক নীরব পরিবর্তন সম্বন্ধে আমি অবহিত বলে মনে করছি।' নৈতিক শক্তিরূপে কাব্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে বলে শেলীর বিশ্বাস ছিল। কাব্যের মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের মূলে রয়েছে মানুষের কল্পনাকে আকৃষ্ট করার মোহিনী শক্তি। আর কল্পনার মাধ্যমে আমাদের অনুভূতিগুলিও উদ্বুদ্ধ হয়—'নীতির মূলে রয়েছে প্রেম। অর্থাৎ অন্যের চিন্তায় কার্যে বা দেহে যে সুন্দরের অধিষ্ঠান তার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে ফেলা। কোনো মানুষ যদি খুব সৎ হতে চায়, তাকে অবশ্যই তীব্রভাবে ও গভীরভাবে কল্পনা করতে হবে; তাকে অবশ্যই অন্যের স্থানে এবং অন্য অনেকের স্থানে নিজেকে স্থাপিত করতে হবে; মানবজাতির সব দুঃখ ও আনন্দকে অবশ্যই নিজের করতে হবে। নৈতিক মঙ্গলের বড়ো সাধন হচ্ছে কল্পনা-বৃত্তি; আর কবিতা কারণের উপর প্রয়োগের দ্বারা কার্যের সহায়তা করে' ('A Defence of Poetry')। কবির তাই কাজ হচ্ছে কল্পনাকে বিকশিত করে অনুভূতিগুলিকে জাগ্রত করা— নীতি-বাদীর মতো প্রত্যক্ষভাবে নিজের মতামত প্রচার করা নয়।

নিঃসঙ্গ এক কবির অতৃপ্ত কামনা ও মৃত্যু 'Alastor'-কাব্যের বিষয়বস্তু। এটি অনেকটা আত্মজীবনীমূলক।

'Queen Mab' কবির বৈপ্লবিক মনোভাবের অপরিণত ও তীব্র প্রকাশ। মাঝে মাঝে কাব্যসৌন্দর্য ফুটেছে। এখানে কবি খ্রীস্টধর্ম, ব্যক্তিগত মালিকানা, বিবাহ ইত্যাদি প্রচলিত সব প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদের জন্য দাবি জানিয়েছেন। এই কাব্যে গড্‌উইনের 'Political Justice' গ্রন্থের প্রভাব সুস্পষ্ট।

'The Revolt of Islam' দীর্ঘ, অবিন্যস্ত কাহিনীকাব্য। বিপ্লবের নীতিতে কবির অবিচলিত বিশ্বাস ও মানবজাতির মুক্তির জন্য গভীর আশা এই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না ; নৈতিক জগতে ভালোবাসাই একমাত্র বিধান হবে। এই কবিতায় নায়ক-নায়িকা আদর্শের প্রতি নিঃস্বার্থ নিষ্ঠার প্রতিমূর্তি। মানবের মঙ্গলের জন্য তারা আত্মোৎসর্গ করবে।

মানবতামূলক কাব্যগুলির মধ্যে নাট্যকাব্য 'Prometheus Unbound'-এর স্থান সর্বোচ্চে। মানবতার অভ্যুদয় এর বিষয়বস্তু। প্রমিথিউস্ মানবের প্রতিরূপ। জুপিটার বা ইন্দ্র অত্যাচারের প্রতিমূর্তি। জুপিটারের পতন হচ্ছে স্বেচ্ছাচারের উপর শক্তির জয়লাভ। প্রমিথিউসের সহিত এশিয়ার বিবাহ মানুষের মনের সঙ্গে প্রেমের নীতির মিলন। আর এই মিলন থেকেই পৃথিবীতে নিষ্কলুষ প্রেমের রাজ্যের সূত্রপাত। 'Prometheus Unbound' গীতিকাব্যধর্মী নাটক। এর কয়েকটি গান তুলনাহীন। যেমন, দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে যে গানটিতে এশিয়ার প্রতি প্রমিথিউসের অনুরাগ সহস্রধারে উৎসারিত হয়েছে—

Life of life ! thy lips enkindle
With their love the breath between them.

কিংবা যে গানে এশিয়া এর উত্তরে নিজের মনোভাব বর্ণনা করছে—

My soul is an enchanted boat,
Which, like a sleeping swan, doth float,
Upon the silver waves of thy sweet singing.

'প্রমিথিউস আন্‌বাউণ্ড্' কাব্যনাট্যকে অনেকে শেলীর শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করেন; শেলীর নিজেরও এই রচনাটি অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ঈস্‌কাইলাস বীর প্রমিথিউস্‌কে

বন্দী অবস্থায় দেখিয়েছেন ; প্রমিথিউসের বন্ধন-মোচন যে গ্রীক নাটকের বিষয়বস্তু সে নাটক আমাদের হাতে পৌঁছয় নি, যদিও তার সম্বন্ধে ধারণা করার মতো উপাদান আমাদের কাছে রয়েছে। ঈস্কাইলাস চেয়েছিলেন, অগ্নি-অপহরণকারী প্রমিথিউস ( এই অগ্নি সে মানবের প্রয়োজনে দান করে ) শেষ পর্যন্ত দেবরাজ জুপিটারের উপকার করবে ও বিনিময়ে মুক্তি পাবে। শেলী তাঁর ভূমিকায় লিখলেন— 'I was averse from a catastrophe so feeble as that of reconciling the champion with the oppressor of mankind।'

শেলীর নাটকের প্রথম অঙ্কের বিষয়বস্তু প্রমিথিউসের তেজোদ্দীপ্ত সাহস ও আত্মোৎসর্গ। চূড়ান্ত অশান্তি ও যন্ত্রণার মাঝেও সে অচপল, 'চিত্তেনাপরাজিতঃ'; কোনো শাস্তিই তাকে টলাতে পারে না। মুক্ত সৃষ্টিশীল মানব-মনের সে মূর্ত প্রতীক। দেবরাজ জুপিটার অত্যাচারের প্রতীক কিন্তু এখন আর জুপিটারের প্রতি প্রমিথিউসের কোনো ঘৃণা নেই, আছে শুধু সীমাহীন করুণা। প্যান্থিআ ও আয়োনী যথাক্রমে প্রত্যয় ও আশার প্রতীক। এশিয়া প্রেমের প্রতিমা। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে এশিয়ার বসন্ত-সম্ভাষণ ; সমগ্র অঙ্কে তার জয়যাত্রা। শেষের দিকে সে অপূর্ব দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তখন তাকে Intellectual Beauty এবং Life of Life-রূপে চিনে নেওয়ায় কোনো বাধা নেই। তৃতীয় অঙ্কে বিশ্বকর্মা ডেমোগর্গন্-এর অভ্যুদয় ও জুপিটারের পতন, ফলে প্রমিথিউসের বন্ধন-মোচন।

> The loathsome mask has fallen, the man remains
> Sceptreless, free, uncircumscribed, but man
> Equal, unclassed, tribeless, and nationless…

এখানেই নাটকের প্রকৃত সমাপ্তি। পরে অবশ্য শেলী চতুর্থ অঙ্ক যোগ করেন, যে অঙ্ককে আমরা 'সৃষ্টির বিজয়-গাথা' নামে অভিহিত করতে পারি। গীতিকাব্যের সুর এই অঙ্কে তীব্রতর।

> Language is a perpetual Orphic song,
> Which rules with Dædal harmony a throng
> Of thoughts and forms, which else senseless and
> shapeless were.

শেলী নিজে 'Prometheus Unbound'-এর ভূমিকায় বলেছেন, 'Didactic poetry is my abhorrence।' কিন্তু তাঁর আদর্শবাদ মাঝে মাঝে তাঁর কোনো কোনো কবিতায় একটু উগ্র হয়ে উঠেছে ও কাব্য-সৌন্দর্যের হানি ঘটিয়েছে। তবে তাঁর গীতিকবিতাগুলি অপূর্ব। এই আশ্চর্য সুন্দর কবিতাগুলি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার অন্তর্গত। এইগুলির মধ্যে রয়েছে—'Ozymandias', 'Lines Written among the Euganean Hills', 'Stanzas Written in Dejection near Naples', 'Ode to the West Wind', 'The Sensitive Plant', 'The Cloud', 'Ode to a Skylark', 'To Night', 'O World, O Life, O Time!', 'When the Lamp Is Shattered', 'The Indian Serenade', 'Music, When Soft Voices Die', 'One Word Is Too Often Profaned' ও 'The Triumph of Time'।

'Ozymandias' সনেটটির বিষয়বস্তু হল মানবজীবনের ও মানবের গরিমার অসারতা। মিশরের শাহেনশাহ্ অজিমান্‌ডিআস্ ভাবতেন তাঁর মতো কীর্তিমানের সমকক্ষ হওয়ার সাধ্য কোনো পরাক্রান্ত ব্যক্তির নেই। তাঁর প্রস্তরমূর্তির পাদবেদীর শিলালিপিতে এ কথা উৎকীর্ণ ছিল। আজ তাঁর মূর্তি ভগ্ন ও ভূলুণ্ঠিত— মরুবালুকায় অর্ধমগ্ন। এ ছাড়া তাঁর কীর্তির কোনো চিহ্ন নেই। বিরাট মূর্তির ধ্বংসাবশেষের চারপাশে শুধু সীমাহীন বালুকা।

জীবনের যাত্রাপথে অনেক মুহূর্ত আসে যখন প্রকৃতিদেবীকে দেখে মন আনন্দে ভরে ওঠে। মানুষের পার্থিব ভাব বা অনুদারতা পর্যন্ত প্রকৃতি দূর করতে পারে। এই কথাই শেলী 'Lines Written among the Euganean Hills' কবিতায় বলতে চেয়েছেন :

Many a green isle needs must be
In the deep wide sea of misery,
Or the mariner, worn and wan,
Never thus could voyage on.

'Stanzas Written in Dejection near Naples' কবিতাটিতে বিষাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। চার দিকে উত্তপ্ত সূর্য, নীল আকাশ, উর্মিনৃত্যমুখর সাগর, সুনীল দ্বীপপুঞ্জ, তুষারাচ্ছন্ন পর্বতমালা। সমীরণে, পাখির গানে,

সাগরের জলে যেন একই আনন্দের বিভিন্ন স্বর তরঙ্গায়িত। মধ্যাহ্নসমুদ্রের বিদ্যুদ্দীপ্তি বিচ্ছুরিত। কবি একাকী রয়েছেন। তাঁর মনে আশা নেই, শরীর সুস্থ নয়। অন্তরে শান্তি নেই, বাইরে প্রশান্তি নেই। সন্তোষের ভাবও নেই। নেই খ্যাতি, শক্তি, প্রেম, অবকাশ—অন্যদের জীবনে এসব রয়েছে কবি দেখতে পাচ্ছেন। তারা বেঁচে আছে মুখে হাসি নিয়ে, তারা বলে জীবন সুখময়। কবির পেয়ালায় ভরা হয়েছে অন্য জিনিস। বাতাস মৃদুভাবে বইছে, জলেও মৃদুতা, নৈরাশ্যও এখন মৃদু হয়ে গেছে। পরিশ্রান্ত শিশুর মতো তিনি শুয়ে পড়তে পারতেন। আর যে উদ্‌বেগসংকুল জীবনের ভার বহন করেছেন ও এখনও করতে হবে, সেটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারতেন। যতদিন না নিদ্রার মতো ধীরপদে মরণ এসে তাঁকে ঘিরত, আর তিনি অনুভব করতেন তপ্ত বাতাসে তাঁর গণ্ডদেশ শীতল হয়ে যাচ্ছে, আর শুনতেন তাঁর মুমূর্ষু চেতনার উপর সমুদ্রের একটানা ধ্বনি, শেষবারের মতো। এই কবিতাটি লেখার চার বছর পরে তাঁর এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। জীবনসাগরে পরিশ্রান্ত নাবিকের চেতনা সমুদ্রের একটানা স্বরের মধ্যে ক্রমশ চিরকালের মতো রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

'Ode to the West Wind' শেলীর বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম। এই কবিতাটিরও জন্ম তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। কবির একটি সন্তানের মৃত্যু হয়েছে, আর একটি সন্তানের জন্ম আসন্ন। নানা বিরোধী ভাবে তাঁর চিত্ত দোলায়মান। একটি শীতের দিন সারা হয়ে আসছে। দিকে দিকে একটা সাড়া পড়েছে, জেগেছে উন্মাদনা। যেমন যখন কঠিন বাস্তব জগৎকে কিছুতেই আদর্শ অনুসারে রূপ দেওয়া যায় না, তখন ব্যর্থ প্রাণে আবর্জনা জমে ওঠে, মন হয় বিষাদাচ্ছন্ন, অন্তরে ভরে ওঠে বিক্ষোভ। বাইরের প্রবল প্রভঞ্জন ও কবির হৃদয়ের ঝড় শেলীর কবিতায় একাকার হয়ে গেছে। পশ্চিমের ঝড়ের হাওয়াকে কবি আবেগদৃপ্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছেন। জীবনের কাঁটার উপর তিনি পড়ছেন, তিনি রক্তাক্ত— 'I fall upon the thorns of life, I bleed!' তিনিও পশ্চিমের ঝটিকার মতোই মুক্ত ও ক্ষিপ্ত ও মদোন্মত্ত। কিন্তু কালের পাষাণভারে তিনি শৃঙ্খলিত ও অবনমিত—

A heavy weight of hours has chained and bowed
One too like thee : tameless, and swift, and proud.

তাঁর আশা আছে তাঁর 'প্রাণহীন চিন্তারাশি' ( 'dead thoughts' ) সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে—

Like withered leaves to quicken a new birth.

ওগো ঝড়ের হাওয়া, যদি শীত আসে, বসন্ত কি অনেক দূরে থাকতে পারে ?

এই কবিতাটির সহিত রবীন্দ্রনাথের কল্পনা কাব্যের অন্তর্গত 'বর্ষশেষ' কবিতা তুলনীয়। 'Ode to the West Wind' কবিতার চিত্রকল্প এমন প্রাণময়, এমন গতিশীল, এমন সুগঠিত যে এই কবিতার কবিকে অন্ততঃ 'বন্ধ্য দেবদূত' ( 'ineffectual angel' ) বলা চলে না। আর এই ধরনের উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি শেলীর আরো রয়েছে। যেমন, 'The Triumph of Life' কবিতাটি।

'To Night' কবিতাটিতে শেলীর কাছে রাত্রি প্রিয়তমা নারীর মতো অপরূপা রহস্যময়ী। দিনের আলোয় তিনি ক্লান্ত। রাত্রি এসে তাঁর মনকে সঞ্জীবিত করুক। সুপ্তিকে নয়, মৃত্যুকে নয়, মোহময়ী তারকাবৃতা বিভাবরীকে তিনি চান।

'One Word Is Too Often Profaned' কবিতাটিতে শেলী তাঁর মানসীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, প্রেম নিবেদন তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁর পূজার অর্ঘ্য কি গৃহীত হবে না ? তাঁর কামনা পতঙ্গের নক্ষত্রকে কামনা করার মতো, প্রভাতকে রাত্রির চাওয়ার মতো, দুঃখের জগতের উর্ধ্বে কোনো দেবীর প্রতি ভক্তির অঞ্জলি।

'Love's Philosophy' কবিতাটিতে শেলী একান্তই সাধারণ প্রেমিক। সমস্ত প্রকৃতিতে তিনি প্রিয়সম্মিলন প্রত্যক্ষ করছেন। ঝর্না নদীতে গিয়ে মিশছে, নদী গিয়ে পড়ছে সাগরে। সকলেই যদি প্রিয় সঙ্গ লাভ করে, তবে কবি শুধু বঞ্চিত হবেন কেন ? তাঁর ঈপ্সিতারও কি উচিত নয় তাঁর প্রতি দাক্ষিণ্য দেখানো ?

'Lines to an Indian Air' অপূর্ব সংগীতের সুরে ঝংকৃত। কবি তাঁর প্রিয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন, তার পর ঘুম ভেঙে গেছে। সমীরণ ধীরে বইছে, আকাশে তারা জ্বলছে। কে যেন তাঁকে ঘরের বাইরে এনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। কখন তিনি প্রিয়ার বাতায়নতলে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি নিজেই জানেন না। উতলা হাওয়া কালো, নিথর জলে এসে মূর্ছা যায়, স্বপ্নে দেখা

সুখস্মৃতির মতো চাঁপার গন্ধ মিলিয়ে যায়, নাইটিঙ্গেলের বিলাপ তার হৃদয়েই হারিয়ে যায়, কবিও তাঁর প্রিয়তমার হৃদয়প্রান্তে এসে মরতে চান। তিনি মরে যাচ্ছেন, তিনি মূর্ছা যাচ্ছেন, তিনি অবসন্ন হয়ে পড়ছেন। তৃণশয়ন থেকে প্রিয়া তাঁকে তুলে নিক। প্রিয়ার প্রেম চুম্বনরূপে তাঁর ওষ্ঠাধরে ও নিমীলিত নয়নের উপর ঝরে পড়ুক। হায়, কবির গণ্ডদেশ শীতল ও পাণ্ডুর হয়ে গেছে, তাঁর সশব্দ ও দ্রুত স্পন্দনরত হৃদয়কে প্রিয়া আবার নিজের বুকে টেনে নিক, অবশেষে সেখানেই কবিহৃদয় ভেঙে পড়বে।

শেলীর গীতিকবিতা চাঁদের আলোর মতো, ফুলের সৌরভের মতো, ঝর্নার জলের মতো। এতে কোনো জড়তা নেই, প্রচেষ্টা নেই, কৃত্রিমতা নেই, আবিলতা নেই। এ যেন পাখির গান। দেবতার প্রেরণা থেকে এর জন্ম। লঘু সুললিত লাবণ্যময়। শেলীর কবিতার ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকৃৎদের সমস্ত চাতুরী চূর্ণ হয়। এর সমালোচনায় সমালোচকের সমস্ত কৌশল হয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত। এ কবিতার সুখ্যাতি করা হবে অর্থহীন আতিশয্য। মানুষের কবিরূপে শেলী জাগতিক সুখদুঃখের অনেক উচ্চস্তরে বিরাজ করেন, তাঁর পরিবেশে একটা অলৌকিকত্ব আছে যেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে সব সময় সহজে গ্রহণযোগ্য নয়। মানবতার অভ্যুত্থানের জন্য প্রদীপ্ত আগ্রহ তাঁর কাব্যে সুস্পষ্ট। কিন্তু তাঁর চরিত্রচিত্রণে একটা অস্পষ্টতার ভাব আছে। যাই হোক, ব্যক্তিবিশেষের জন্যই হোক, আর জাতির জন্যই হোক, তাঁর কাছে অভ্যুদয়ের একমাত্র পথ হচ্ছে প্রেমের পথ। এইদিক থেকে শেলীর সঙ্গে বায়রনের বৈসাদৃশ্য পরিস্ফুট। বায়রনের নায়কেরা উদ্ধত প্রকৃতির, মানব-বিদ্বেষী স্বার্থান্ধের দল। শেলীর নায়কেরা লাওন ও প্রমিথিউসের মতো উদারচেতা, স্বার্থহীন মানবপ্রেমিক, তারা মানবতার কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন দেয়। ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থের ও কীট্‌সের কবিতায় যেমন আমরা পৃথিবীর সাধারণ ছোটোখাটো জিনিসের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় লক্ষ্য করি, শেলীর নিসর্গ-কবিতায় তা পাই না। শেলীর নভোচারী প্রকৃতি নদী হ্রদ সমুদ্র পর্বত আকাশ জল বাতাস আলো ইত্যাদি নিসর্গের বিশাল ও নিত্য-পরিবর্তমান রূপাবলীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে। আর শেলী অন্য কবির চেয়ে গভীরতরভাবে এইসবের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন বলে তাঁর পাঠকদের মধ্যেও তিনি তাঁর মনোভাব সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন। ওয়ার্ড-

সোয়ার্থের মতো তাঁর কাছেও নিসর্গ ঈশ্বরের প্রতিরূপ। শেলীর নাস্তিকতা প্রচলিত ধর্মতন্ত্রের দেবতায় অবিশ্বাস, পরিদৃশ্যমান বিশাল বিশ্বের কোনো অধীশ্বরে নয়। শেলীর প্রথম দিকের কবিতায় লীলাময়ী কল্পনার উদ্দামতাকে কবি বাধা দেন নি, তাই অন্তহীন চিত্রকল্পের প্রাচুর্যে তাঁর অনেক কবিতা ভারাক্রান্ত ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। পরবর্তী কালের রচনায় ক্রমবর্ধমান সংযম শিল্পের দিকে তাঁর ক্রমোন্নতির সাক্ষ্য বহন করছে।

## জন কীট্‌স

১৭৯৫-১৮২১

Keats is the most imaginative of our poets, after Chaucer, Spenser, Shakespeare, Milton.

LANDOR

১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ( ২৯শে বা ৩১শে তারিখে ) লণ্ডন-নগরীতে জন কীট্‌স জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আস্তাবলে কাজ করতেন ও নিয়োগকর্তার কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। জন ছিলেন তাঁদের প্রথম সন্তান ; তাঁদের দ্বিতীয় পুত্র জর্জের জন্ম হয় ১৭৯৭ অব্দে, তৃতীয় পুত্র টমের ১৭৯৯ অব্দে ও কন্যা ফ্রান্‌সেস্ মেরির ( ফ্যানি ) ১৮০৩ অব্দে।

১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে এন্‌ফীল্ডে রেভারেণ্ড জন ক্লার্কের বিদ্যালয়ে কীট্‌সের শিক্ষা-জীবন আরম্ভ হয়। অন্যান্য সহপাঠীদের তুলনায় কীট্‌স ছিলেন অনেক বেশি স্পর্শসচেতন ; তাঁর শিক্ষকেরা তাঁকে 'creature of passion' বলে অভিহিত করতেন। প্রথম প্রথম এন্‌ফীল্ডে এসে কীট্‌স বাড়ির জন্য খুব মন খারাপ করতেন ; রাত্রিতে তিনি নিজের মুখের মধ্যে কম্বল ঢুকিয়ে নিতেন যাতে তাঁর ফোঁপানোর শব্দ অন্য কেউ না শোনে। কিন্তু তাঁর সাহসের কোনো অভাব ছিল না। আকারে ক্ষীণ ও খর্ব হলেও কারো অত্যাচার তিনি সহ্য করতেন না এবং প্রয়োজনবোধে হাতাহাতি করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। তবে মুষ্টির চেয়ে দৃষ্টির ব্যবহারেই তাঁর আগ্রহ ছিল সমধিক। বইয়ের নেশা তাঁর এত প্রবল ছিল যে বইয়ের পাতা একবার খোলা হলে তিনি অন্য জগতে চলে যেতেন।

কীট্‌সের যখন নয় বছর বয়স তখন এক দুর্ঘটনায় তাঁর পিতার মৃত্যু হয়।

কীট্‌সের বয়স যখন পনেরো বছর, তখন ক্ষয়রোগে তাঁর মাতার মৃত্যু হয়। মিস্টার অ্যাবি নামক এক ব্যক্তি কীট্‌সের অভিভাবক হলেন। তিনি ঠিক করলেন, কীট্‌স ডাক্তারী শিখবেন ও সেইমতো ব্যবস্থা করলেন। কীট্‌স কিছুটা শল্য চিকিৎসাতে পারদর্শিতাও লাভ করেছিলেন। কিন্তু কাব্যলক্ষ্মীর রূপে যিনি মুগ্ধ অশ্বিনীকুমার তাঁকে স্থায়ীভাবে আকৃষ্ট করতে পারলেন না। স্পেন্সারের রোমান্টিক কাব্য পড়ে কীট্‌স্ অদ্ভুত উন্মাদনা অনুভব করলেন, এবং বুঝতে পারলেন সাহিত্য ছাড়া আর কোনো বৃত্তি গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

হ্যাম্‌ষ্টিডে কীট্‌স তাঁর ছোট ভাই টম্‌কে নিয়ে বাস করতেন। তাঁর আর-এক ভাই জর্জ বিবাহের পর স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করেন। ভগিনী ফ্যানি তখনও অভিভাবক মিঃ অ্যাবির তত্বাবধানে ছিলেন। পিতার সম্পত্তির সামান্য আয়ে কীট্‌সের কোনোমতে চলত বটে কিন্তু কীট্‌স এই সময় বেশ আনন্দেই ছিলেন। কবিতা লেখার আনন্দ তো ছিলই, এ ছাড়া তাঁর কয়েকজনের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন লে হাণ্ট্, কাউডেন্ ক্লার্ক ও চার্লস ব্রাউন।

১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের জুন থেকে অগস্ট মাস পর্যন্ত কীট্‌স বন্ধু ব্রাউনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চল ও স্কটল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করেন। ইতিপূর্বে টম ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল ও কীট্‌স ক্রমাগত ভাইয়ের সেবা-শুশ্রূষা করে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। চোখের সামনে স্নেহাস্পদ ছোটো ভাই তিলে তিলে ক্ষীণতর হচ্ছে ও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এই ক্লান্তিকর ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা থেকে কিছুদিন অন্তত পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কীট্‌স বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। বেড়ানো শেষ হওয়ার আগেই কীট্‌স নিজে সর্দি ও গলার ক্ষতে আক্রান্ত হন ও তাড়াতাড়ি লণ্ডনে ফিরে আসেন। এর পরেই তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু হয়।

ভগ্নহৃদয় কীট্‌স এই সময় কোমলপ্রাণ নারীর সস্নেহসান্নিধ্য পরম কাম্য মনে করলেন ও এই ভাবে মানসিক শান্তির সন্ধান পাবেন আশা করলেন। তা ছাড়া তিনি আজীবন সৌন্দর্যের পূজারী; রূপবতী নারীকে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই মূর্তিমতী সৌন্দর্য বলে গ্রহণ করলেন। লাজুক স্বভাবের লোক ও নিজের খর্বাকৃতি সম্বন্ধে সচেতন হয়েও কীট্‌স্ অনেক তরুণীর সঙ্গে এই সময়

পরিচিত হলেন। মেয়েদের অনেকের মধ্যে তিনি যে অহমিকা ও কৃত্রিমতা দেখলেন তাতে তিনি দুঃখ পেলেন। তবু তাদের রূপে তাঁর হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল। এমন-কি, যে মেয়ে ক্লিওপাট্রার মতো মোহিনী নয় অথচ ক্লিওপাট্রার সখীদের মতো সুন্দরী, সেও কীট্‌সের বিনিদ্র রাত্রি রজনীগন্ধার সৌরভে ভরিয়ে তুলল। ফ্যানি ব্রন অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন না, কিন্তু অষ্টাদশী এই তরুণীর প্রাণোচ্ছলতায় কীট্‌স অভিভূত হলেন।

১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে ফ্যানি ব্রন তাঁর বাগ্‌দত্তা হলেন। কীট্‌স চেয়েছিলেন শীঘ্র তাঁদের বিবাহ হয়; কিন্তু দরিদ্র কবির পক্ষে এটা শুধু স্বপ্নবিলাস মাত্র। দারিদ্র্য ছাড়াও আর একটা ব্যাপারে কীট্‌স অস্বস্তি বোধ করছিলেন। নিজের শরীরকে তিনি খুব সুস্থ রাখতে পারছিলেন না। তাঁর কবিত্বের অবশ্য আমরা পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাচ্ছি 'হাইপীরিয়ন্', 'লেমিয়া', 'ঈভ অফ সেণ্ট অ্যাগনেস্' প্রভৃতি কবিতায়।

ইতিমধ্যে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে 'এন্‌ডিমিয়ন' প্রকাশিত হওয়ার পর কীট্‌সকে তীব্র বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সমালোচকেরা কঠোরতার পরাকাষ্ঠা দেখানোর জন্য রুচি ও হৃদয়বৃত্তিকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেন নি। কীট্‌স মনে আঘাত পেয়েছিলেন খুবই, তবে এই আঘাতের ফলে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে সেটি ভ্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। বায়রন যখন এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন

'T is strange the mind, that very fiery particle,
Should let itself be snuffed out by an article,

তখন সত্যকে প্রকাশ করার চেয়ে শ্লেষাত্মক কবিতা লেখার দিকেই তাঁর আগ্রহ ছিল।

কীট্‌সের অশান্তির আরো গুরুতর কারণের অভাব ছিল না। ফ্যানি ব্রনের সঙ্গে তাঁর বিবাহের সম্ভাবনা যত কমতে লাগল তত কীট্‌স অধৈর্য হয়ে পড়তে লাগলেন। ফ্যানিকে লেখা প্রেমপত্রগুলিতে তাঁর গভীর অনুরাগ যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, তেমনই তাঁর অশান্ত হৃদয়ের বেদনাও সেখানে উন্মথিত। ফ্যানি অন্য কারো সঙ্গে কথা বলবেন বা মিশবেন এ ভাবতেও কীট্‌স ঈর্ষার বিষে জর্জরিত হয়ে উঠতেন। কিন্তু তাঁর কীই বা করার ছিল।

তাঁর যে একেবারে কিছুই আর করার রইল না সে কথা কিন্তু কীট্‌স

শীঘ্রই বুঝতে পারলেন। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কীট্‌সের আবার সর্দি হল, তার সঙ্গে জ্বর। আর তার সঙ্গে আর একটি মোক্ষম উপসর্গ— বাতির আলোয় রক্তের রঙ দেখলেন কীট্‌স ডাক্তারের চোখ দিয়ে। অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্রাউনের দিকে চেয়ে বললেন, 'ও রক্তের রঙ আমার জানা। এ যক্ষ্মার রঙ।' তার পর বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন বেদনার্ত চোখে ( কীট্‌সের সে দৃষ্টি ব্রাউন আজীবন ভুলতে পারেন নি )—'ওই রক্তের ফোঁটার মধ্যে আমার মৃত্যুর পরোয়ানা রয়েছে।'

যে অসুখে কীট্‌সের মা ও ভাই গেছেন, এখন সেই মহারোগে কীট্‌স নিজেই আক্রান্ত হলেন। বন্ধুরা বললেন, কীট্‌সের মধ্যে রোগের বীজাণু আগেই ছিল; সেইজন্যই তিনি ঘন ঘন সর্দিতে আক্রান্ত হতেন, গলক্ষতে ভুগতেন, অত সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন; আর সেইজন্যই কি তাঁর কবিতায় বারংবার বিষাদের সুর শোনা গেছে?

কীট্‌স আরোগ্যের আশা একেবারে ছাড়েন নি। ডাক্তারেরাও তাঁকে ভরসা দিলেন, আসলে তাঁর ফুসফুসে ঠাণ্ডা লেগেছে এর বেশি কিছু নয়। মাসের পর মাস কীট্‌স পঙ্গুর মতো জীবন যাপন করলেন। এই অবস্থাতেই কবিতার প্রুফ সংশোধন করতেন। আর রোগ যখনই হঠাৎ চাগাড় দিয়ে উঠত তখনই তিনি একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তেন।

তার পর ডাক্তারেরা বললেন, কবিতা লেখা তো দূরের কথা, কবিতা পড়াও তাঁকে বন্ধ করে দিতে হবে। তখন ভাগ্যবিড়ম্বিত কবির জীবনে তাঁর প্রেম ছাড়া আর-কিছু সম্বল ছিল না। কবিখ্যাতি তাঁর ভাগ্যে বিশেষ জোটে নি। ফ্যানি ব্রনই তখন তাঁর সহায়, তাঁর ধর্ম, তাঁর ভরসা। ফ্যানিকে প্রিয়ারূপে বাহুপাশে যদি না পান তা হলে কীট্‌স তাঁর জীবন-সন্ধ্যায় তাকে জননী-রূপেও দেখতে পারেন। চঞ্চল শিশু যেমন মায়ের বুকে স্থান পেয়ে শান্তি পায়, তিনিও ফ্যানির অতল স্নেহের মাঝে ডুবে স্নিগ্ধ হতে চেয়েছিলেন শেষবারের মতো—

...Yet still steadfast, still unchangeable,
Pillow'd upon my fair love's ripening breast,
To feel for ever its soft fall and swell,
Awake for ever in a sweet unrest,
Still, still to hear her tender-taken breath,

And so live ever— or else swoon to death.

ইতালিতে যাওয়ার কথা হল। সেখানকার উষ্ণ পরিবেশে যদি আসন্ন মৃত্যুর হিমকে গলিয়ে দিতে পারে। কবি স্বপ্ন দেখলেন, শীতকাল ইতালিতে কাটিয়ে গ্রীষ্মে আবার ফিরে আসবেন নিজের দেশে ফ্যানির কাছে, ফ্যানির পাশে। সৌন্দর্যের আনন্দের কখনো হয় না ক্ষয়। কীট্‌স রুগ্‌ণ হতে পারেন, মরণোন্মুখ হতে পারেন, কিন্তু এই নিখিল বিশ্বের সৌন্দর্য-সুধা আকণ্ঠ পান করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। ফ্যানির মতো লাবণ্যময়ীকে তিনি ভালোবাসতে পেরেছেন। এই তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড়ো সত্য। সৌন্দর্য ও সত্য তাঁর কাছে অভিন্ন। যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি ফ্যানিকে লিখলেন—'My angel Fanny... I will be as patient in illness and as believing in love as I am able... I shall never... bid you an entire farewell...'

সেপ্টেম্বরের এক বিষণ্ণ ও রুক্ষ সকালে কীট্‌স জলপথে ইতালি অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে রইলেন তাঁর শিল্পী-বন্ধু জোসেফ সেভার্ন্। যখন তিনি নেপ্‌ল্‌সে এসে পৌঁছলেন তখন তিনি মৃত্যুর জন্য মনকে প্রস্তুত করে নিয়েছেন। সমস্ত জিনিস নৈর্ব্যক্তিক-ভাবে দেখবার চেষ্টা করছেন। তাঁর নিজের ভাষায়, যন্ত্রণার এক বিচিত্র স্বপ্নের মধ্য দিয়ে পদচারণা করছেন তিনি তখন এমনই একজন মানুষ। শেলী তখন নেপ্‌ল্‌সে ছিলেন, তিনি কীট্‌সকে আমন্ত্রণ জানালেন শীতকালটা তাঁর সঙ্গে কাটাবার জন্যে। কীট্‌স এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না; তিনি 'শাশ্বত নগরী' রোমের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

যখন কীট্‌স রোম-নগরীতে এসে পৌঁছলেন তখন তাঁর শ্বাসযন্ত্র বলতে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। অসহনীয় যন্ত্রণা তিনি দিবারাত্র ভোগ করছেন। চিকিৎসক যখন এলেন তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যে তখন তিনি অস্পষ্ট স্বরে প্রশ্ন করলেন, "আমার এ মরণোত্তর জীবন আর কতদিন চলবে?" কীট্‌স অহিফেনের আরক সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, আত্মহত্যার দ্বারা যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে। সেভার্ন্ সেটা সরিয়ে ফেলেন কীট্‌সের জীবন-রক্ষা করার জন্যে। বেদনা-জর্জর কীট্‌স এটাকে চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা মনে করলেন, যদিও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সেভার্ন প্রিয় বন্ধুকে বাঁচানোর জন্যেই এটা করেছেন। নিদারুণ ব্যথার গভীর আঁধারে যে কয়েকটি ক্ষীণ আলোক-

শিখা কীট্‌সকে কিছু সান্ত্বনা দিতে পেরেছিল তাদের মধ্যে সমপ্রাণ সেভার্নের গভীর প্রীতি অন্যতম। নিজের জীবন গুরুতরভাবে বিপন্ন করে স্বেচ্ছায় ও অক্লান্তভাবে সেভার্ন যেভাবে কীট্‌সের সেবা করেছেন তাতে এটা মনে করা অস্বাভাবিক নয় যে শেলী তাঁর অমর শোকগাথা 'অ্যাডোনেইস্'-এর নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে যে বিশেষ শোকার্ত ব্যক্তির কথা বলেছেন তিনি সেভার্ন ছাড়া আর কেউ নন—

What softer voice is hushed over the dead ?
Athwart what brow is that dark mantle thrown ?
What form leans sadly o'er the white death-bed,
In mockery of monumental stone,
The heavy heart heaving without a moan ?

মৃত্যু যখন অবশেষে এল ১৮২১ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তখন কীট্‌স ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন যে শেষ পর্যন্ত তিনি শান্তি পেতে পেরেছেন—সীমাহীন, চিরদিনের।

রোমে কীট্‌সের সমাধিতে যে স্মৃতিফলক আছে তাতে লেখা আছে—'Here lies one whose name was writ in water.' কবির বিনয় ও হতাশাকে ছাপিয়ে তাঁর কীর্তি আজ অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছে; সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

কীট্‌সের কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—

…নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল
আনন্দের সূর্য-পানে।

কীট্‌স প্রকৃত কবি— তিনি তাঁর জীবনমন্থনবিষ নিজে পান করে অমৃত যা উঠেছিল আমাদের দান করে গেছেন। অসুখের যন্ত্রণা ও অনুরাগের বিড়ম্বনায় জীবন তাঁর কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই অসহনীয়তার বেদনা তাঁর কাব্যে অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে – কোনো গ্লানি, কোনো দৈন্য তাঁর কবিতাকে ম্লান করতে পারে নি।

বৈরাগ্যের মাঝে কীট্‌স সার্থকতা খুঁজে পান নি— তাঁর আদর্শ ভোগ, ত্যাগ নয়। জীবনকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন— তাই জীবনের সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, তাই বিচিত্র এই বসুধার বিপুল ঐশ্বর্য তাঁর এত প্রিয়। স্বর্ণময় নন্দনকাননের চেয়েও শ্যামলা ধরণীর মূল্য তাঁর কাছে বেশি। সেইজন্যে তাঁর কবিতায় কোনো অপার্থিব সুর ধ্বনিত হয় নি। তিনি যেন খণ্ডকাব্যের কবি কালিদাস— আধুনিক কালে নব-মেঘদূত রচনা করে গেলেন।

কীট্‌স সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী। তিনি তাঁর 'এন্‌ডিমিয়ন' কাব্যে বলেছেন— 'সুন্দরের আনন্দের কখনো হয় না ক্ষয়।' পরে 'ওড অন এ গ্রীসিয়ান আর্ন' কবিতায় বলেছেন— 'সৌন্দর্য সত্য, সত্যই সৌন্দর্য।' কীট্‌সকে এক কথায় বর্ণনা করতে হলে বলতে হবে— সৌন্দর্য-কবি কীট্‌স। কীট্‌সের কাছে সৌন্দর্য সবটাই বস্তুতান্ত্রিক নয়, আবার সবটাই আধ্যাত্মিক নয়। অথচ শেলীর মতো বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রাধান্যও তিনি দেন নি। সব ভালো জিনিসের সম্পূর্ণ বিকাশের মধ্যে কীট্‌স শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের সন্ধান পান। তাঁর সৌন্দর্য-নীতি সম্বন্ধে তিনি একাধিক বার নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন— 'The mighty abstract idea I have of beauty in all things stifles the more divided and minute domestic happiness'।

সৌন্দর্য শুধু আনন্দের অন্তরেই লুকিয়ে নেই, বিষাদের ভিতরেও আছে— শুধু জীবনে নয়, মরণেও আছে। কীট্‌স তা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু এর চেয়েও বড়ো জিনিস যেটা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সেটা হচ্ছে এই— আনন্দের মাঝেই দুঃখ সুপ্ত থাকে। হর্ষের মন্দির-মাঝেই আছে অবগুণ্ঠিতা বিষণ্ণতার বেদী। শেলীর কথা মনে পড়ে— 'আমাদের প্রাণের হাসিতে মিশে আছে বেদনা সদাই।' নাইটিঙ্গেল-পাখির সুখসংগীত শুনতে শুনতে কীট্‌সের মন বিষাদভারে নম্র নত হয়ে ওঠে। গ্রীসের রম্য মর্মর-পাত্র দেখতে দেখতে জীবনের অনিত্যতার চিন্তায় চিত্ত তাঁর হয়ে ওঠে উদাস। এ যেন মধুর শব্দ শুনে, সুন্দর জিনিস দেখে সুখী হয়েও তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন। যত 'জননান্তর-সৌহৃদানি' এসে তাঁর অবচেতন মনে ভীড় জমিয়েছে।

শুধু তাঁর 'ওড্'গুলির জন্যই কীট্‌স বিশ্ববিশ্রুত হতে পারতেন। এই ওড্‌গুলির মধ্যে 'নাইটিঙ্গেল' (সুইন্‌বার্ন বলেছেন— One of the final

masterpieces of human work in all time and for all ages), 'গ্রীসিয়ান আর্ন' ও 'অটাম্' এই তিনটি কবিতা সর্বাধিক পরিচিত। 'এন্ডিমিয়ন' কীট্সের প্রথম কাব্য। তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'হাইপীরিয়ন্' তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। 'লেমিয়া', 'ইসাবেলা' ও 'ঈভ অফ সেন্ট অ্যাগ্নেস' তিনটি অনুপম কাহিনী-কবিতা। কীট্সের কয়েকটি চতুর্দশপদী কবিতাও খুব বিখ্যাত। এর মধ্যে একটি তাঁর হোমার-পরিচিতি নিয়ে লেখা। আর-একটিতে তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো অচঞ্চল হবার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। তাঁর 'নিষ্ঠুরা সুন্দরী' সম্বন্ধে কবি কভেন্ট্রি প্যাট্মোর বলেছেন— 'সম্ভবতঃ ইংরাজি ভাষায় সুন্দরতম গীতিকবিতা।' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদের প্রথম চার পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করছি—

কি ব্যথা তোমার ওহে সৈনিক,
কেন ভ্রম একা ম্রিয়মাণ ?
শুকায় শেহালা হ্রদে হ্রদে, পাখি
গাহে না গান।

কীট্সের প্রথম দিকের লেখায় অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। এটা স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও তার মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনার ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু তাঁর সমালোচকেরা 'সহৃদয়' না হওয়ায় এ-সবের কিছুই বুঝতে না পেরে কীট্সকে নিন্দা ও বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছিলেন। অরসিকের নিকট রসের নিবেদন যে কত বিপজ্জনক সেইটাই আর-একবার প্রমাণিত হল।

কীট্সের মতো এত অল্প বয়সে লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয় পৃথিবীতে খুব কম কবিই দিতে পেরেছেন। কীট্সের প্রথম কাব্য 'এন্ডিমিয়ন' লেখা হয় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে ; কীট্সের বয়স তখন মাত্র তেইশ। এতে অনেক সুন্দর সুন্দর অনুচ্ছেদ আছে, আর আছে এখানে সেখানে আলোর আভাস। কিন্তু শিল্পের দিক থেকে এটি খুব উচ্চশ্রেণীর হয় নি। কীট্স ছিলেন শব্দ-চিত্রকর। মিষ্ট অথচ ওজস্বিনী ভাষায় তিনি ছবির পর ছবি এঁকে গেছেন। তবে অনেক স্থানেই তাঁর রচনায় অতিরিক্ততা-দোষ এসে পড়েছে। ক্রমশ কীট্স তাঁর পরবর্তী রচনাগুলিতে সংযত হয়ে উঠেছেন।

পরাভূত দেবতা স্যাটার্নের নৈরাশ্য ও বেদনা নিয়ে 'হাইপীরিয়ন'-(১৮১৯) কাব্যের সূত্রপাত। স্যাটার্ন্ দ্বিতীয় যুগের দেবতা, অন্যান্য সহচর-

দেবতাদের সঙ্গে তিনি সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন। তাঁদের বিতাড়নের মূলে রয়েছে তাঁর নিজেরই সন্তান-সন্ততি যাঁরা 'অলিম্পিয়ান্'রূপে পরিচিত। অবশ্য স্যাটার্নের নিজের যৌবনাবস্থায় তিনি ও তাঁর শ্রেণীর অন্যান্যরা তাঁর পিতা ইউরেনাস্ ও ইউরেনাসের সহচরদের সিংহাসনচ্যুতি ঘটান। হাইপীরিয়ন্ (সূর্য-দেবতা) শুধু এই গোষ্ঠীর একমাত্র দেবতা যিনি এখনও পর্যন্ত অপরাভূত। তাঁর পত্নী থীআ এসেছেন স্যাটার্ন্‌কে প্রবোধিত করার জন্যে। তিনি স্যাটার্ন্‌কে বান্ধব-সকাশে নিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে হাইপীরিয়ন তাঁর প্রাসাদে অবরোহণ করেছেন ও কতকগুলি অশুভ লক্ষণ দেখে উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। তাঁর পিতা কএলুস্ তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। দ্বিতীয় সর্গে হাইপীরিয়নকে আমরা স্যাটার্ন, থীআ প্রভৃতি বিজিত দেবতাদের সঙ্গে দেখি। সেখানে স্যাটার্ন্ সকলের মত জানতে চান। সমুদ্র-দেবতা বললেন, অদৃষ্টের লিখন মেনে নেওয়া উচিত, কারণ '...'t is the eternal law/That first in beauty should be first in might।' এর আগে তিনি বলেছেন—

> We fall by course of Nature's law, not force
> Of thunder, or of Jove.

ক্লাইমেনী বললেন, 'প্রভাত-উজ্জ্বল' অ্যাপোলোর মধুর স্বরলহরী তিনি শুনেছেন। এন্‌কেলাডুস্ প্রতিশোধের জন্যে সকলকে উদ্‌বুদ্ধ করলেন। এর পরে হাইপীরিয়নের আবির্ভাব ঘটল। তৃতীয় সর্গে আমরা দেখি, হাইপীরিয়নের যিনি স্থলাভিষিক্ত হবেন সেই অ্যাপোলোকে একটি দ্বীপে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায়। স্মৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী নেমোসাইনী এসে তাঁকে দেবত্ব দান করলেন। মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অ্যাপোলো নবজন্মলাভ করলেন— এ হচ্ছে 'die into life'; এ যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই সাধারণ মানুষ কবিতে রূপান্তরিত হয় (এর আভাস কীট্‌স ইতিপূর্বে Sleep and Poetry-তে দিয়েছেন)। অ্যাপোলো কাব্যের অধীশ্বর; কবিদের মতো তিনিও তাই 'দ্বিজ'। এইখানেই 'হাইপীরিয়ন'-এর খণ্ডাংশের সমাপ্তি।

কীট্‌স কেন এই কাব্যকে অসম্পূর্ণ রেখেছেন তা নিয়ে অনেক জল্পনা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, মিলটনের প্রভাব এত বেশি এসে পড়েছিল যে রচনা হঠাৎ বন্ধ করা ছাড়া কীট্‌সের উপায়ান্তর ছিল না। পরে কীট্‌স আর-একবার এ বিষয়ে লেখবার চেষ্টা করেন The Fall of Hyperion, A

Dream নামে ; এটিও অসম্পূর্ণ থাকে। দ্বিতীয় কাব্যে দান্তের প্রভাব পরিস্ফুট। কবিত্বের বিকাশে বেদনার দানের কথা এখানে আরো স্পষ্ট। The Prelude-এর মতো The Fall of Hyperion-কেও আমরা কবির 'অন্তর্জীবনের আলেখ্য'রূপে বর্ণনা করতে পারি।

১৮১৯ ও ১৮২০ সালে কীট্স যে কবিতাগুলি লিখেছেন তার অধিকাংশই এত উচ্চশ্রেণীর হয়েছে যে ম্যাথ্যু আর্নল্ডের কথা 'He ( Keats ) is with Shakespeare' কিছুমাত্র অত্যুক্তি বোধ হয় না। এন্‌ডিমিয়নের কীট্স এবং ওড্ টু অটামের কীট্সে যে বিপুল পার্থক্য সেটা অত্যন্ত বিস্ময়কর। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত প্রভূত উন্নতি অন্য কোনো প্রথম শ্রেণীর কবির সাহিত্য-জীবনে দেখা গেছে কি না সন্দেহ।

ফ্যানি ব্রনের প্রতি কীট্সের অনুরাগ এই আকস্মিক উন্নতিতে অনেকটা সাহায্য করেছিল। এক সময় অবশ্য সমালোচকেরা ঠিক এর বিপরীত মত প্রকাশ করেছিলেন। সার্ সিড্‌নি কল্‌ভিনের কীট্স-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবার্ট লিণ্ড্ সিদ্ধান্ত করেন যে ফ্যানির সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকেই কীট্সের কবিতায় দ্রুত উন্নতি দেখা যায়। তুলনামূলক আলোচনার পর তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন। এর পরেও অনেকে লিণ্ডের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি হন নি। তার কারণ তাঁরা ফ্যানিকে হৃদয়হীনা বিলাসিনী বলেই জানতেন। আসলে ফ্যানি ততটা হৃদয়হীনা ছিলেন না এঁরা যতটা মনে করতেন। এই ফ্যানির উদ্দেশ্যেই কবি লিখেছেন—'তুমি আমাকে অভিভূত করেছ·· তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারি না।··· ভালোবাসাই আমার ধর্ম, এর জন্যে আমি যে মরতে পারতুম' (·১৩ই অক্টোবরের চিঠি)। ফ্যানির প্রতি তাঁর প্রেম এত গভীর ছিল বলেই যখন তিনি এর ব্যর্থতা বুঝেছিলেন তখন তাঁর হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল। মরণ ছাড়া তাঁর কাছে আর শান্তির পথ খোলা ছিল না। তিনি একবার শ্রীমতী ব্রনকে লিখেছিলেন—'যখন বেড়াই তখন দুটি বিলাস আমার চিন্তা করার জন্য থাকে— তোমার লাবণ্য ও আমার মৃত্যুর মুহূর্ত। ওঃ, যদি একই সময়ে এ দুটিই আমি পেতে পারতুম' ( ২৫শে জুলাইয়ের চিঠি )। ফ্যান ব্রন্‌কে লেখা কীট্সের প্রেমপত্রগুলি আজ পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত। আর্নল্ড্ যে এক সময় এগুলির প্রতি অত্যন্ত অবিচার করেছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর নিজের যুগের নিরিখে তিনি

পূর্ববর্তী যুগকে বিচার করতে গিয়েছিলেন, তাঁর ভুলটা হয়েছিল এইখানে। তাই কীট্‌সের অনুরাগ-লিপিতে শালীনতার অভাব তিনি আবিষ্কার করেছিলেন।

কীট্‌সের কবিতা মোটামুটি বুঝতে কোনো কষ্ট হয় না, কিন্তু তাঁর কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে হলে তাঁর চিঠিগুলি অপরিহার্য। এগুলি যেন তাঁর কাব্যের স্বকৃত ভাষ্য। কীট্‌সের কবিতার স্থানে স্থানে একটা অপরিণত মনের ছাপ রয়ে গেছে— কিন্তু তাঁর পত্রাবলী সম্বন্ধে এ কথা ততটা প্রযোজ্য নয়। চিঠিগুলির মধ্যে এক পরিণত, বিদগ্ধ মনের স্পষ্ট পরিচয় আছে। সেদিক দিয়েও এগুলির মূল্য অসীম। প্রথম যৌবনে অনেকের মনেই একটা সংঘাতের সৃষ্টি হয় ভাবনাতে সহসা যখন জীবনদেবতা একটা ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দেন। কীট্‌সের জীবনে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছিল এবং তাঁর চিঠি ও কবিতা দুয়ের মধ্যেই তা প্রকাশ পেয়েছে। তবে 'Endymion'-এর ভূমিকায় তিনি যে 'mawkishness'-এর উল্লেখ করেছেন সেটা যেন প্রথম দিকের তাঁর কবিতাতেই বেশি পরিস্ফুট। কীট্‌সের জীবন নানাদিক থেকে আমাদের হ্যামলেটের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দুজনের কেউই সংসারের ভালোমন্দর দ্বন্দ্বের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি। দুজনের মৃত্যুতেই হোরেশিওর ভাষায় বলা চলে—

> Now cracks a noble heart. Good night, sweet prince,
> And flights of angels sing thee to thy rest !

কীট্‌সের কাব্যগ্রন্থের পাতায় পাতায় এক 'মহৎ হৃদয়' মূর্ত হয়ে উঠেছে, ছড়িয়ে আছে এক বিশাল বিশ্বজনীনতা। এইজন্যই তাঁর স্থান শেক্সপীয়রের পাশে। তাঁর জীবনের যদি পূর্ণ পরিণতি হতে পারত তা হলে হয়তো তাঁর সাহিত্যেও আমরা একটা প্রগাঢ় প্রশান্তির সুর শুনতে পেতুম। তাঁর শেষ গানের রেশের মধ্যে শেক্সপীয়রের শেষ নাটকগুলির মূল সুরটি অনুরণিত হত। শেক্সপীয়রের মতো কীট্‌সেরও ছিল Negative Capability। কীট্‌স শেক্সপীয়রের মতো 'small Latin and *less Greek*'-এর জ্ঞান নিয়েও প্রাচীন জগতের একটা প্রাণময় প্রতিচ্ছবি আঁকতে পারতেন। কীট্‌সের কবিতা পড়তে পড়তে স্থলবিশেষে মনে হয় যেন বহু যুগের ওপার হতে কোন্ গ্রীক কবির কথা ভেসে আসছে। প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে কীট্‌স সুন্দরভাবে দেবতার

মূর্তি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর শরৎবর্ণনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেলী বলেছেন, 'Keats was a Greek।'

অবশ্য শৈলীর দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে কীট্স সাধারণত গথিক্ ( Gothic ) রীতিরই অনুবর্তন করেছেন। গ্রীক কলার প্রধান বৈশিষ্ট্য frugality-র পরিচয় আমরা তাঁর লেখায় পাচ্ছি না, পাচ্ছি 'fine excess'। তাঁর রচনায় সমগ্রের অপেক্ষা অংশের আকর্ষণ বেশি কারণ এখানে এককে উপেক্ষা করে বিচিত্রের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হেমন্তের নৈঃশব্দ্য এখানে নেই, আছে বসন্তের মুখরতা।

ভাষার উপরে কীট্সের আশ্চর্য দখলও শেক্সপীয়রের কথা মনে করিয়ে দেয়। চমকপ্রদ সৌন্দর্য, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা, সুরের ঝংকার ও সুষ্ঠু বাক্যবিন্যাসে কীট্সের ভাষা শেক্সপীয়রের ভাষার সহিত তুলনীয়। নতুন শব্দের সৃষ্টিতে দুজনেই নিপুণ।

কীট্স শেক্সপীয়রের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—'I have good reason to be content, for thank God I can read and perhaps understand Shakespeare to his depths।' অন্যান্য কবি যাঁরা কীট্সের কবিজীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে চসার, 'Elfin-poet' স্পেন্সার, মিল্টন, ওয়ার্ডসোয়ার্থ ও হান্টের নাম করা যেতে পারে।

রোমান্টিক কবিমানসের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে কল্পনার স্ফূর্তি। রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক রোমান্টিক গ্রন্থের কবি তাই নাম দিয়েছিলেন 'কল্পনা'। কবি-কল্পনার বিকাশের দিক থেকে কীট্সের কবিতাই উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজি রোমান্টিক সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই কল্পনার সাহায্যে কখনো কীট্স চলে গেছেন দূরে বহুদূরে শস্যক্ষেত্রের মাঝে রোরুদ্যমানা রুথের পাশে কখনো মানসনেত্রে নিরীক্ষণ করেছেন গ্রীক দেবতার অনিন্দ্য মূর্তি। অতীতাশ্রয়ী কল্পনার দিক থেকে তিনি স্কটের সমগোত্রীয়।

শব্দের সাহায্যে কীট্স অতি সুন্দরভাবে ছবি ফুটিয়ে তোলেন। 'ঈভ অফ সেণ্ট অ্যাগ্নেস' কবিতায় নায়িকার ঘরের বাতায়নে চন্দ্রালোক পড়ায় যে অপূর্ব রঙিন মায়াজালের সৃষ্টি হয়েছিল তার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আছে। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটির জন্যই কীট্স তাঁর কবিতায় উপচার-সম্ভার

সাজিয়েছেন। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধে ঘেরা বিচিত্র অনুভূতিগুলি তিনি নিজে অন্তর দিয়ে অনুভব করেন ও নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রকাশ করেন।

তাঁর 'Sleep and Poetry' কবিতা এবং তাঁর চিঠিগুলি থেকে আমরা কীট্সের আদর্শ সম্বন্ধে অনেক জিনিস জানতে পারি। কবিতা বলপ্রয়োগের দ্বারা আমাদের বশীভূত করবে না। সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে আমাদের চিন্তাকে উন্নত করবার চেষ্টা করবে। কবি কোনো থিয়োরি নিয়ে গবেষণা করবেন না, মধুকরী কল্পনাই হবে তাঁর প্রধান সহায়িকা। কবিতা হবে স্বত-উৎসারিত। 'If poetry comes not as naturally as leaves to a tree it had better not come at all.' কীট্স ওয়ার্ড্সোয়ার্থ-কোল্‌রিজ-শেলীর মতো নিবন্ধ রচনা করে নিজের মতবাদ প্রচার করেন নি। বায়রনের মতো আত্ম-মাহাত্ম্যে কবিতা পূর্ণ করেন নি। ফরাসী বিপ্লব তাঁর লেখায় কোনো ছাপ ফেলতে পারে নি, যেমন পারে নি উদারহৃদয় ল্যামের লেখায়। ল্যামের মতো কীট্সের লেখাতেও বিষাদের একটা মূর্ছনা শোনা যায়। তবে কীট্স অনেকবার আমাদের আশার বাণীও শুনিয়েছেন মুক্তকণ্ঠে। তাঁর 'There is a budding morrow in midnight'-এর মতো সঞ্জীবনী বাণী ইংরাজি সাহিত্যে খুব কমই আছে।

পরবর্তী কালে কীট্সের রচনা থেকেই 'প্রাক্-র‍্যাফেলীয়' কবিগণ অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, আর অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন টেনিসন। তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে শেলী তাঁর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কীট্সের মৃত্যুর পর শেলী এক অমর শোকগাথা ('Adonais') রচনা করেন।

কীট্সের কবিতায় ওয়ার্ডসোয়ার্থের দিব্যদর্শন নেই, বায়রনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নেই, শেলীর আকাশ-পরিক্রমণ নেই, কোলরিজের অতীন্দ্রিয়বাদ নেই—আছে এক সরস সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যই কীট্সের কবিতাকে অক্ষয় করে রেখেছে।

## রবার্ট্ ব্রাউনিঙ

১৮১২ - ১৮৮৯

I would LOVE infinitely and be beloved !

BROWNING

১৮১২ খ্রীস্টাব্দের ৭ই মে (সেদিনও কি পঁচিশে বৈশাখের শুভ লগ্ন ছিল?) লণ্ডন-নগরীর এক বিত্তশালী ব্যাঙ্ক-কর্মচারীর পরিবারে রবার্ট্ ব্রাউনিঙের জন্ম হয়। রবার্টের পিতা শুধু সদাশয় ও উদার-মতাবলম্বীই ছিলেন না, পড়াশুনায় তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। তিনি নিজে পুত্রের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করেন। ব্রাউনিঙ স্কুল-কলেজের গতানুগতিক পথে বিদ্যার্জন করেন নি। গৃহের অভ্যন্তরেই তাঁর শিক্ষা; আর এ শিক্ষা শুধু তাঁর চিন্তার বিকাশকেই সাহায্য করে নি, তাঁর শরীরকেও সুস্থ সবল ভাবে গড়ে তুলেছে। এ দিক থেকে তাঁকে সার্ ফিলিপ্ সিড্‌নির মতো এলিজাবেথীয় যুগের 'ভদ্রলোকের' সঙ্গে সহজেই তুলনা করা চলে। তাঁর নিজের শরীরে এত শক্তি ছিল বলেই তাঁর কবিতায় দৈহিক প্রাণশক্তি এতবার এত প্রবল ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। খুব ছোটোবেলাতেই ব্রাউনিঙ বাবার কাছে গ্রীক ও রোমান উপকথার গল্প শুনতে আরম্ভ করেন ও সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ শৈশবেই তাঁর মজ্জাগত হয়ে যায়। পরে কিছুদিন তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ও ল্যাটিন ক্লাসেও যোগ দিয়েছিলেন। পিতার পুস্তকাগারে পুস্তকের সংখ্যাই শুধু অগণিত ছিল না; নানা বিচিত্র ধরনের গ্রন্থে তা সমৃদ্ধ ছিল। সেই পুস্তকাগারের দ্বার বাল্যকালেই ব্রাউনিঙের কাছে উন্মুক্ত হয়।

মাতার দিকেও ব্রাউনিঙ ছিলেন ভাগ্যবান। অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালিনী সুশ্রী এই মহিলা তাঁর সস্নেহ যত্নে ব্রাউনিঙকে ঘিরে রেখেছিলেন। আর তিনি

ছিলেন সংগীতজ্ঞা ; তাঁর সংগীতে অনুরাগ খুব সহজেই শিশু রবার্টের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। অনেক সময় তিনি আপন মনে পিয়ানোয় উন্মাদক সুরের তরঙ্গ তুলতেন আর রবার্ট্ কখন এসে দ্বারদেশে দাঁড়াত জানতেও পারতেন না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে আবিষ্ট হয়ে এই সংগীত-সুধা গ্রহণ করত সব ইন্দ্রিয় দিয়ে। তাঁর মায়ের কাছ থেকে ব্রাউনিঙ অধ্যাত্ম-জীবনেরও দীক্ষা পান। খ্রীস্টধর্মে এই মহীয়সীর ছিল অবিচল নিষ্ঠা এবং সেটা ব্রাউনিঙের অন্তরে ভক্তির ভাব জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। তাঁর মহান্ পিতার কাছ থেকে ব্রাউনিঙ মানব-চরিত্রে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন : আর মাতার কাছ থেকে পান মানব-আত্মার উপলব্ধি।

১৮৩৩ অব্দে ব্রাউনিঙের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পলাইন্ ঃ স্বীকারোক্তির খণ্ডাংশ' প্রকাশিত হয়। শেলীর প্রভাব এই গ্রন্থে ছত্রে ছত্রে। শেলীর উদ্দেশ্যে এখানে বলা হয়েছে—

Sun-treader, life and light be thine for ever!

এই গ্রন্থ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি ; বিংশতি-বছরের তরুণ কবির প্রথম কাব্যে অপরিণতির ছাপ স্পষ্ট। তবে তার চেয়ে যেটা স্পষ্টতর সেটা হচ্ছে লেখকের প্রকৃত কবিত্ব-শক্তি। পরবর্তী কালের ব্রাউনিঙের পরিণত কবিপ্রতিভার প্রথম উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি 'পলাইন্'। রোমান্টিক সুরের ঝংকার সর্বত্র। যে প্রেম বিষয়-বস্তু রূপে ব্রাউনিঙের বহু কবিতায় আমরা পাই সেই প্রেমই এ কাব্যেরও মুখ্য বিষয়। কাব্যের প্রারম্ভেই সেটা বোঝা যায়—

Pauline, mine own, bend o'er me— thy soft breast
Shall pant to mine— bend o'er me— thy sweet eyes,
And loosened hair, and breathing lips, and arms
Drawing me to thee...

তবে এখানেও মানব-প্রেম ও অধ্যাত্ম-অনুভূতি একাকার হয়ে গেছে। একাকিত্বের বেদনা দূর হতে পারে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়ে ও ঐশী প্রেম উপলব্ধির প্রথম সোপান মানব-প্রেম। তাই তিনি বলেন, 'Pauline, I am thine for ever', তাই প্রিয়তমার কাছে তাঁর প্রার্থনা, 'Love me, Pauline,— leave me not'। কাব্যের শেষে সূর্যাভিসারী শেলী আবার ফিরে এসেছেন—

Sun-treader, I believe in God, and truth,
And love ; ... I would lean on thee.

দু বছর পরে প্রকাশিত হয় নাট্যরসাশ্রিত কাব্য 'প্যারাসেল্সাস্'— পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন অপরসায়নবিদের জীবন ও চরিত্রের বিশ্লেষণ। রেনেসাঁস্-যুগ সম্বন্ধে ব্রাউনিঙ কৈশোর থেকেই আগ্রহী ছিলেন আর আগ্রহী ছিলেন মানব-মনের বিশ্লেষণে। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় 'প্যারাসেল্সাস্'-এ সমুজ্জ্বল। জীবনের পূর্ণ পরিণতি সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আমরা কবির নিজের ভাষাতেই বলতে পারি—

Unless God send his hail
Or blinding fire balls, sleet or stifling snow,
In some time, his good time, I shall arrive.

১৮৩৭ অব্দে ব্রাউনিঙের প্রথম নাটক 'স্ট্র্যাফোর্ড্' প্রকাশিত হয়। এই নাটক মঞ্চে একেবারেই সফল হতে পারে নি। ব্রাউনিঙের পরবর্তী নাটক-গুলি সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। ব্রাউনিঙ মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে এত ব্যস্ত থাকতেন যে সেই নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ ঘটাতে পারতেন না যেটা না থাকলে নাটক জমে না। নাট্যশিল্পের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক ব্রাউনিঙের হাতে অবহেলিত হত।

ব্রাউনিঙের প্রথম দিকের কাব্যের মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে 'সর্ডেলো' ( ১৮৪০ )। কথিত আছে, টেনিসন এটি পড়ার পর কিছুই বুঝতে না পেরে মনে করেছিলেন যে তিনি তাঁর মস্তিষ্ক-শক্তি হারিয়েছেন। কাব্যটি যে জটিল ও দুর্বোধ্য সে বিষয়ে অবশ্য কেউই সন্দিহান নন। পরিহাসচ্ছলে বলা হয়, কাব্যটি খুবই সরল যদি শুধু প্রথম ও শেষাংশ ধরা হয়—

Who will, may hear Sordello's story told

এবং

Who would has heard Sordello's story told.

'পিপা পাসেস্' খানিকটা নাটক-ধরনের। বছরে পিপা একদিনই ছুটি পায়— নববর্ষের দিন। সে ছুটির দিনে কণ্ঠে গান নিয়ে চলেছে শহরের পথে পথে। সে আপন মনে গান গেয়ে চলেছে— সকাল থেকে দুপুর, সন্ধ্যা থেকে রাত্রি। তার গান বিভিন্ন স্ত্রী-পুরুষের কানে আসছে এমন একটা সময়ে

যখন তাদের জীবনের সংকটাপন্ন মুহূর্ত, এবং সেই গান তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসছে। যে ঈশ্বর আমাদের জীবনের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে মিশে আছেন তাঁকে আমরা অনেক সময় ভুলে যাই ; ভুলে যাই তাঁর কল্যাণ-বাণী যেটা আমাদের বিবেকের মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়। হঠাৎ একটা ছোটো কাজ, অস্পষ্ট শব্দ, অস্ফুট চিন্তা বা ভেসে-আসা গানের কলি আমাদের ভাবনাতে ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে জীবনের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটাতে পারে। পিপার গান তারই সাক্ষ্য বহন করছে। প্রথম গানের শেষ পঙ্‌ক্তিগুলি বিশ্ব-বিশ্রুত—

God's in his heaven—
All's right with the world!

ব্রাউনিঙের জীবনের স্মরণীয়তম ঘটনাটি ঘটে ১৮৪৬ অব্দে— জনপ্রিয় কবি এলিজাবেথ ব্যারেটের সঙ্গে তাঁর বিবাহ। তাঁদের পূর্বরাগের কাহিনী বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। মিস্ ব্যারেটের কবিতা পড়ে মুগ্ধ, সচকিত, অভিভূত ব্রাউনিঙ তাঁকে লেখেন— 'I love your verses with all my heart, dear Miss Barrett, and I love you too!' তাঁর সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে ব্রাউনিঙ কিছুই জানতেন না, পরিচয় তো ছিলই না, তবু পত্রে হৃদয়োচ্ছ্বাস গোপন করতে পারেন নি। পরে খবর নিয়ে জানলেন, এলিজাবেথ থাকেন উইম্‌পোল্ স্ট্রীটের একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন বাড়িতে, প্রায় পঙ্গু অবস্থায়। তাঁর কঠোর-প্রকৃতি পিতা কন্যার প্রতি একেবারেই সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন না। সকলের সঙ্গে দেখা করার অনুমতিও এলিজাবেথ পেতেন না। ব্রাউনিঙের কি তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব? ব্রাউনিঙের চিঠির উত্তরে এলিজাবেথ যা লিখলেন তাতেও উদ্দীপনার অভাব ছিল না। যদিও তখন তাঁর কবিখ্যাতি রবার্টের চেয়ে অনেক বেশি, ব্রাউনিঙের কবি-প্রতিভার মহত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমতী ব্যারেটের কোনো সংশয় ছিল না। এমন একজন কবির কাছ থেকে নিজের কবিতার প্রশংসনীয় স্বীকৃতি পেয়ে এলিজাবেথও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন— 'You are masculine to the height— and I, as a woman, have studied some of your gestures of language and intonation wistfully, as a thing beyond me far!"

তাঁদের চিঠিপত্র ক্রমশ বেড়ে চলল, এলিজাবেথ কিন্তু ব্রাউনিঙকে গৃহে আমন্ত্রণ

করার সুযোগ বা সাহস সহজে পেলেন না, যদিও তাঁরা দুজনেই পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাতে আলাপ করার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। তার পর একদিন সেই আকাঙ্ক্ষিত লগ্ন এল। তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের একমাত্র সাক্ষী হয়ে রইল এলিজাবেথের পোষা কুকুর ফ্লাশ্।

ঘনীভূত অনুরাগ নিয়ে ব্রাউনিঙ যখন বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন তখন প্রথমে সেটা এলিজাবেথের কাছে অকল্পনীয় মনে হয়েছিল। তার পর একদিন এল যখন তিনি নিজের হৃদয়ের দিকে চেয়ে সাহস সঞ্চয় করলেন ও ব্রাউনিঙের প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন। ব্রাউনিঙ তাঁকে উইম্‌পোল্ স্ট্রীটের বাড়ি থেকে লুকিয়ে নিয়ে গেলেন গির্জাতে, যেখানে অনাড়ম্বর ভাবে তাঁদের বিবাহের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। তার পর তাঁরা বেরলেন ইউরোপ পরিক্রমায়। ফ্রান্স থেকে তাঁরা গেলেন ইতালিতে। দুজনের হৃদয়ই ভালোবাসায় কানায় কানায় ভরে গেছে। রুগ্‌ণ এলিজাবেথ প্রেমের মধ্য দিয়ে নবজীবন লাভ করলেন। ব্রাউনিঙও জীবনে প্রথম পরিপূর্ণতার আনন্দ উপলব্ধি করলেন।

বিবাহের পর ব্রাউনিঙের কবিপ্রতিভা উত্তরোত্তর বিকশিত হয়। এর সার্থক প্রকাশ আমরা 'মেন অ্যাণ্ড উইমেন' কাব্যগ্রন্থে দেখি। এই গ্রন্থের dramatic monologueগুলির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন চরিত্র তাদের নিজেদের জীবনের কয়েকটি দিক উদ্‌ঘাটিত করেছে। তাদের প্রকৃতি সম্পর্কেও আমরা একটা ধারণা করতে পারছি। নায়ক বা নায়িকার জীবনের কোনো একটা সংকট-মুহূর্তে সাধারণত এই 'নাটকীয় স্বগতোক্তি'র সূচনা। সে তার বক্তব্য বলে যাচ্ছে— অন্তরালে এক বা একাধিক শ্রোতা বা শ্রোত্রীর উপস্থিতিও অনুভব করা যাচ্ছে। মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণই ব্রাউনিঙের প্রধান উদ্দেশ্য ও সে দিক থেকে ব্রাউনিঙ সর্বতোভাবে সাফল্য অর্জন করেছেন। কবিতাগুলির মধ্যে 'ফ্রা লিপ্পো লিপ্পি' ও 'আন্‌ড্রিআ ডেল্ সার্টো' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিত্রশিল্পে ব্রাউনিঙের জ্ঞান ও অনুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় এই কবিতাগুলিতে পাওয়া যায়। তিনি ভাসারি-কৃত চিত্রশিল্পীদের চরিত-গ্রন্থ সযত্নে অধ্যয়ন তো করেইছিলেন, তাঁদের আঁকা ভালো ভালো ছবি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিলেন। ফ্রা লিপ্পো লিপ্পি সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করে ছিলেন বটে, কিন্তু জীবনকে শুষ্ক নিয়মচর্চার মধ্যে নির্বাসিত করতে পারেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন, শরীরকে বাদ দিয়ে আত্মার অস্তিত্ব থাকতে

পারে না, তাই তাঁকে যখন বলা হল, 'Paint the soul, never mind the legs and arms', তখন এ উক্তি তাঁর কাছে একেবারে অর্থহীন মনে হল। রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, এ-সব তো ঈশ্বরের সৃষ্টি—

The beauty and the wonder and the power,
The shapes of things, their colours, lights and shades,
Changes, surprises— and God made it all !

জগৎ-সংসারকে পরিত্যাগ করে যে জীবন, সে জীবন কখনোই সত্য হতে পারে না। তাই তিনি বলেন—

This world's no blot for us,
Nor blank— it means intensely, and means good :
To find its meaning is my meat and drink.

ব্রাউনিঙের বহু ধর্মমূলক কবিতা আছে, তাদের মধ্যে অনেকগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার পর্যায়ে পড়ে। তাঁর ভক্তিরসের কবিতাগুলির মধ্যে মহত্তম 'সল্' 'মেন অ্যাণ্ড উইমেন' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। যে কথা তিনি 'কার্শিশ্' কবিতায় বলেছেন, সেই কথাই 'সল্' এবং 'ক্লেঅন্'-এও উচ্চারিত হয়েছে—

So, through the thunder comes a human voice
Saying, 'O heart I made, a heart beats here !
Face, my hands fashioned, see it in myself.
Thou hast no power nor may'st conceive of mine,
But love I gave thee, with Myself to love,
And thou must love me who have died for thee.'

ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ব্রাউনিঙের অন্তরের অনুভূতি— এ দিক থেকে তাঁকে আমরা 'মিস্টিক্'-কবি বলতে পারি। ঐশী মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে তিনি কখনো আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন নি। ওই মহিমা তিনি সংসারের সর্বত্র ছড়ানো দেখেছেন। ব্লেক্ ও ওয়ার্ডসোয়ার্থের মতো তিনিও ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, সব জিনিসে সব অনুভূতিতে ঐশী স্পর্শ অনুভব করেছেন। মিস্টিসিজম্ যদি রোমান্টিসিজমের প্রধান অঙ্গ হয় তা হলে রবার্ট ব্রাউনিঙ মনে-প্রাণে রোমান্টিক।

১৮৬১ অব্দের ২৯শে জুন সামান্য রোগভোগের পর এলিজাবেথ ব্যারেট্ ব্রাউনিঙের মৃত্যু হয়। প্রথমে এই আকস্মিক আঘাতে ব্রাউনিঙ বিমূঢ় হয়ে

পড়েছিলেন। পরে ক্রমশ নিজেকে কঠিন করে নেন। সাহসের অভাব তাঁর জীবনে কোনোদিন হয় নি ; সেই সাহসই তাঁকে শক্তি দিল। পুত্রের শিক্ষায় ও কবিতা রচনায় তিনি মনোনিবেশ করলেন। ১৮৬৪ অব্দে তাঁর 'ড্রামাটিস্ পার্সোনি' প্রকাশিত হয়। আর এর চার-পাঁচ বছর পরে 'দ্য রিং অ্যাণ্ড দ্য বুক' ; এটিকে অনেকে ব্রাউনিঙের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি মনে করেন।

পুরোনো একটি হলদে রঙের বইতে ব্রাউনিং ইতালির একটি হত্যাকাণ্ড ও সেই হত্যার বিচার-সংক্রান্ত কাহিনী পড়েন। গ্রন্থের নামে যে 'অঙ্গুরীয়'র কথা বলা হয়েছে তা কষিত কাঞ্চন— অনলংকৃত সত্য। একটু কল্পনার খাদ মিশিয়ে তাকে গ্রন্থে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই খাদটুকু এসেছে অনিবার্য ভাবে কারণ ব্রাউনিঙ হত্যা ও তৎসংক্রান্ত বিচার দশবার দশটি বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন সম্ভ্রান্ত-বংশীয় কাউণ্ট গিডো, হত্যার অপরাধে যিনি অপরাধীরূপে বিচারের সম্মুখীন ; তাঁর স্ত্রী পম্‌পিলিয়া, যিনি সাধারণ পরিবারের মেয়ে ও মারাত্মক আঘাতে মৃত্যুশয্যায় শায়িতা ; তরুণ পুরোহিত ক্যাপন্‌সাচি, যিনি পম্‌পিলিয়ার বিপদের সময় তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন ; ধর্মাধিকর্তা পোপ্, যিনি সব কোলাহলের উর্ধ্বে উঠে সুবিচার করার চেষ্টা করেছেন। প্রতিটি অধ্যায় খুঁটিনাটি বর্ণনায় এত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে যে দশবার একই ঘটনার আলোচনা হলেও সেটা কখনোই উদ্‌বেজক হয়ে ওঠে নি।

শেষ জীবনে ব্রাউনিঙ কয়েকটি গ্রীক ট্র্যাজেডির সুন্দর অনুবাদ করেন। ১৮৭৮ অব্দে তিনি তাঁর প্রিয় দেশ ইটালিতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে এগারো বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয় (১২ ডিসেম্বর ১৮৮৯)। মৃত্যুর দিনই তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, 'অ্যাসোলাণ্ডো' ; এই গ্রন্থের অন্তিম কবিতা 'এপিলোগ্'-এ তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাতে কোনো অত্যুক্তি নেই ও সেটাই তাঁর সম্বন্ধে আমাদের শেষ কথা—

> One who never turned his back but marched breast forward,
> Never doubted clouds would break,
> Never dreamed, though right were worsted, wrong would triumph,
> Held we fall to rise, are baffled to fight better,
> Sleep to wake.

১

## ব্রাউনিঙের প্রেমের কবিতা

রবার্ট ব্রাউনিঙের প্রেমের কবিতায় অন্তহীন বৈচিত্র্য। তাঁর নিজের প্রেম তাঁর জীবনের মহাসম্পদ্‌গুলির অন্যতম ছিল— তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন 'প্রেম সর্বোত্তম' ( Love is best )। তাই তাঁর কবিতায় প্রেমের মহত্তর দিকের সুস্পষ্ট প্রকাশ আমরা বহুবার পেয়েছি। প্রেম মনকে কত প্রশস্ত করে, জীবনকে কত মহিমান্বিত করে, জগতকে কত সুন্দর করে তা ব্রাউনিঙের কবিতায় আমরা যেমন করে জানতে পেরেছি এমন করে এর আগে আর জানি নি। আবার এই সঙ্গে প্রেমের অন্য দিকগুলিও তাঁর কবিতায় ফুটেছে। প্রেমের যে দিকটায় আমরা মানসীকে মানুষী রূপেই পেতে চাই, একটুকু ছোঁয়া-লাগা ও একটুকু কথা শোনা নিয়ে মনে মনে ফাল্গুনী রচনা করি, সে দিকটায়ও তাঁর দৃষ্টি রয়েছে। প্রেমের স্বাভাবিক অস্বাভাবিক বহুবিচিত্র গতিভঙ্গী তাঁর কবিতার বিভিন্ন ধারায় তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। দেহ ও দেহাতীত, সীমা ও অসীম, নীড় ও আকাশ— এদের মিলনে সার্থক হয়েছে ব্রাউনিঙের প্রেমের কবিতা।

বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে-সব কবি প্রেমের কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান অন্য সকলের চেয়ে অনেক উঁচুতে। ব্রাউনিঙের মতো তিনিও প্রেমকে অসংখ্য দিক থেকে দেখেছেন। তিনিও সীমা-অসীমের মিলন ঘটিয়েছেন। তাঁর কবিতাতেও মৃত্তিকার সন্তান মানুষের প্রেমের পরিচয় আমরা যেমন পাচ্ছি তেমনি অমৃতের পুত্র মানুষের প্রেমের পরিচয় পাচ্ছি। অনেক স্থলেই তাঁর কবিতা আমাদের ব্রাউনিঙের কবিতা স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ পড়ে যেন ব্রাউনিঙকে আমরা আরো ভালো করে বুঝতে পারি। প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রে কে বেশি বড়ো সে বিচার করতে না যাওয়াই ভালো। তবে প্রেমের গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড়ো পৃথিবীতে আর কোনো গীতিকার আছেন বলে আমি জানি না।

রবীন্দ্রনাথের রচনা কতটা আত্মজীবনীমূলক তা ঠিক করার এখনও সময় আসে নি। কিন্তু ব্রাউনিঙের নিজের জীবনের ছাপ তাঁর কবিতায় বড়ো একটা চোখে পড়ে না। বরং এলিজাবেথ ব্যারেট্ স্বরচিত প্রেমের কবিতায়

নিজেকে অনেক বেশি ধরা দিয়েছেন। প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের মতো ব্রাউনিঙ অন্যের চরিত্র বিশ্লেষণ করতেই বেশি ভালোবাসেন।[১]

অবশ্য 'One Word More', 'By the Fireside' প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতায় তাঁর নিজের জীবনের সুরের অনুরণন শোনা যায়। ব্রাউনিঙ যখন পম্পিলিয়া সম্বন্ধে 'The Ring and the Book'-এ লিখেছিলেন, 'The glory of life, the beauty of the world, the splendour of heaven,' তখন বোধ হয় মনের আকাশে নিজের প্রিয়ার ছায়াই দেখেছিলেন। এলিজাবেথ মূর্তিমতী প্রেম-গীতি—

O lyric Love, half angel and half bird
And all a wonder and a wild desire.

'মেন অ্যাণ্ড উইমেন' গ্রন্থ তাঁর কাব্যজগতের পূর্ণিমাচাঁদ এলিজাবেথ ব্যারেটকে উৎসর্গ করা উপলক্ষে ব্রাউনিঙ 'One Word More' কবিতা রচনা করেন। ভগবানের ক্ষুদ্রতম প্রাণীরও অন্তরের দুটি দিক আছে; একটি দিক সংসারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য, আর একটি দিক কোনো নারীকে ভালোবাসলে তার জন্য। এই কবিতাটিতে ব্রাউনিঙ তাঁর প্রিয়ার কাছে অন্তরের দ্বিতীয় দিকটি অনাবৃত করে দিয়েছেন। অজানা খনির নূতন মণির হার গেঁথেছেন শুধু একজনের কমনীয় কণ্ঠে পরানোর জন্য। 'By the Fireside' কবিতাটিতেও তাঁর জীবনসঙ্গিনী অন্তরব্যাপিনী এলিজাবেথের কথাই কল্পনার রঙে রাঙিয়ে বলা হয়েছে। দুটি প্রেমমুগ্ধ হৃদয় নিঃশেষে মিশে গেছে। উত্তরকাল সম্বন্ধে তাই কবির মনে লেশমাত্র শঙ্কা নেই। এই কবিতাটির মূলসুর একটিমাত্র পঙ্‌ক্তিতে প্রকাশ করা যায়—

এ বাণী, প্রেয়সী, হোক মহীয়সী— তুমি আছ, আমি আছি।

যেমন ভাবের দিক থেকে, তেমনি শৈলীর দিক থেকেও ব্রাউনিঙের প্রেমের কবিতা গতানুগতিক নয়। এটা ব্রাউনিঙের প্রেমের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নানা প্রকারে তিনি নূতনত্ব দেখিয়েছেন।

---

১ একটি চিঠিতে এলিজাবেথ ব্যারেট্ একবার ব্রাউনিঙকে অনুযোগ করে লিখেছিলেন—
Yet I am conscious of wishing you to take the other crown besides— and after having made your own creatures speak in clear human voices, to speak yourself out of that personality which God made and with the voice which he tuned into such power and sweetness of speech.

বাস্তবকে ব্রাউনিঙ অবহেলা করেন নি। সত্যি, অনেক কবির প্রেমগাথা পড়তে পড়তে এ ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে পৃথিবীতে গোলাপ ছাড়া আর ফুল নেই আর যা কিছু ঘটে সবই চাঁদের আলোয়। প্রেমের বাস্তব দিকটার প্রতি উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাউনিঙই প্রথম জোর দিলেন। জীবনের খুঁটিনাটি যে-সব জিনিসকে সাধারণত তুচ্ছ বলে উপেক্ষা করা হয় সেগুলিও ব্রাউনিঙের প্রেমের কবিতায় স্থান পায়। একটা ছোট দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। প্রেমিক রাত্রিতে খুশী মনে তার সাগরসৈকতের গৃহ-অভিমুখে যাচ্ছে। দিনের কাজ এতক্ষণ বিচ্ছেদ এনে দিয়েছিল, এখন আবার সে প্রিয়ার কাছে ফিরে চলেছে। তার পর

A tap at the pane, the quick sharp scratch  
And blue spurt of a lighted match,  
And a voice less loud, through its joys and fears,  
Than the two hearts beating each to each !

( Meeting at Night )

মৃদু করাঘাত বাতায়নে মোর, ক্ষিপ্র ঘর্ষভরে  
দেশালাই কাঠি উঠিল জ্বলিয়া দেখিনু ক্ষণেক পরে।  
তার পর দুটি বক্ষে বক্ষে স্পন্দন বিনিময়,  
তার চেয়ে মৃদু চুপি চুপি কথা সুখ ভয় করি জয়।

অনুবাদ : সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ব্রাউনিঙ অনেক ক্ষেত্রেই মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টকোণ থেকে প্রেমের জটিলতা-কুটিলতার দিকটা দেখেছেন। তাঁর নিজের জীবনে কিন্তু প্রেম মোটামুটি সরলরেখা ধরেই চলেছিল। প্রেমের প্রতিদান ও পরিপূর্ণতার পথে তাঁকে পদে পদে প্রতিহত হতে হয় নি। তিনিও 'ক্ষণিকা'র নায়কের ভাষায় প্রণয়িনীকে বলতে পারতেন—

হৃদয়-পানে হৃদয় টানে, নয়ন-পানে নয়ন ছোটে,  
দুটি প্রাণীর কাহিনীটা এইটুকু বই নয়কো মোটে।

কবি-দম্পতির প্রণয় নিতান্ত সোজাসুজি হলেও কবি ব্রাউনিঙ তাঁর কবিতায় প্রেমের কুঞ্জের বাঁকা গলি-ঘুঁজির সন্ধান দিয়েছেন।

পর্‌ফিরিয়ার প্রেমিকের কাছে পর্‌ফিরিয়া প্রেমের অর্ঘ্য নিয়ে ঝড়ের রাতে

অভিসারে এসেছে। পরফিরিয়া তাকে পূজা করে জেনে প্রেমিকের হৃদয় বিস্ময়োদ্বেল হয়ে উঠল। 'ত্রিদিবের ফুল অমল অনাঘ্রাত, এই লহমায় সে আমার সে আমার'। তার কর্তব্য সে স্থির করে ফেললে।

I found
A thing to do, and all her hair
In one long yellow string I wound
Three times her little throat around,
And strangled her.

তার পর?

And thus we sit together now
And all night long we have not stirred,
And yet God has not said a word!

'ল্যাবরেটরি'র নায়িকা ঈর্ষায় উন্মাদিনী। প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে হত্যাই তার কাছে একমাত্র পথ। তাই সে বিষ সংগ্রহ করছে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিনীর শুধু মৃত্যু হলেই চলবে না; সে মৃত্যু নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক হওয়া চাই এবং সেই যন্ত্রণার ছাপ যেন মুমূর্ষুর চোখে-মুখে ভয়ঙ্করভাবে ফুটে ওঠে। তবেই না তার প্রেমিকের শিক্ষা হবে!

পুরুষের প্রেম ও নারীর প্রেম কোনটির গভীরতা বেশি সাধারণভাবে এ সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে আসা শক্ত, বায়রন এ সম্বন্ধে যাই বলুন না কেন। ব্রাউনিঙের অধিকাংশ প্রেমের কবিতা পুরুষের অনুভূতি নিয়ে হলেও নারীর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে এমন কবিতাও রয়েছে। এর মধ্যে 'Any Wife to Any Husband' কবিতাটির একটি বিশেষ স্থান আছে। তবে এই শ্রেণীর কবিতাগুলির প্রায় সবেতে আমরা আত্মকেন্দ্রিক প্রেমেরই পরিচয় পাচ্ছি। এখানকার পরিধিতে বিশালতা বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না।

ব্রাউনিঙের প্রেমিক প্রিয়াকে কখনো-বা পূজারীর চোখ দিয়ে দেখে। 'Rudel to the Lady of Tripoli' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রেমের মূলে অনেক সময় একটা অতৃপ্তি থেকে যায় থেকে যায় একটা চঞ্চলতা ব্যাকুলতা সেইটাই পাচ্ছি 'Two in the Campagna' কবিতায়—

Infinite passion, and the pain
Of finite hearts that yearn.

ব্রাউনিঙ অনেক ব্যর্থ প্রেমিকের ছবি এঁকেছেন। তারা সাধারণত ব্যর্থতার মধ্য থেকেই সাফল্যের সন্ধান খুঁজে পেয়েছে— out of steel a song। এক পলকের পুলক, এক নিমেষের প্রদীপখানি জ্বালা— এর মূল্যই তাদের কাছে অপরিসীম। শুধু আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায়ই তারা জীবনের বাকি দিন কটা কাটিয়ে দেয় না। তাদের কাজের মাঝে মাঝে কান্নাধারার দোলা যারা থামতে দেয় নি সেই দুখ-জাগানিয়া মেয়েদের প্রতি এদের বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নেই।

'The Last Ride Together' সম্ভবত ব্রাউনিঙের মহত্তম প্রেমের কবিতা। প্রণয়ীকে অনেক দিন আশায় আশায় রাখার পর মেয়েটি একদিন তাকে শেষ কথা জানিয়ে দিলে। প্রেমিক বুঝতে পারলে তার জীবনে আঁধার নেমে আসছে। মেয়েটি প্রেমিকের জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী দান করেছে। তাইতেই সে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে। প্রেমের প্রতিদান আর কজনে পায়। অনাদৃত অনুরাগের মর্মান্তিক বেদনায়ও কিছু সান্ত্বনা যদি পাওয়া যায় সেইজন্য সে শেষবারের মতো কিছু সঞ্চয় করে নিতে চায়— তার প্রিয়ার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ থেকে। সেই ক্ষণস্থিতিকে মনের মধুকোষে সে স্মৃতির সুধারসে চির-সঞ্জীবিত করে রাখতে চায়।

তোমার কাননতলে ফাগুন আসিবে বারংবার,
তাহারই একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার।

তাই প্রিয়ার কাছে তার প্রার্থনা—

I said— Then, Dearest since 'tis so,
Since now at length my fate I know,
Since nothing all my love avails,
Since all my life seemed meant for, fails,
Since this was written and needs must be—
My whole heart rises up to bless
Your name in pride and thankfulness !
Take back the hope you gave— I claim

Only a memory of the same,
—And this beside, if you will not blame,
Your leave for one more last ride with me.

তার পর অশ্বপৃষ্ঠে উদ্দাম গতিতে ছুটতে ছুটতে অনেক কথা প্রেমিকের মনে হচ্ছে। হয়তো এ মিলন-রাতি কোনোদিনই পোহাবে না—

Who knows but the world may end to-night.

সৃষ্টি-প্রলয় সবের ঊর্ধ্বে এই ক্ষণ-স্থিতিই তার কাছে চিরন্তনী হয়ে থাকবে—গতির মধ্যে তার যে স্থিতিকে সে খুঁজে পেয়েছে। যা বলেছে বা করেছে সে রকম না বলে বা না করে যদি অন্যরকম বলা বা করা যেত তা হলে সে আরো বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারত কি না সে কথা আজ সে ভাববে না। 'হয়তো পারিত ভালোবাসিতে আমায়, হয়তো বা প্রত্যাখ্যান করিত ঘৃণায়'। সব মানুষই চেষ্টা করে— সাফল্যলাভ করে মুষ্টিমেয় কয়েকজন। এ জীবনে যদি পরিপূর্ণ সুখ-শান্তি লাভ করা যায়, তা হলে মৃত্যুর পর নবজীবনের কূলে উত্তীর্ণ হয়ে পাওয়ার আর কি বাকি থাকবে?

স্বপ্ন ঘট বক্ষে ধরি তাই
বৈতরণী পার হতে চাই।

কিন্তু যদি সে চিরকাল ধরেই প্রিয়ার সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে ধাবমান থাকে—

What if we still ride on, we two,
With life for ever old yet new,
Changed not in kind but in degree,
The instant made eternity—
And Heaven just prove that I and she
Ride, ride together, for ever ride?

'The Lost Mistress' কবিতায় মেয়েটি যখন পরিত্যক্ত প্রণয়ীকে জানিয়ে দিলে যে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকতে পারে, তখন যদিও তার জীবনের পেয়ালা বেদনায় ভরে গেছে, তবুও সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে তার অন্তর্জ্বালা গোপন করার। বন্ধু—তাই হোক।

দিনের পর দিনগুলি মোর এমনি ভাবে
তোমার হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে যাবে।

'Cristina'য় তার বিফল প্রেমের কথা ভেবে নায়ক বলছে—

She has lost me, I have gained her ;
Her soul's mine : and thus, grown perfect,
I shall pass my life's remainder.

ব্রাউনিঙের ব্যর্থ প্রেমিকের জীবনদর্শন হল—

যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাই নি বড়ো সেই নয়।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চির-বিচ্ছেদ করি জয়।

সে জানে সত্যিকারের প্রেম প্রতিদান না পেলেই মূল্যহীন হয়ে যায় না। 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা।'

প্রেম তো এই জীবনের দিন-কটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রেম মাটির মতো ভঙ্গুর, আবার আকাশের মতো চিরন্তন। মানুষের আত্মা অমর, মানুষের প্রেমও মৃত্যুহীন। তাই ষোড়শী কিশোরী ঈভ্‌লিন্ হোপ্‌কে যে প্রৌঢ় ভালোবেসেছিল অথচ পায় নি, সে জানে তার প্রেম পুরস্কৃত হবেই। ব্রাউনিঙের নিজেরও এ বিশ্বাস ছিল বলেই 'Prospice' কবিতায় তিনি বলছেন মৃত্যুভয়ে তাঁর হৃদয় কাতর নয়। বরং তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মরণকে অভ্যর্থনা করবেন 'শ্যাম-সমান' বলে। চিরকাল তিনি সংগ্রাম করে এসেছেন— শেষ শ্রেষ্ঠ সংগ্রামে তিনি দুর্বার সাহসে এগিয়ে যাবেন। কারণ তিনি জানেন দুর্যোগের আঁধার রাত্রির অবসানে নির্ভীকের জন্য আছে আলোর জ্যোতিঃ— রবার্ট আবার তাঁর এলিজাবেথকে ফিরে পাবেন—

O thou soul of my soul ! I shall clasp thee again,
And with God be the rest !

## ওয়ালটার ডে লা মেয়ার

১৮৭৩-১৯৫৬

A marvel of light,
Whose verge of radiance seems
Frontier of paradise,
The bourne of dreams,
O tranquil, silent, cold –
Such loveliness to see :
The heart sighs answer,
*Benedicite* !

ওয়ালটার ডে লা মেয়ার-এর নিজের ভাষায় তাঁর কবিতার পরিচয় হল 'a marvel of light', কিন্তু তাঁর কবিতার তুষার-শুভ্র সৌন্দর্যে শৈত্যই শুধু নেই, উত্তাপও আছে। জীবন ও স্বপ্নের, বাস্তব ও অবাস্তবের এক অপরূপ মিলনের ছবিতে তাঁর কবিতা উদ্‌ভাসিত। জীবন ক্ষণস্থায়ী। 'বালুকার পরে কালের বেলায় ছায়া-আলোকের খেলা'। তবুও তো ধরণীর ধূলি কতই না মধুময়— 'Brief, yet sweet, is life's hour'।

জীবনের এই briefness ও sweetnessই হল ওয়ালটার ডে লা মেয়ারের কবিতার অন্যতম মূল সুর। জীবনের এই ক্ষণস্থায়িত্ব প্রাচীন কালের অনেক কবির মনেই গভীর রেখাপাত করেছিল। তাই হরেস্ তাঁর 'ওড্'-এ আর্তনাদ করে উঠেছেন— 'Eheu fugaces...labuntur anni' ('Years glide away and are lost to me, lost to me !') অনেক কবিই নির্দেশ দেন সময় থাকতে গোলাপ-কুঁড়ি সংগ্রহ করার জন্য। অনেক কবিতাতেই 'carpe diem' ধ্বনিত হয়। জীবনের পরম লগ্ন যদি অবহেলিত হয়, তা হলে বৃথাই বেলা কাটবে, খেলা সাঙ্গ হবে। তবুও গরবিনীরা ভুল করে। যখন মনের মানুষ একবার এসে ফিরে যায়, তখন অনেক সময়ই মাথার একটি কুসুমের দানেও তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না।

আমাদের যৌবনের দিনগুলি জয়যাত্রার দিন। বায়রন তাই উল্লসিত হয়ে বলে ওঠেন— 'The days of our youth are the days of our glory'। এ বিষয়ে কারো কোনো মতদ্বৈধ নেই। তবে বায়রনের মতো উত্তরতিরিশের কালে উত্তীর্ণ হয়ে ডে লা মেয়ার কোনোদিনই নিজেকে জীবন্মৃত ভাবতে পারবেন না। অবশ্য ব্রাউনিঙের মতো 'the best is yet to be'ও তিনি বলবেন না। তিনি জানেন—

...Well I know
The few clear stars still mine in heaven
Never shall now as brightly show.

সময়ের অগ্রগতি, জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভপ্রদর্শন যে অর্থহীন এও তিনি জানেন। অনেক সময়ই তিনি এ শুধু সহ্যই করেন নি, একে গ্রহণও করেছেন।

কবির মনের দৃঢ়তা আছে। স্থিতির মোহের নীলাঞ্জন নয়নে লাগলেও চিত্তহারী আর সব কিছুর প্রতি তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন নয়। রহস্যময়ী সৃষ্টি ও ভয়ঙ্কর প্রলয়ের মধ্যেও তিনি সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছেন। স্থিতি— সে শুধু প্রহেলিকা হয়েই রইল। আর রইল স্থিতির কালো-কাজল দুই উজ্জ্বল চোখের অতল পারাবারের মধ্যে কবির নবযৌবনের অনাদৃত প্রথম প্রণয়ের অবলুপ্ত রক্তস্বাক্ষর।

কবি ডে লা মেয়ার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কবি। অর্থাৎ, এক কথায় জীবনের কবি— কিন্তু 'কবি'-কথাটির প্রসারিত অর্থে। শুধু ছন্দোবদ্ধ ভাষার মধ্যেই তাঁর প্রতিভা সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। তাঁর গদ্যরচনাও প্রথমশ্রেণীর। আলোচনা, সমালোচনাত্মক রচনা ও লঘুনিবন্ধে তিনি সিদ্ধহস্ত। বিশ্বের ছোটোগল্প-সাহিত্যেও তাঁর উল্লেখযোগ্য দান রয়েছে। আর যদি আমরা তাঁর গদ্য ও পদ্য-রচনায় দুটি বিভিন্ন প্রতিভার প্রকাশ খুঁজি তা হলে ভুল করা হবে। প্রতিভা একই, প্রকাশভঙ্গী ভিন্ন। ভারতবর্ষে অবশ্য ডে লা মেয়ার কবি হিসাবেই সুপরিচিত। কিন্তু তাঁর গদ্য বা পদ্য সম্বন্ধে আর কিছু বলার আগে তাঁর জীবন সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা দরকার।

অবশ্য ডে লা মেয়ারের কবিতা ভালোভাবে বোঝার জন্য তাঁর জীবন-কাহিনী জানা অপরিহার্য নয়। তাঁর রচনায় আত্মজীবনীমূলক অংশ খুব কম।

অনেক স্থলে আবার তিনি ল্যামের মতো রহস্য করার জন্য নিজের জীবনের ঘটনা অন্যভাবেও রূপায়িত করেছেন। আর তাঁর জীবনচরিতে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্যও কিছু নেই। তাঁর সম্বন্ধে অন্ততঃ বলা যেতে পারে— 'কবিরে পাবে না কবির জীবনচরিতে'। তিনিও বোধ হয় শেক্সপীয়রের সনেট সম্বন্ধে ওয়ার্ড-সোয়ার্থের উক্তি 'With this key Shakespeare unlocked his heart'-এর প্রতি কটাক্ষ করে বলতে পারতেন—

Did he ?
Then the less Shakespeare he.

তবে প্রিয়জনের জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনাও আমাদের কাছে রমণীয়তায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে। যাকে ভালোবাসি, তার জীবনের খুঁটিনাটি জানার জন্য আমাদের অন্তহীন কৌতূহল। তার কী পছন্দ হয়, কী ভালো লাগে, কিসের প্রতি তার বিরাগ— এসব জানার জন্য কী তীব্র আগ্রহ! সে দিক থেকে দেখলেও ডে লা মেয়ারের সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা দরকার।

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল কেণ্টের অন্তর্গত চার্ল্‌টনে ওয়ালটার জন ডে লা মেয়ারের জন্ম হয়। তাঁর পিতা জেম্‌স এডওয়ার্ড ডে লা মেয়ারের পূর্বপুরুষ ছিলেন হিউগানট ( ফরাসী প্রোটেস্টান্ট )। তাঁর মা ছিলেন স্কচ। সেণ্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রাল কাইর স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন। তার পর ষোলো বছর বয়সে অ্যাংলো-আমেরিকান অয়েল কোম্পানির লণ্ডন কার্যালয়ের একটি পদে নিযুক্ত হন। প্রায় কুড়ি বছর ( তাঁর পঁয়ত্রিশ বছর বয়স অবধি ) তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের প্রায় সমগ্র অংশই কোম্পানির কাজে জড়িত ছিল। সাহিত্য ছিল গৌণ। তবে বিদ্যালয়ে ছাত্রজীবনে যে ছেলে সাময়িকপত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, সহজে লেখা ছেড়ে দেওয়ার পাত্র সে নয়। সকালবেলায় যে রকম সমস্ত দিনের পূর্বাভাষ পাওয়া যায় সেইরকম পরবর্তী জীবনের গুণাবলীর সূচনা তাঁর বাল্যকালেই হয়েছিল। লেখা তিনি ছাড়লেন না। 'ব্লাক অ্যাণ্ড হোয়াইট', 'দি স্কেচ', 'দি পেল্ মেল্ গেজেট' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা কিছু কিছু প্রকাশিত হতে আরম্ভ হল। এ ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগের সময়ের কথা। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে লংম্যান্স ( পুস্তক প্রকাশক প্রতিষ্ঠান ) ওয়ালটার র‍্যামালের লেখা 'সংস অফ চাইল্ডহুড' ( শৈশবের গান ) প্রকাশ করেন। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে 'হেনরি ব্রকেন' গ্রন্থেও এই ছদ্মনামটি থাকে।

তার পর এ নাম পরিত্যক্ত হয়। লেখায় যদি বৈপ্লবিকভাবে নতুন কিছু থাকে তবেই প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কবি বলতে পারেন— 'I awoke one morning and found myself famous'। ডে লা মেয়ারের কবিতায় পুরাতন ধারারই অনুবর্তন করা হয়েছে। 'আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা'— এই ধ্বনি তুলে তিনি ছুটে পথে বের হয়ে আসেন নি। তাই তাঁর খ্যাতি এসেছে ধীর সলজ্জ পদক্ষেপে।

১৯০৮ সনে ডে লা মেয়ার দেখলেন, তাঁর আপিসের কাজ ছেড়ে দিয়ে সাহিত্যকেই উপজীবিকা করতে পারবেন। খ্যাতি তাঁর তখন সামান্য, কিন্তু সেটা ক্রমবর্ধমান। আর এখনকার চেয়েও তখন সাংবাদিক বা লেখক-হিসাবে জীবন নির্বাহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। সংবাদ ও সাময়িক-পত্রের সংখ্যা ছিল বেশি, স্থানের ছিল না অভাব। জীবনটা তখন খানিকটা মন্দাক্রান্তা চালেই চলত।

পরবর্তী তিরিশ বছর ডে লা মেয়ার পুরোপুরি সাহিত্যিক-রূপেই জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থাদি— গদ্য ও পদ্য— নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রধান প্রধান পত্রিকায় তিনি লিখেছেন। বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন এবং ক্রমশই তিনি অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। অবসর গ্রহণ তিনি করেন নি। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল ধরে তিনি বাণীদেবীর অর্চনা করে এসেছেন। আশি বছর বয়সেও তিনি কবিতা লিখেছেন, আর তাও আবার ছোটোদের জন্য। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে তিনি একটু যেন নিরালায় থাকতে চেয়েছেন। বিদ্বৎ-সমিতিগুলির বড়ো সভায় তাঁকে বেশি দেখা যায় নি। লেখার পরিমাণও তখন বেশ কমে গিয়েছিল

খুব অল্প কথায় এই হল মোটামুটি ডে লা মেয়ারের জীবনী। অল্প। তা হোক। খুব বেশি জানবার আগ্রহ, এবং সব-কিছু জানবার আগ্রহ যে মাঝে মাঝে কত রুগ্‌ণ হয়ে উঠতে পারে রাস্কিন্, ডিকেন্স্ প্রভৃতির জীবনী ও পত্রাবলী নিয়ে যে গবেষণার ঘূর্ণাবর্ত চালানো হয়েছে তাইতে সেটা খুব স্পষ্ট-ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। রাস্কিনের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবাহিত জীবন নিয়ে যে-সব তথ্য অন্যায় উল্লাসে প্রচার করা হচ্ছে (তার সত্যতা সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে), ডিকেন্সের বার্ধক্যের প্রেম নিয়ে যে অশিষ্ট কৌতূহল দেখানো হয়েছে, তাতে জীবনী ও সমালোচনার কী সমৃদ্ধি সাধন করা হচ্ছে

জানি না। তবে সাহিত্যের ও সুরুচির যে সর্বনাশ করা হচ্ছে তাতে অণুমাত্র সন্দেহ নেই।

বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পদ্যের উৎপত্তি আগে, গদ্যের বিকাশ পরে। তবুও আমি প্রথমে ডে লা মেয়ারের গদ্যের আলোচনাই করতে চাই। মধুর দিয়ে সমাপন করার যে রীতি আছে, সেটা অনুসরণ করে কবিতার কথা দিয়ে শেষ করব।

ডে লা মেয়ারের প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত গদ্যরচনা হল একটি সম্পূর্ণ সাদাসিধা রোমান্স 'হেনরি ব্রকেন' (১৯০৪)। 'ডিং ডং বেল,' 'ডেজার্ট আইল্যাণ্ডস' ও সম্পূর্ণ নতুন ধরনের (সটীক) সংকলন-গ্রন্থগুলির মতো এই গ্রন্থটিকেও কোনো বিশেষ শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত করা যায় না। এগুলি সম্পূর্ণ-ভাবে ব্যক্তিগত। তবে 'হেনরি ব্রকেন' গ্রন্থে নূতনত্বের সঙ্গে ত্রুটি-বিচ্যুতিও রয়েছে। অনেক সুন্দর সুন্দর অনুচ্ছেদ থাকলেও এই গ্রন্থে ডে লা মেয়ার সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি।

পরলোকগত পিতামাতা, আন্ট সোফিয়ার ম্লান সৌজন্য, পুস্তকপরিপূর্ণ কক্ষ এ-সবের স্মৃতি পিছনে ফেলে রেখে হেনরি ব্রকেন একদিন ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু যে পাহাড়গুলির উপর দিয়ে হেনরি ব্রকেনের যাত্রা শুরু হল, সে পাহাড়গুলি কোন্ অজানা কালের পাহাড়। আর যে-সব লোকের সঙ্গে সে মিশছে তারা রক্তমাংসের মানুষ নয়, বইয়ের পাতায় তাদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। ওয়ার্ডসোয়ার্থের লুসি গ্রে, হেরিকের নামহারা নায়িকার দল, শার্লট ব্রন্টির জেন আয়ার, শেক্সপীয়রের বটম্। যে পথ ও পথের প্রান্তে হেনরি ব্রকেনের পরিক্রমা, কোনো অশ্বারোহী সে পথ দিয়ে কোনোদিনযায় নি।

এই গ্রন্থের শৈলীতে ইচ্ছাকৃত প্রাচীন ভঙ্গী পাওয়া যায়। অনেক শব্দ ডে লা মেয়ার প্রয়োগ করেছেন যা সাধারণত ব্যবহার করা হয় না, অথচ একেবারে প্রচলিতও নয়। এইসব শব্দের আধিক্যই এই গ্রন্থের গদ্যতে একটু সেকেলে ভাব এনে দিয়েছে, এনে দিয়েছে একটু তন্দ্রার আমেজ। একটি উজ্জ্বল অনুচ্ছেদ ছাড়া সমস্ত গ্রন্থটি যেন স্বপ্নের মতো ভেসে যায়। কয়েকটি স্মৃতিলেখকে (epitaph) কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা তিনটি নিবন্ধ (বা নক্শা বা গল্প) নিয়ে লেখা হয়েছে 'ডিং ডং বেল' (১৯২৪)। শহর থেকে দূরে একটি ছোটো স্টেশনে এক নারী ট্রেনের জন্য অপেক্ষমাণা, এক বৃদ্ধের সঙ্গে

তার আলাপ আরম্ভ হল। কাছের গোরস্থানে যে-সব বিচিত্র কবিতা-লেখা প্রস্তরফলক আছে সেগুলি বৃদ্ধ তাকে দেখাল। দুই প্রেমিক এক নিদাঘ-নিশীথে এক প্রান্তরে পথ হারিয়ে ফেলেছে। ঘুরতে ঘুরতে এক পরিত্যক্ত সমাধিভূমিতে তারা এসে পড়েছে। কয়েকটি দেশলাই কাঠির আলোয় তারা কয়েকটি স্মৃতিলিপির অর্থোদ্ঘাটন করল। জানুয়ারির এক ঠাণ্ডা সকালে একজন লোক সমাধিভূমিতে ঘোরাফেরা করছে। স্মৃতিলিপি পড়তে পড়তে সে দেখল— কাকে? বা কী? শেকভের গল্পের কথা আমাদের মনে পড়ে যায়।

১৯১০ সনে প্রকাশিত হয় 'দ্য রিটার্ন'। এই ছ বছরে গদ্যলেখকরূপে ডে লা মেয়ার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'দ্য থী মুল্লা-মুল্‌গারস' বইটিও ১৯১০ সনে প্রকাশিত হয়। দুটি ভিন্ন ধরনের বই— তবে 'হেন্‌রি ব্রকেনে' যে প্রতিভার আভাস পাওয়া গিয়েছিল তার ছাপ রয়েছে দুটি বইতেই। 'দ্য থী মুল্লা-মুল্‌গারস'-এর পরে নামকরণ করা হয় 'দ্য থী রয়াল মাঙ্কিজ'। এটি ছোটোদের গল্প। তবে সেইজন্য যদি বড়োরা এ বইটা না পড়েন তা হলে তাঁরা ভুল করবেন। ডে লা মেয়ারের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যময়ী রচনার কয়েকটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন এতে আছে। কিপলিংয়ের গল্পের কথা এই প্রসঙ্গে মনে হতে পারে। কিন্তু ডে লা মেয়ারের কাব্যধর্মী গদ্যের কাছে কিপলিংয়ের বাস্তবধর্মী গদ্য যেন নিষ্প্রভ মনে হয়।

'দ্য রিটার্ন' একটি উপন্যাস। এর একটা বোধগম্য বিষয়বস্তু আছে, পরিষ্কার ভাবে পরিচ্ছেদ ভাগ করা আছে। গল্পের আরম্ভ আছে, বিকাশ আছে, শেষ আছে। ডে লা মেয়ারের পাঠকেরা এতদিনে একটা প্রচলিত ধারায় লেখা উপন্যাস পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

'দ্য রিটার্ন'-এর নায়কের নাম আর্থার লফোর্ড। স্পর্শকাতর, অস্থিরমতি। হ্যামলেটের মতো সেও চিন্তা ও আত্মবিচারণার মাঝে শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করে। কাজের চেয়েও ভাবনাতেই সে বেশি পটু। একদিন গির্জার প্রাঙ্গণে এক আত্মঘাতীর কবরের কাছে শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার নিদ্রারত অবস্থায় আত্মঘাতীর প্রেতাত্মা এসে তার দেহ অধিকার করার চেষ্টা করে, কতকটা সফলকামও হয়। তার পর আসে অন্তরবাসী আততায়ীর সঙ্গে তার সংগ্রামের কাহিনী। সূক্ষ্ম, চাঞ্চল্যকর গদ্যে সে কাহিনী ডে লা মেয়ার লিপিবদ্ধ করেছেন। সে সংগ্রাম একান্তভাবে ব্যক্তিগত, কিন্তু সশস্ত্র সংঘর্ষের

চেয়ে কোনো অংশে কম ভয়ঙ্কর নয়। তার স্ত্রী তাকে নিরাশ করেছে, সে মনে-প্রাণে একাকিত্বের বেদনায় জর্জরিত। এই পটভূমিকায় ওই সংগ্রাম আরো দুঃসহ হয়ে ওঠে। গির্জার কাছে দুটি ভাই-বোন বাস করত, তাদের গৃহ ও সান্নিধ্য, এবং নিজের মেয়ের প্রতি ভালোবাসা অটুট রাখার জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা— এইটুকু মাত্র বাইরের সাহায্য সে পায়। অবশ্য এদের কেউই প্রত্যক্ষভাবে তাকে সাহায্যে করতে পারে না। এদের কেউ কেউ আবার (যেমন তার স্ত্রী, তার সাধারণ বন্ধুর দল) এই সংগ্রামের কথা প্রায় জানতেই পারে না, শুধু তার আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন ও স্বাস্থ্যহানি থেকে যেটুকু বোঝা যায় সেটুকু ছাড়া। অশান্ত আগন্তুককে শেষ পর্যন্ত যে শক্তি পরাস্ত করে সেটা প্রধানত লফোর্ডের নিজেরই শক্তি। তবে সেই শক্তিকে সঞ্জীবিত রেখেছিল গ্রাইসেলের ভালোবাসা ও সহৃদয়তা, গ্রাইসেলের ভাই হার্বার্টের সহনশীলতা, আর মেয়ে অ্যালিসের প্রতি তার অদম্য স্নেহ। আত্মঘাতীর আত্মা প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিল, তাকে ফিরে যেতে হল। লফোর্ড পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চাইছিল, আবার সে ফিরে এল দুঃখসুখের ঢেউ-খেলানো এই সাগরের তীরে। অন্তরের পুণ্য শক্তি, যা পরাজিত হতে চলেছিল, প্রত্যাগমন হল তার। ধূলার ধরণীতে অপরাজেয় শক্তি— প্রেম— প্রত্যাবৃত্ত হল। প্রেমে হল জয়ী ভাগ্যবিড়ম্বিত নায়ক আর্থার লফোর্ড।

১৯০২ - ১৯২১— এই সময়ের মধ্যে ডে লা মেয়ার অনেকগুলি ছোটোগল্প লিখেছেন। এইগুলির অধিকাংশই উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টি, এবং এগুলির আরো অনেক বেশি সমাদর হওয়া উচিত। ‘পোয়েট্রি ইন্ প্রোজ’ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন ওয়ালটার ডে লা মেয়ার এবং তাঁর গল্পগুলি কাব্যধর্মী। লিরিকের সুর এতেও বেজেছে। যে গীতিমূর্ছনা ও অনৈসর্গিক পরিবেশ তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য, গল্পেও তা পূর্ণভাবে রয়েছে। তাঁর গল্প ও কবিতা পরস্পরের পরিপূরক। স্থানাভাববশত এ বিষয়ে আর কিছু আলোচনা করতে না পারার জন্য আমি দুঃখিত। শুধু একটি গল্পের উল্লেখ করব। সেটি হচ্ছে ‘দ্য রিড্‌ল্’। অতি-সংক্ষিপ্ত ছোটোগল্প যে এত সুন্দর, এত ব্যঞ্জনাময় হতে পারে সেটা আধুনিক বাংলাসাহিত্যে সম্ভবত শুধু বনফুলের গল্পে বোঝা যায়। ‘দ্য রিড্‌ল্’ গল্পের শেষে প্রহেলিকা একটা থেকে যায়, আর সেইটাই এর অসামান্য সৌন্দর্য। ধাঁধার উত্তর পেয়ে যাওয়ার পর তার সব আকর্ষণই চলে যায়। তাই ঈডিপাস্-সাধিত

স্ফিংসের প্রহেলিকা আমাদের কাছে 'শ্যালো' বা অগভীর মনে হয়। প্রসঙ্গতঃ বার্ণার্ড শ' রচিত 'ক্যান্‌ডিডা' নাটকের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই নাটকের কবির হৃদয়ের গোপন কথা নিয়ে সমালোচকেরা অনেক জল্পনা করেছেন। আমার মনে হয়, এই গোপন কথা গোপন আছে বলেই নাটকটি এত আকর্ষক হয়েছে এবং এই গোপন কথা আমাদের শোনবার কোনো প্রয়োজন নেই। নাট্যকার যা রহস্যরূপে রাখতে চেয়েছেন তাকে রহস্য রাখাই ভালো। 'ক্যান্‌ডিডা' কমেডি নয়, 'ক্যান্‌ডিডা' মিষ্ট্রি।

'নন্‌-ফিক্‌শান্‌'-লেখকরূপেও ডে লা মেয়ার কম কৃতিত্ব দেখান নি। তাঁর সাহিত্য-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি আলোচনাত্মক, সাহিত্য-মীমাংসা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাই তিনি নিজেই এগুলিকে 'রিভিউ' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর এই ধরনের অধিকাংশ প্রবন্ধ 'প্লেজার্‌স্‌ অ্যাণ্ড স্পেকুলেশান্‌স্‌' (১৯৪০) ও 'প্রাইভেট ভিউ' (১৯৫৩) গ্রন্থ দুটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'লাভ্‌' ও 'বিহোল্ড্‌, দিস্‌ ড্রীমার' সংকলন (সঞ্চয়ন হিসাবে এগুলি অপূর্ব হয়েছে) গ্রন্থ দুটির ভূমিকারও উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর বিষয়বস্তুর পরিধি বিস্ময়কর—উইল্‌কি কলিন্স্‌ থেকে লিয়ুইস ক্যারোল্‌, টেনিসন্‌ থেকে রিউপার্ট ব্রুক্‌।

ডে লা মেয়ারের কবিতা রোমান্টিক যুগের এক শতাব্দী পরে লেখা হলেও রোমান্টিক সুরে ঝংকৃত। ডে লা মেয়ার নিজে তাঁর কবিতা সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করতেন সেটা জানা খুব বেশী প্রয়োজনীয় নয়। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন—"What a writer may say about his 'poems' and their subterranean waters, is often dangerous, and may be even scientifically inaccurate."

রবার্ট লিটনের মতে প্রকৃত কবি যিনি তিনি "must hit hard, and speak sharply and severely, and give trouble, and set thought going." এই আলোয় দেখলে ওয়ালটার ডে লা মেয়ারকে প্রকৃত কবিরূপে হয়তো দেখা চলবে না। অন্য যে কোন আলোয়ই আমরা দেখি না কেন, ডে লা মেয়ার শুধু প্রকৃত কবিই নন, প্রথমশ্রেণীর কবিও। আর প্যাট্‌মোরের প্রতিধ্বনি করে তিনিও বলতে পারেন—"I have written little, but it is all my best."

ডে লা মেয়ারের কবিতার অধিকাংশই ছটি গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাবে।

১৯৪২ অব্দ পর্যন্ত লেখা তাঁর প্রায় সকল কবিতাই স্থান পেয়েছে 'কলেক্টেড্ পোয়েম্‌স্' বা 'কবিতাবলী'তে। ওই বছরে ফেবার অ্যাণ্ড ফেবার প্রতিষ্ঠান এই চয়নিকাটি প্রকাশ করেন। 'কলেক্টেড্ রাইম্‌স্ অ্যাণ্ড ভার্সেস্' গ্রন্থে ১৯৪৪ অব্দ পর্যন্ত লেখা ছোটদের কবিতা ও হাল্কা কবিতার অধিকাংশই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আরও দুটি লিরিক্-সংকলন—'দি বার্নিং গ্লাস্' ও 'ইনওআর্ড কম্প্যানিয়ন' প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৪৫ ও ১৯৫০ অব্দে। আর দুটি দীর্ঘ গীতিকবিতা হল 'দি ট্র্যাভ্‌লার' ( ১৯৪৬ ) ও 'উইংগেড চ্যারিয়ট্' ( ১৯৫১ )। ছোট গীতিকবিতার সংখ্যা আট শত ছাড়িয়ে যাবে।

লিরিক্ কবিতায় ডে লা মেয়ারের আসন সর্বোচ্চ শ্রেণীতে, যে শ্রেণীতে আসীন আছেন হেরিক, হার্বার্ট, শেলী, টেনিসন, রবার্ট ব্রিজেস—হাইনে, পুশ্‌কিন্, রবীন্দ্রনাথ।

"Come in thy beauty ! 'tis my love,
Lost in far-wandering desire,
Hath in the darkling deep above
Set stars and kindled fire."

ডে লা মেয়ারের কবিতার স্বপ্নময়তা আমাদের তন্ময় করে রাখে। এই স্বপ্নিল সৌন্দর্য আমরা ইতিপূর্বে ব্লেকের কবিতায় পেয়েছি, পেয়েছি ডি কুইন্‌সির রচনায়। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ( নিদ্রায় বা জাগরণে যাই হোক না কেন ), অন্তরের অনুভূতির মধ্য দিয়ে, অনন্তের ধ্যান করে ওয়ালটার ডে লা মেয়ার পরমার্থের সন্ধান পেয়েছেন। জীবন স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়—সত্য, বাস্তব। সেই বাস্তবকে অতিক্রম করলে তবেই পারমার্থিককে লাভ করা যাবে। ডে লা মেয়ার মরমী কবি। তাঁর মিস্‌টিসিজম্ সংগীতের সুরে মুখর। পুরাকালে সুরবাণীর কবি পুষ্পদন্ত দিব্যভাবে ভাবিতে হয়ে লিখেছিলেন—

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমূর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥

ডে লা মেয়ারের "দি স্ক্রাইব" কবিতায় এই গাথারই অনুরণন শোনা যায়।

ইহলোক ও পরলোকের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ ডে লা মেয়ারের অনেক কবিতায় দেখা যায়। "দি ট্র্যাভ্‌লার" কবিতাটিতে লোকান্তরই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

কবি মার্ভেল তাঁর মানসীকে নিত্য-উধাও রথে 'কালের যাত্রার ধ্বনি' (রবীন্দ্রনাথ যে অ্যান্‌ড্রু মার্ভেলের প্রতিধ্বনি করেছেন, এ বিষয়ে আমার সংশয় নেই) সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছেন। সময়-বলাকা উড়ে চলেছে, তার পক্ষ-বিধূনন ডে লা মেয়ারের মর্ম স্পর্শ করেছে, প্রাণমন আকুল করে তুলেছে। সুন্দরী যূথিকা, সুন্দরতর গোলাপ, বসন্তের উন্মাদ পবন, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী—এ সবের মধ্য দিয়েই মৃদুমন্দ ভাবে, ধীরে, অতি ধীরে সময় প্রবাহিত হয়ে চলেছে—অনন্তরহস্যময় সময়।

কবিতায় বহুপ্রচলিত শব্দগুলি সম্বন্ধে ডে লা মেয়ারের কোনো আতঙ্ক নেই। যেখানে প্রয়োজন বোধ করেছেন সেখানে তিনি বিনা দ্বিধায় এগুলি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এখানেই শেষ করেন নি। এই প্রচলিত শব্দ ও ছবিগুলির সঙ্গে নতুন ধরনের চমকপ্রদ সব শব্দ ও ছবি মিশিয়ে, প্রচলিত ছন্দের মধ্যে অভিনব তরঙ্গ তুলে, প্রথম ও দ্বিতীয় সুর মিশিয়ে তৃতীয় সুরের পরিবর্তে তারকার সৃষ্টি করে, তিনি তাঁর কবিতায় এক অপরূপ মায়াজাল সৃষ্টি করেছেন। 'রাত্রি', 'সন্ধ্যা', 'উষা', 'পতঙ্গ', 'খরগোশ', 'কুয়াশা', 'আয়না'—এই সব সহজ সামান্য চিরন্তন বিষয় নিয়ে তিনি লিখেছেন। কিন্তু ওয়ার্ডসোয়ার্থের মতো তিনিও কল্পনার আলোয় এই সব সাধারণ জিনিসকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। এইজন্যই বলা হয়েছে যে ওয়ালটার ডে লা মেয়ারের কবিতা "always Wonderland brought to earth, or the earth transfigured by Wonderland." ওয়ার্ডসোয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথের মতো ডে লা মেয়ারেরও ছিল গভীর শিশুপ্রীতি। শিশুচিত্ত-বিনোদনের জন্য তিনি আজীবন লিখে গেছেন। ঠিক ব্লেকের মতোই, পরিণত বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে ওয়ালটার ডে লা মেয়ারের মনে সংযোগ ঘটেছিল শিশুসুলভ সারল্যের। এই মণিকাঞ্চন-সংযোগের সুফল তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট।

ডে লা মেয়ারের কবিতার বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে অভিযোগ শোনা যায়—গভীরতার অভাব। ডে লা মেয়ার দান্তে বা মিল্‌টন নন। দান্তে বা মিল্‌টনের ভাবগাম্ভীর্য তাঁর কাছে আশা করা শুধু ভুলই নয়, তা অবান্তর, অর্থহীন।

দিনের বেলায় আমরা পাই সূর্যকে, প্রদীপ্ত দ্যুতিতে জ্যোতির্ময়। রাত্রিতে যদি চন্দ্রের কমনীয় কৌমুদীতে আনন্দ অনুভব না করে চন্দ্রের কাছ থেকেও সূর্যের প্রোজ্জ্বল কিরণ দাবী করি তা হলে সে দাবী তো মেটেই না, বরং চন্দ্রের যে অক্ষয় ধন আমাদের দেওয়ার আছে সেটুকুও আমরা খোয়াই। আর একটা কথা। গভীরতার জন্য কি শব্দের প্রাচুর্য ও ভাবের আড়ম্বরই একমাত্র মাপকাঠি? আভাসে ইঙ্গিতে কি অনেক অতলস্পর্শী গভীরতা ধ্বনিত করা যায় না? যায়, এবং ডে লা মেয়ার বিস্ময়কর কৃতিত্বের সঙ্গে তা বহুবার করেছেনও। এই প্রসঙ্গে এ. সি. ওআর্ডের উক্তি মনে পড়ছে—

But charming innocence is not the whole content of *Peacock Pie* or any other of de la Mare's books. He is, as Blake often was, a master in the art of understatement—taking the world and calling it a grain of sand. Blake's *Tiger, Tiger* has a divine incomprehensibility behind its external simplicity. And who would care to say that a similar divine incomprehensibility does not lie in a score of de la Mare's poems? in *Tillie*, *Miss T.*, *Hide and Seek*:

Hide and seek, say I
To myself and step
Out of the dream of Wake
Into the dream of Sleep.

ডন্, শেলী, এমিলি ব্রণ্টি প্রভৃতি কবিদের রচনার সঙ্গে ডে লা মেয়ারের লেখার সাদৃশ্য অনেক সময় চোখে পড়ে। এলিজাবেথের যুগের সুরও মাঝে মাঝে শোনা যায়। ডে লা মেয়ারের কাহিনী ও কবিতা পড়তে পড়তে লিয়ুইস্ ক্যারোল ও কোলরিজের কথাও মনে পড়া খুব স্বাভাবিক। এঁদের সকলের দ্বারা ডে লা মেয়ার অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের কারও প্রভাব বিসদৃশভাবে তাঁর কবিতায় বা অন্য রচনায় ছাপ ফেলতে পারে নি।

ওয়ালটার ডে লা মেয়ার আধুনিক কালের কবি হলেও আধুনিক কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর কবিতায় বড় একটা দেখা যায় না। মাধুর্যগুণ তাঁর কবিতার এক অমেয় ঐশ্বর্য। আর আজকালকার কবিতায় এইটার অভাবই বড় তীব্রভাবে বাজে। টি. এস্. এলিঅটের মতো ডে লা মেয়ারেরও অতীত-প্রীতি

রয়েছে। কিন্তু টি. এস্. এলিঅটের মতো ডে লা মেয়ার কোনোদিন রূপে-রসে-গন্ধে-ভরা এই বসুন্ধরাকে "ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড" ভাবতে পারতেন না। এজরা পাউণ্ডের মতো অত অদ্ভুত পরীক্ষা-নিরীক্ষাও তিনি করতে যান নি। অবশ্য আঙ্গিকের সুষ্ঠু প্রযোজনায় ডে লা মেয়ারও বহু বৈচিত্র্যের অবতারণা করেছেন; কিন্তু কোথাও তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে নি। অনেক কবিকে ডে লা মেয়ার নানা ভাবে প্রভাবিত করেছেন। সি. ডে লিয়ুইসের কবিতায় যে মাধুর্যের আস্বাদন আমরা পাই তাতে ডে লা মেয়ারের কবিতার রেশ রয়ে গেছে। আধুনিক ইংরেজী কবিতার গতানুগতিক ধারায় লেখা না হলেও বিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যের (এবং বিশ্বসাহিত্যেরও) শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

দেশকে ভালোবেসেছিলেন ডে লা মেয়ার। ইংলণ্ডকে উদ্দেশ করে তিনি লিখেছেন—

> All that is dearest to me thou didst give—
> Loved faces, ways, stars, waters, language, sea ;
> Through two dark crises in thy Fate I have lived,
> But—never fought for thee.

কান্ত-কোমল পদাবলীর কবি ডে লা মেয়ার যে প্রয়োজন হলে বজ্রাদপি কঠোর হতে পারতেন তারও প্রমাণ আছে তাঁর রচনায়। তাঁর "কারেজ্" কবিতাটি ক্লাফ্ বা ব্রাউনিঙের অনুপ্রেরণামূলক কবিতার চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়। অটুট মনোবল ও অদম্য সাহস মূর্ত হয়ে উঠেছে এখানে :

> O heart, hold thee secure
> In this blind hour of stress,
> Live on, love on, endure
> Uncowed, though comfortless.
>
> Life's still the wondrous thing
> It seemed in bygone peace,
> Though woe now jar the string,
> And all its music cease...

## ফ্রীড্‌রিখ্‌ হ্যেল্‌ডার্লিন্‌

১৭৭০-১৮৪৩

Doch uns gebuhrt es, unter Gottes Gewittern,
Ihr Dichter! mit entblosstem Haupte zu stehen,
Des Vaters Strahl, ihn selbst, mit eigner Hand
Zu fassen und dem Volk. ins Lied
Gehullt, die himmlische Gabe zu reichen.[১]

HOLDERLIN

রোমান্টিক কাব্যাদর্শের মূর্ত প্রতীক—নিঃসঙ্গ, 'অন্তর্বাষ্পঃ' Friedrich Holderlin। বর্তমানে বিশ্ববিশ্রুত, এই জার্মান্‌ কবি জন্ম নিয়েছিলেন ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের ২০শে মার্চ তারিখে। এই একই বছর জন্মেছিলেন হেগেল্‌, বেটোফেন্‌, ওয়ার্ডসোয়ার্থ। হ্যেল্‌ডার্লিনের বাবা ছিলেন প্রোটেস্ট্যাণ্ট্‌ যাজক ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কবির জন্মের দু বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়। এর দু বছর পরে হ্যেল্‌ডার্লিনের মা পুনর্বার বিবাহ করেন। হ্যেল্‌ডার্লিনের যখন ন বছর বয়স তখন তাঁর বিপিতার মৃত্যু হয়।

ছাত্রাবস্থাতেই হ্যেল্‌ডার্লিন মাঝে মাঝে মানসিক অবসাদে আক্রান্ত হতেন। তিনি মনে করতেন, তাঁকে সকলেই ভুল বুঝছে, তাঁর সঙ্গ অন্যদের ভালো লাগছে না, তাঁর অনুভূতিকে লোকে মূল্য দিচ্ছে না। বন্ধু নাস্‌ট্‌কে লেখা একটি চিঠিতে তিনি এ সম্পর্কে অনুযোগ করেছেন। এর প্রধান কারণ অবশ্য হ্যেল্‌ডার্লিনের নিজের অস্থিরমতিত্ব। তাঁর মধুর স্বভাব ও তাঁর প্রিয়দর্শন আকৃতির জন্য তাঁর সহপাঠীরা তাঁকে ভালোবাসতেন। তাঁদের মধ্যে একজন লিখেছেন, হ্যেল্‌ডার্লিন প্রবেশ করলে মনে হত যেন অ্যাপোলো পদচারণা করছেন। সংগীতের মধ্যে হ্যেল্‌ডার্লিন সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলেন, বেহালা ও

১ 'হে কবিগণ! আমাদের কিন্তু ঈশ্বরের ঝড়ের মুখে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে, অনাবৃত মস্তকে, আমাদের মহান্‌ পিতার বজ্র নিজেদের মুষ্টিতে গ্রহণ করার জন্য এবং জনগণের কাছে স্বর্গীয় উপায়ন সংগীতের আবরণে উপস্থাপন করার জন্য।'

পিয়ানো বাজানোতে তাঁর ছিল অসামান্য দক্ষতা। ১৭৮৭ অব্দে তিনি তাঁর বন্ধুর আত্মীয়া Luise Nast-এর প্রতি আকৃষ্ট হন ও এই মেয়েটিকে বিবাহ করবেন স্থির করেন। বছর তিনেক পরে হেল্‌ডার্লিন্‌ তাঁকে জানান—তাঁর কবিসত্তা প্রতিষ্ঠা না পেলে তাঁর মনের অস্থিরতা যাবে না ও সেইজন্য তাঁর পক্ষে বিবাহ করা সম্ভব নয়।

পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত দোলাচলচিত্তবৃত্তি হেল্‌ডার্লিন কর্ম থেকে কর্মান্তর গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কোনো কাজই তাঁর মনের মতন হয় নি; তার পর ফ্রাঙ্ক্‌ফুর্টের একজন ব্যাঙ্ক্‌-মালিকের বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাজে তাঁর মন বসে। কিন্তু নিয়োগকারীর মনোহারিণী পত্নী Susette Gontard-এর প্রতি আনুরক্তির জন্য তিন বছরের মধ্যে তাঁকে এ কাজ ছাড়তে হয়। এই মহিলাটিও তাঁকে ভালোবেসেছিলেন। এঁর সম্বন্ধে হেল্‌ডার্লিন একটি চিঠিতে লেখেন—'সংসারে এমন একজন রয়েছেন যাঁর ওপর আমার মন পড়ে থাকতে পারে, ও পড়ে থাকবে, হাজার হাজার বছর এবং তার পরেও দেখবে আমাদের সমস্ত চিন্তা ও বোধশক্তি প্রকৃতির নাগাল পাবে না। সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের, প্রশান্তি ও জীবন-প্রাচুর্যের, আত্মিক ভাব, মানসিক প্রকৃতি ও আকৃতির সুন্দর মিলন হয়েছে এঁর মধ্যে।'

হেল্‌ডার্লিনের কাছে সুজেট্‌ ছিলেন ডায়োটিমা—যে ব্রহ্মচারিণী ডায়োটিমা প্লেটোর 'সিম্‌পোজিয়াম্‌'-এ সক্রেটিস্‌কে প্রেমের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত করেছেন। সুজেটের মধ্যে হেল্‌ডার্লিন সেই 'আত্মার সহোদরা'কে প্রথমবার ও শেষবারের মতো খুঁজে পেয়েছিলেন যে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বুঝেছিল ও তাঁর সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে পেরেছিল। বিবাহিত জীবনে সুজেট সুখী হতে পারেন নি। হৃদয়ের স্তরে ভাব-বিনিময় তাঁর পক্ষেও মর্মস্পর্শী ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। অনুরাগের অনুভূতির সঙ্গে তাঁরা দুজনেই ঈশ্বরের সান্নিধ্যও অনুভব করতে পেরেছিলেন। এই সম্পর্কে হেল্‌ডার্লিন নিজেই 'ডায়োটিমার জন্য বিলাপ' কবিতায় লিখেছেন—

'কিন্তু আমরা, সুখ-সম্পৃক্ত—হংসমিথুনের মতো, হ্রদের জলে ভাসমান, কিংবা তরঙ্গ-হিল্লোলিত, তাদের দৃষ্টি জলের গভীরে নিবদ্ধ, যেখানে রজতাভ মেঘমালা প্রতিবিম্বিত হয়েছে এবং তাদের অবাধ সঞ্চরণকালে তাদের নীচে স্বর্গীয় নীলিমা স্ফীত হয়ে উঠছে—আমরা পৃথিবীর বুকে

এইভাবে পদক্ষেপ করেছি। এবং যদিও প্রেমিকদের শত্রু ও দুঃখের দূত উত্তরের হাওয়া আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠত, এবং যদিও গাছের ডাল থেকে পাতা সব ঝরে যেত ও বায়ুতাড়িত হয়ে বৃষ্টি নাবত, আমরা মৃদুভাবে হাসতাম, আমাদের মিলিত হৃদয়ের একক সংগীতের ভাববিনিময়ের নিবিড়তায় আমাদের দেবতার সান্নিধ্য উপলব্ধি ক'রে, গভীর শান্তিতে, নিজেদের নিয়ে একলা, শিশুর মতো এবং সুখী।'

কিন্তু এই গভীর শান্তি স্থায়ী হয় নি। সুজেটের স্বামীর কাছে অপমানিত হয়ে নিরপরাধ, মর্মাহত হেল্‌ডার্লিন ১৭৯৮ অব্দের এক দিন গোপনে গৃহত্যাগ করে হম্‌বুর্গ্‌ অভিমুখে যাত্রা করেন। পরে সুজেটের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ এবং গোপন সাক্ষাৎকারও হয়। হেল্‌ডার্লিনের কয়েকটি চিঠির খসড়া ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি ; কিন্তু সুজেটের প্রেমপত্রগুলি বিশ্বসাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ্ হয়ে আছে। কিছু দিন পরে হেল্‌ডার্লিন ও সুজেট সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার সংকল্প নেন, যাতে তাঁদের প্রেমের স্মৃতির গভীরতা ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে।

হম্‌বুর্গের পরে কিছু সময় হেল্‌ডার্লিন সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে কাটান। তার পর বত্রিশ বছর বয়সে হঠাৎ তাঁর মায়ের বাড়িতে চলে আসেন—তখন তিনি বিকৃতমস্তিষ্ক। (এর অল্প কিছু দিন আগে, ২২শে জুন ১৮০২, সুজেটের মৃত্যু হয়েছে।) বছর দুয়েক পরে হেল্‌ডার্লিন কিছুটা সুস্থ হন ও গ্রন্থাগারিকের কাজ নেন। ১৮০৬ অব্দে তাঁর উন্মাদ-রোগ খুব বেড়ে যায় ও তাঁকে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে বাধ্য করে। ১৮৪৩ অব্দের ৭ই জুন ব্রাহ্ম-মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু হয়।

হেল্‌ডার্লিনের হাইপীরিয়ন খেদোক্তি করেছে—'অন্য কোনো জাতিকে আমি জার্মানদের চেয়ে বেশী অঙ্গহীন ভাবতে পারি না। শ্রমিক দেখতে পাবে, কিন্তু মানুষ নেই, ভাবুক আছে, কিন্তু মানুষ নেই, প্রভু আছে ভৃত্য আছে, মধ্যবয়স্ক লোক আছে, কিন্তু মানুষ নেই…।' হেল্‌ডার্লিন নিজে ছিলেন সত্যিকারের মানুষ। সমকালীন জার্মানেরা বা অন্যান্যেরা কিন্তু তাঁর মহান্ মনুষ্যত্বের বা লোকোত্তর কাব্যের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারেন নি। প্রায় আমাদের যুগে এসে তিনি বড় কবি রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। গ্যেটে ও শিলারের সঙ্গে এখন তাঁকে একাসনে বসানো হয়। অবশ্য গ্যেটের চেয়ে

শিলারের সঙ্গেই তাঁর সাদৃশ্য বেশী। (শিলার গ্যেটেকে 'স্বভাব-কবি' ও নিজেকে 'ভাবপ্রবণ কবি' আখ্যা দিয়েছিলেন।) তাঁর উপর শিলারের প্রভাবও অনেক বেশী। হেল্‌ডার্লিনও ছিলেন শিলারের মতো আদর্শবাদী, দর্শন-শাস্ত্রে এবং গ্রীক সাহিত্যে অনুরাগী। ক্ল্যাসিকাল আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও ভাবাবেগের তীব্রতার দিক্‌ থেকে তিনি রোমাণ্টিক। স্টেফান্‌ গেঅর্গা ও রিল্‌কের মতো কবি এবং হের্মান্‌ হেসা'র মতো ঔপন্যাসিক হেল্‌ডার্লিনের প্রতিভাকে যথার্থ মূল্য দিতে পেরেছেন। আজ তাঁকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিদের মধ্যে অন্যতম গণ্য করা হচ্ছে।

সুজেটকে ভালোবাসার পর হেল্‌ডার্লিনের জীবনে গভীর পরিবর্তন আসে। তাঁর মানসীর তিনি নাম দেন—'ডায়োটিমা'। সুজেটের স্বভাবে তিনি যে সুষমা খুঁজে পেয়েছিলেন সেটা স্বভাবতঃই তাঁকে মুগ্ধ করে, কারণ সঙ্গতি ও সমন্বয়ের যে আদর্শ তাঁর মনের সঙ্গোপনে তিনি লালন করেছিলেন সেটির বাস্তব রূপ প্রথম তিনি সুজেটের মধ্যে দেখেন। সুজেটের সঙ্গে তাঁর পরিচয় তাঁর জীবনের যুগান্তকারী ঘটনা, পরম সুখের অনুভূতির প্রথম ও শেষ অভিজ্ঞতা। আদর্শবাদ ও রূপতৃষ্ণা—এই দুই বিপরীত প্রবণতাকে তিনি এত দিন তাঁর কাব্যের মধ্যে মেলাতে পারেন নি, এখন পারলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'মানবতার জন্য ভালোবাসা আমাদের হৃদয়ে বেশী দিন থাকতে পারে না যদি না ভালোবাসার মানুষ থাকে।'

হেল্‌ডার্লিন বিশ্বাস করতেন, প্রেম মানুষকে আত্মিক দাসত্বের কবল থেকে বাঁচাতে পারে। অনেক মানুষের কাছেই মহত্তর জীবনের সূচনা শুধু প্রেমের মধ্য দিয়েই সম্ভব। প্রেমকে তিনি মহৎ ও পরম কাম্য বৃত্তি মনে করতেন, কারণ লৌকিক ও অলৌকিক শক্তির সমন্বয় এর মধ্যে হয়েছে। ঐকতান ও পূর্ণতার যে বৃহত্তর জীবনাদর্শে তিনি আস্থা রাখতেন, প্রেম সম্পর্কিত তাঁর ধারণা তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাবে না। এ ধারণা ফরাসী কবি শার্ল বোদ্‌লেয়ারের ধারণার বিপরীত। বোদ্‌লেয়ার দৈহিক ও আত্মিক প্রেমের সমন্বয় করতে পারেন নি। নারীরা তাঁর কাছে প্রলুব্ধকারিণী দানবী, স্বার্থান্বেষিণী অভিনেত্রী বা সুন্দরী প্রাণীবিশেষ। আদর্শের সঙ্গে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিকে বোদ্‌লেয়ার কোনোদিন মেলাতে পারেন নি। বিমর্ষতার মধ্যে তিনি এক বিচিত্র ধরনের সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন বটে, কিন্তু আদর্শ সৌন্দর্যকে তিনি

বরাবর সুদূর ও অপ্রাপণীয় মনে করেছেন। ব্যাকুলতা ও বিষণ্ণতা তাঁর কাছে প্রকৃত সৌন্দর্যের অপরিহার্য অঙ্গ।

'ডায়োটিমা' কবিতায় হেল্‌ডার্লিন নিরবধি কালের গতিতে সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন, তাঁর প্রিয়ার সমাদর সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়েছেন—

নীরব তুমি, সহ্য করো, ওরা তোমায় কতটুকু জানে ;
স্বর্গের দেবতা তুমি! ম্লানমুখী, তুমি ভাষাহীনা,
বৃথা হায় খুঁজে ফেরো বর্বরের মাঝে
তোমার সমান যারা অরুণ কিরণে,
লোকোত্তর যে হৃদয় আজ আর নাহি রয়।
কাল ছুটে চলে। আমার এ স্বল্পায়ু সংগীত
দেখা পাবে সে দিনের, দেবতার পরে যবে
বীরেদের সাথে তব আসন অক্ষয়।

হেল্‌ডার্লিনে অনেক গীতিকবিতায় গভীর ট্র্যাজিক সুর ধ্বনিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে 'অদৃষ্টের প্রতি', 'সূর্যাস্ত', 'রুটি ও মদ', 'প্যাটমস্', 'রাইন নদী,' 'হাইডেল্‌বার্গ' প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাচীন গ্রীক আদর্শের প্রতি হেল্‌ডার্লিনের প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় তাঁর বহু রচনায় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সৌন্দর্য, সুষমা ও পূর্ণতার গ্রীক আদর্শের একনিষ্ঠ পূজারী। 'ডায়োটিমা'র মধ্যে এই আদর্শ তিনি মূর্তিমতী রূপে দেখেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে এ আদর্শের কোনো বিরোধ নেই। (রোমান ক্যাথলিক বোদ্‌লেয়ার 'আদিম পাপ' নিয়ে বিব্রত ছিলেন, হেল্‌ডার্লিন্ কিন্তু এ নিয়ে একেবারেই চিন্তা করেন নি।) 'সূর্যাস্ত' কবিতাটি ক্ষুদ্র, কিন্তু গ্রীক জীবনাদর্শের প্রতি আকর্ষণ এখানে তীব্র :

> তুমি কোথায়? তোমার সমস্ত তীব্র আনন্দের মত্ততায় আমার হৃদয়ে গোধূলি, কারণ এইমাত্র আমি চিত্তহারী তরুণ সূর্যদেবকে স্বর্গের বীণায় স্বর্ণময় সুরে তাঁর সন্ধ্যা-সংগীত বাজাতে শুনেছি। আশ-পাশের বনে পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি। তিনি চলে গেছেন অনেক দূরে ধর্মপ্রাণ লোকদের কাছে যারা এখনও তাঁর পূজা করে।

হেল্‌ডার্লিন বলতে চান, আধুনিক জগৎ, বিশেষতঃ জার্মানী, এখন মরণোন্মুখ, কারণ প্রাচীন গ্রীসের অনুপ্রেরণা এখন লুপ্ত। সূর্যদেব অ্যাপোলোর স্বল্পস্থায়ী

সংগীত হেল্‌ডার্লিনের কানে এসেছে। অ্যাপোলো পলাতক, তাঁর প্রস্থান দিবসের অবসানের সঙ্গে মিলেছে, যে অবসান 'স্বর্ণময় স্বরে' রঞ্জিত।

গ্যেটের ধারণা, গ্রীক সাহিত্য শান্তরসপ্রধান, মহান্‌, ক্লাসিক্যাল্‌। হেল্‌ডার্লিন গ্রীক জীবনধারার নূতনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কাছে গ্রীক সাহিত্য অ-যুক্তিনিষ্ঠ, আবেগপ্রবণ, রোমান্টিক-রূপে প্রতিভাত হয়েছে। গ্রীকদের মধ্যে হেল্‌ডার্লিন রোমান্টিক ও ট্র্যাজিক ব্যক্তিত্বের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর স্তোত্র বা শোকগীত ধরনের কবিতাগুলিতে ভাষা ও শৈলীর যে চরম উৎকর্ষ ও ভাবের যে পরম গাম্ভীর্য দেখা যায়, স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ পাঠকের কাছে তা সহজে বোধগম্য নয়।

হেল্‌ডার্লিনের মহৎ উপন্যাস 'হাইপীরিয়ন'কে ( ১৭৯৭ ) আমরা শিক্ষানবীশের রচনা আখ্যা দিতে পারি। এর পরিণতি কিন্তু গ্যেটের 'ভিল্‌হেল্‌ম্‌ মেইস্‌টারের' মতো নয়। মোহভঙ্গ ও মৃত্যুতে এর পরিণতি। মহাপ্রাণ আধুনিক গ্রীক যুবক এই কাহিনীর নায়ক; মাতৃভূমিকে প্রাচীন মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ও তুরস্কের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য সে সংগ্রামরত। উদারচেতা দুই বন্ধু ডায়োটিমা ও অ্যালাবান্‌ডার মৃত্যুর পর হাইপীরিয়নের বিশ্বাস ও আদর্শ ধূলিসাৎ হল। সংসার ত্যাগ করে সে সন্ন্যাস গ্রহণ করল। হেল্‌ডার্লিনের নিজের জীবনের অনেক সমস্যা ও ব্যর্থতা এই করুণ কাহিনীর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে।

'হাইপীরিয়নের অদৃষ্টের গান' দেবতার ও মানুষের বিসদৃশ ভাগ্যের ছবি তুলে ধরেছে। এক দিকে দেবতারা অনাবিল সুখ ও সৌন্দর্যে শয়ান, আলোকের ধারায় অভিষিক্ত; অন্য দিকে হতভাগ্য মানুষ, এস্‌কিলাস যাঁদের বলেছেন এক দিনের প্রাণী। দেবতারা লঘুতায় লীন, মানুষ বেদনায় ভারাক্রান্ত। গানটি এইভাবে শেষ হয়েছে— 'আমাদের ভাগ্যে কোনো স্থানে বিরাম নেই। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়, নিমেষ থেকে নিমেষান্তরে অন্ধভাবে গিয়ে পড়ে, এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে জলধারা যেমন দিনের পর দিন আছড়ে পড়ে অজানার অতল গহ্বরে।'

'এম্‌পেডাক্লীজের মৃত্যু' নাটকের খণ্ডাংশ। এর নায়ক মহান্‌ দার্শনিক ও তার চরিত্র খানিকটা ফাউস্ট-এর মতো। দেবতাদের সে প্রিয়, স্বর্গ থেকে সে নতুন বাণী এনেছে মানব-সমাজে প্রচারের জন্য। কিন্তু মানুষ তাকে সন্দেহ

করায় এট্‌না-পর্বতের গহ্বরে নিজেকে ছুঁড়ে ফেলে সে আত্মহত্যা করল। তার শেষ আশা ছিল, হয়তো তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে তার নিজের দেবত্ব প্রমাণ করতে পারবে ও তার জাতিকে নতুন ধর্মে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারবে। 'হাইপীরিয়নে'র মতো এখানেও একজন আদর্শবাদীর জীবনকে বড়ো করে দেখানো হয়েছে যার মোহভঙ্গের একমাত্র পরিণতি মৃত্যু।

আধ্যাত্মিক জীবন হেল্‌ডার্লিনকে অনুপ্রাণিত করলেও প্রচলিত ধর্মমতে তিনি বেশী আস্থা রাখতে পারেন নি। তাঁর কবিজীবনের মধ্যভাগে রচিত কবিতাগুলিতে মানবজীবনের ক্ষণভঙ্গুর অস্তিত্বের কথা বারংবার এসেছে। বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার গভীর বোধ এই কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। দেবতাদের ব্যক্তিত্বে হেল্‌ডার্লিন বিশ্বাস করেছেন, কিন্তু মানুষের দুর্দশার প্রতি দেবতাদের ঔদাসীন্যে তিনি হয়েছেন বিস্মিত ও ভগ্নহৃদয়। মানুষ নিজেও তার ভাগ্যের জন্য অনেকটা দায়ী এ কথাও তাঁর মনে হয়েছে। নিজের শক্তিমত্তা তাকে অন্ধ করেছে, নিসর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে বাঁচতে চেয়েছে। এইজন্যই হেল্‌ডার্লিন আশা পোষণ করেছেন, প্রাচীন গ্রীসের আদর্শ মানুষকে হয়তো মুক্তির পথ দেখাতে পারবে। নবজীবনের কূলে উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রেম হয়তো পূর্ণ সার্থকতায় মণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ইহজীবনে প্রেমের বিধ্বংসী শক্তি তাঁকে বিমূঢ় করেছে। এইসব কারণে হেল্‌ডার্লিনের রচনার সুর আশ্চর্য রকম 'আধুনিক' মনে হয়। তবু নৈরাশ্য কখনো হেল্‌ডার্লিনের কাব্যের শেষ কথা নয়। বোদ্‌লেয়ারের মতো শুধু হতাশা, ক্রোধ ও ক্ষোভ তিনি পুঞ্জীভূত করে তোলেন নি। মধ্যরাত্রির অন্ধকারের মধ্যে প্রভাতের আলোর যে অঙ্কুর লুকিয়ে আছে তার গোপন সৌরভ হেল্‌ডার্লিনের কবিতায় সঞ্চারিত হয়েছে।

## জাকোমো লেওপার্দী

১৭৯৮-১৮৩৭

Negative and Positive are equally strong within his poetry.

J. H. WHITFIELD

আধুনিক ইটালির মহত্তম কবি জাকোমো লেওপার্দী। প্রখ্যাত সমসাময়িক ফরাসী সমালোচক স্যাঁৎ-ব্যুভ্ লেওপার্দীকে 'কবিদের মধ্যে উদারতম, শান্ততম, কঠোরতম' বলে অভিহিত করেছেন। তাসোর পরে লেওপার্দীর মতো বড়ো কবি ইটালীতে আর জন্মগ্রহণ করেন নি।[১] ম্যাথিউ আর্নল্ডের মতে, মিল্টন্ ও দান্তের সঙ্গে এক পর্যায়ে তাঁর নাম উল্লেখ করা যায়। মিল্টন্ ও দান্তের সঙ্গে বঙ্গদেশের বিদগ্ধ-সমাজের পরিচয় আছে, লেওপার্দীর সঙ্গে নেই, এটা দুঃখের কথা। লেওপার্দীর কাব্যের আবেদন বিশ্বজনীন। তিনি মনে-প্রাণে রোমান্টিক, আবার কায়মনোবাক্যে ক্ল্যাসিকাল। কল্পনার পূর্ণ ও অবাধ বিকাশে, বেদনার সূক্ষ্ম, জটিল ও ব্যাপক অনুভূতিতে, মনের ঔদার্যে তিনি রোমান্টিক, আবার কঠোর আদর্শ ও নিয়মচর্যায়, আঙ্গিকের পূর্ণতা ও বিশুদ্ধির জন্য আগ্রহে, এবং গ্রীক রীতির প্রতি অনুরাগে তিনি ক্ল্যাসিকাল। যাঁরা ইংরাজি সাহিত্যের খবর রাখেন তাঁরা লেওপার্দীর সঙ্গে ইংরাজ রোমান্টিক কবিদের সাদৃশ্য সহজেই আবিষ্কার করতে পারবেন। ওয়ার্ডসোয়ার্থ ও কোল্‌রিজের 'লিরিক্যাল্ ব্যালাডস্' যে বছর প্রথম প্রকাশিত হয়, লেওপার্দীর জন্ম সেই বছরে। তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য, স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি, অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা ও নৈরাশ্য আমাদের বায়রন ও শেলীর কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর সৌন্দর্য-স্পৃহা, গ্রীক সাহিত্যে অনুরাগ, নারীর প্রেমের জন্য ও মৃত্যুর জন্য ব্যাকুলতা কীট্‌সের কথা স্মরণে আনবে। এঁদের মতো লেওপার্দীরও যৌবনেই মৃত্যু

১ পরবর্তী ইতালীয় কবিতায় লেওপার্দীর প্রভাবের জন্য বর্তমান লেখকের 'আধুনিক ইতালীয় কবিতা' ("আসর পত্রিকা", শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭৮) দ্রষ্টব্য।

হয়েছে ; এঁদের মতো তিনিও বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। আর এক-জন বিদেশী লেখকের সঙ্গে লেওপার্দীর সাদৃশ্য রয়েছে এবং এই সাদৃশ্য অনেক ঘনিষ্ঠতর ; তিনি হচ্ছেন সমসাময়িক জার্মান্ রোমান্টিক কবি—নীকোলাউস্ লেনাউ। লেনাউ ব্যক্তিগত জীবনে খুব অসুখী ছিলেন এবং তিনি মূলতঃ দুঃখবাদী কবি।

১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২৯ শে জুন মধ্য ইটালীর অন্তর্গত আংকনা নগরীর নিকট রেকানাতি শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জাকোমো লেওপার্দী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সদাশয় পিতা কাউণ্ট মোনাল্দো লেওপার্দীর সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল ও তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। মতবাদের দিক থেকে লেওপার্দীর পিতা অবশ্য প্রাচীনপন্থী সংস্কার-বিরোধী ছিলেন এবং সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন নি। ধর্মভীরু হলেও লেওপার্দীর মা, আদেলাইদি অ্যান্‌টিচি, ছিলেন অনুদার ও উগ্র প্রকৃতির মহিলা, এবং সব ব্যাপারে তিনি স্বামী ও সন্তানদের উপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতেন। মোনাল্দো লেওপার্দীর আর্থিক বিপর্যয়ের পর সংসার চালানোর দায়িত্বও আদেলাইদি নিজের হাতে তুলে নেন। তাঁর সম্পর্কে লেওপার্দী Zibaldone শীর্ষক দিনপঞ্জীতে লিখেছেন, আদেলাইদি রুক্ষ স্বভাবের ছিলেন ও স্নেহশীলা ছিলেন না এবং সন্তানের মৃত্যুতে অন্তরে অন্তরে আনন্দ অনুভব করতেন। ( সম্ভবত কবির এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। )

লেওপার্দীর পরিবারে নূতন যে কোনো ধারণা বা কাজকে সন্দেহের চোখে দেখা হত। এই রক্ষণশীল পরিবেশ বালক লেওপার্দীর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে একেবারে অনুকূল ছিল না। লেওপার্দীর শিক্ষক ছিলেন পুরোহিত সেবাস্‌টি-আনো ম্যান্‌চিনি, কিন্তু দশ বছর বয়সের পর লেওপার্দী যা কিছু শিক্ষা লাভ করেছেন তার প্রায় সবটাই তাঁদের পরিবারিক পাঠাগার থেকে। এই বিরাট পাঠাগারে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। কৈশোর অবস্থাতেই তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ষোলো বছর বয়স হওয়ার আগেই তিনি দুটি বিয়োগান্ত নাটক, অনেকগুলি ইতালীয় কবিতা ও ল্যাটিন আলোচনা পুস্তিকা, গ্রীক সাহিত্যের সমালোচনা ও জ্যোতির্বিদ্যার ইতিবৃত্ত রচনা করেন। কিন্তু লেওপার্দী সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন না ও অত্যধিক পাঠাভ্যাসের ফলে তাঁর শরীর

একেবারে ভেঙে যায় ( ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে ) ও তিনি মেরুদণ্ডের রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর দৃষ্টিশক্তিও খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। পরে কোনোদিনই লেওপার্দী তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারেন নি। তাঁর মনোবল হ্রাস পায় ও তিনি বিশেষভাবে মানসিক অবসাদে আক্রান্ত হন। সাময়িক বিরতি ছাড়া এ অবসাদের থেকেও লেওপার্দী কোনোদিন পরিত্রাণ পান নি, তবে কবিতা রচনা করে কিছু শান্তি পেতেন।

ইতিমধ্যে পনেরো থেকে উনিশ বছর বয়সের মধ্যে লেওপার্দী বহু অসাধারণ প্রবন্ধ রচনা করেন এবং গ্রীক রচনাবলী অনুবাদ করেন। মিলানের একটি পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় লেওপার্দীর বিদ্যাবত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় ও সে সময়ের প্রখ্যাত পণ্ডিত পিয়েত্রো জিয়র্দানি তাঁকে বন্ধুরূপে স্বীকৃতি দেন। এ সময় লেওপার্দী ইতালীয় ভাষায় কিছু কিছু মৌলিক কবিতাও রচনা করেন। ( সমগ্র জীবনে লেওপার্দী খুব বেশি কবিতা লেখেন নি। যা লিখেছেন তার মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ যেগুলি তার প্রায় সবই *Canti* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। )

১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে ইতালীয় রোমান্টিক আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা লদোভিকো দি ব্রেমের 'আধুনিক কবিতা' সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর প্রত্যুত্তরে লেওপার্দী একটি প্রবন্ধ লেখেন ও তাতে রোমান্টিক মতবাদের ঘোরতর বিরোধিতা করেন। রোমান্টিকতা সম্পর্কে লেওপার্দীর জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ, বিচার পক্ষপাতদুষ্ট। রোমান্টিকতার বিরোধিতার মধ্য দিয়েও তাঁর নিজের রোমান্টিক প্রবণতা পরিস্ফুট। তাঁর মতে, প্রকৃতির সহজ ও চিরন্তন সৌন্দর্যরাজিই কবির অনুকৃতির প্রকৃত বিষয়-বস্তু। কল্পনাকেই তিনি কবি-প্রেরণার উৎস-রূপে স্বীকার করেন, বুদ্ধিবৃত্তিকে নয়। পরিশেষে ইটালীর যুবশক্তির কাছে তিনি দেশপ্রেমে দীক্ষিত হওয়ার জন্য আবেদন জানান।

ওই বছরের শরৎকালেই লেওপার্দীর প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা ইতালীয় গাথায় আবার তাঁর দেশপ্রেমের উজ্জ্বল প্রকাশ দেখা যায়: 'হে পিতৃভূমি আমার! আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রাচীর এবং স্তম্ভ এবং মূর্তি এবং নির্জন মিনার আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাদের মহিমা আমি দেখতে পাচ্ছি না, যে জয়মাল্য ও লৌহবর্ম আমাদের প্রাচীন পিতৃপুরুষেরা বহন করতেন তা আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

লেওপার্দী তাঁর যে কবিতাগুলিকে 'ইডিল্' ( *Idilli* ) রূপে বর্ণনা করেছেন সেগুলির প্রথমটির রচনাকাল ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের বসন্তকাল। রেকানাতি শহরের ঠিক ধারেই এক নির্জন পাহাড়ে গিয়ে তার চূড়ায় লেওপার্দী বিশ্রাম করতে ভালোবাসতেন। শিখরের উচ্চতা থেকে তাঁর দূর-দূরান্তের অনুভূতি হত। চার দিকে পাছপালায় ও ঝোপঝাড়ে এই দূরত্বের অনেকটাই পরিদৃশ্যমান হতে পারত না, ফলে পরিমাপেরও কোনো নিরিখ থাকত না। কবি-কল্পনায় এই দূরত্ব ক্রমবর্ধমান হতে হতে অনন্তে গিয়ে মিশত, তখন আবার কবিচিত্ত অনন্তের ধ্যানে নিবিষ্ট হত। এই ধ্যানের মধ্য দিয়ে কবির ভারাক্রান্ত, অশান্ত হৃদয় শান্তির সন্ধান পেত। এই অনুভূতির বাণী 'অনন্ত' ( *L'infinito* ) কবিতার পনেরোটি অমিত্রাক্ষর পঙ্‌ক্তিতে স্ললিত নাদে ধ্বনিত। ( এই কবিতাটির প্রসঙ্গেই রিচার্ড গার্নেট্ তাঁর 'ইতালীয় সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—'লেওপার্দীর অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইতালীয় সাহিত্যে স্থন্দরতম।' ) কবিতাটি পড়লে ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতার কথা মনে আসা স্বাভাবিক—

'এই নির্জন পর্বত আর এই ঝোপঝাড়, যেটা দূর দিগন্তের অনেকটা অংশ আমার দৃষ্টি থেকে আবৃত করে, সব সময় আমার কাছে প্রিয় ছিল। কিন্তু যখন আমি বসে বসে দেখি, তখন মনে মনে নিজের জন্য রচনা করি দূরান্তের অন্তহীন ব্যবধান, মানব-অনধিগত নীরবতা, ও গভীর শান্তি, যেখানে কিছু সময়ের জন্য হৃদয় শঙ্কিত হয় না। এইসব গাছপালার ভিতরে যখন বাতাসের ঝির্‌ঝির্ শব্দ শুনি, আমি এই স্বরকে সেই অনন্ত নীরবতার সঙ্গে তুলনা করি : আর আমি শাশ্বতকে স্মরণ করি, বিগত কালকে, আর প্রাণবন্ত বর্তমানকে ও তার শব্দকে। এইভাবে এই বিশালতার মধ্যে আমার ভাবনা ডুবে যায় : আর এই সাগরে ভরাডুবি আমার কাছে মধুর।'

রেকানাতির জীবন লেওপার্দীর কাছে ক্রমশ অধিকতর অসহনীয় হয়ে উঠছিল। যে ধরনের সঙ্গ লেওপার্দীর কাম্য ছিল তা এই শহরে দুর্লভ ছিল ; পারিবারিক উৎপীড়নও অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে সাবালক হওয়া মাত্র লেওপার্দী পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু তাঁর বাবা আগে থাকতে জানতে পেরে লেওপার্দীর পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করেন। লেওপার্দীর বিষণ্ণতা হতাশায় পরিণত হল। নিজের দুর্ভোগ ও আশাভঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে সমস্ত মানব জীবনই যন্ত্রণা ও ব্যর্থতার গ্লানিতে

অভিশপ্ত, শেক্স্‌পীয়রের হ্যাম্‌লেট্‌ যে রকম ওফেলিয়া ও গার্ট্রুডের আচরণ দেখে সিদ্ধান্ত করেছিল সব নারীই অসতী। তবু লেওপার্দী তাঁর স্নেহশীলতা ও সৌন্দর্য-সচেতনতা হারান নি এবং নিরলস বিদ্যাচর্চায় দুঃসহ ক্লান্তি খানিকটা ভুলে থাকতে পারতেন।

১৮২০ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে লেওপার্দী 'ছুটীর সন্ধ্যা' রচনা করেন। কবিতাটির প্রারম্ভে শান্ত সৌন্দর্যের আরতি—'রাত্রি মধুর ও উজ্জ্বল, বাতাস নেই, ছাদের ওপর ও ফলবাগিচার মধ্যে শান্তভাবে চাঁদ বিশ্রাম করছে ও দূরের প্রতিটি পাহাড়কে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত করছে।' তাঁর মানসী শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকুক ; কোনো দুশ্চিন্তার আগুনে সে দগ্ধ হচ্ছে না, কবির হৃদয়ে যে ক্ষত সে জাগিয়ে তুলেছে তার সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সর্বশক্তিময়ী প্রকৃতি কবিকে সৃষ্টি করেছে শুধু যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য। কবির প্রতি প্রকৃতির উক্তি—'তোমাকে আমি আশা রাখতে দেব না, না, আশাও নয় ; তোমার চোখে আলো দেখা যাবে শুধু অশ্রুবিন্দুর।' ছুটীর দিনের অবসানে কবির মানসী হয় তো সুখস্বপ্নে বিভোর, কবি কিন্তু তীব্র যন্ত্রণায় জর্জর—'আমি প্রশ্ন করি আর কত দিন আমায় বেঁচে থাকতে হবে, আর এখানে মাটির উপর আছড়ে পড়ি, আর চীৎকার করে কেঁদে উঠি, আর থরথর কাঁপতে থাকি।' কবিতার শেষাংশে এই তীব্রতার উপশম হয়েছে বটে কিন্তু গভীর বিষাদে সমস্ত কবিতাটি আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। ব্যক্তিগত বেদনা থেকে কবি এই গভীরতর সত্যে উপনীত হয়েছেন যে কালের করাল গ্রাস থেকে কোনো কিছুই রক্ষা করা যায় না।

এর পরের তিন বছর লেওপার্দী যে কবিতাগুলি লেখেন তার মধ্যে 'নিঃসঙ্গ জীবন' ও 'বসন্তের প্রতি' অন্যতম।

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের শীতকালে লেওপার্দী পিতামাতার অনুমতি নিয়ে কয়েক মাস রোমে কাটিয়ে আসেন। তবে যে কাজ পাওয়ার আশায় তিনি এখানে এসেছিলেন সে কাজ তিনি পান নি ; রোমক বিদ্বজ্জনদের তাঁর কেমন নিরুত্তাপ মনে হয়েছিল, আর রোম নগরীকে মনে হয়েছিল বিশাল শূন্যতা। বসন্ত-সমাগমে লেওপার্দী রেকানাতিতে ফিরে আসেন।

এখানেই, শরৎকালে, লেওপার্দী তাঁর অতুলনীয় কবিতা 'মানসীর প্রতি' রচনা করেন। যে প্রতিমা তাঁর মন জুড়ে রয়েছে তা কোনো শরীরী রমণীর

নয়, তা হল এক আদর্শ নারীরূপিণীর যাকে শুধু স্বপ্নে বা কল্পনাতেই দেখা যায়। হয় তো কোনো সত্যযুগে এ দেহ ধারণ করেছিল, হয় তো মানবতা এখনও এ সৌভাগ্যে বঞ্চিত, হয় তো কোনো দূর গ্রহান্তরে তার বাস। হয় তো শাশ্বত 'ধারণা'গুলির অন্যতম, এত সৌন্দর্যের অধিকারিণী, এত আনন্দদায়িনী, যে যদি কেউ সত্যই তাকে ভালোবাসতে পারত তা হলে পার্থিব জীবনের অনিবার্য দুঃখের মধ্যেও জীবন ধন্য হয়ে উঠত।

১৮২৪ থেকে ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দ লেওপার্দী জীবনে এত বীতস্পৃহ হয়ে পড়েন যে কবিতা লেখার শক্তিও হারিয়ে ফেলেন।

গদ্যে রচিত 'নৈতিক রচনাবলী' অধিকাংশই ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে লেখা হয়, এবং আরও দুটী রচিত হয় ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে। এর মধ্যে কুড়িটার মতো রচনা কথোপকথন এবং দশটার মতো অন্যান্য রচনা। এই সব অন্যান্য রচনার মধ্যে 'পক্ষী প্রশস্তি' বিশেষ চিত্তগ্রাহী। লেওপার্দী যাদের কথোপকথন লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে হার্কিউলিস্ ও অ্যাট্‌লাস্, কলাম্‌বাস ও তাঁর এক জন নাবিক, প্লটিনাস্ ও পর্‌ফিরি। বেশীর ভাগ লেখাতেই লেওপার্দীর চিরাচরিত দুঃখবাদ ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু চরিত্র ও রীতির বৈচিত্র্যে, কল্পনা-শক্তির প্রাবল্যে, কথাবার্তার সজীবতায়, রঙ্গব্যঙ্গ ও শ্লেষের চমকে, ও গদ্যশৈলীর প্রসাদ-গুণে 'নৈতিক রচনাবলী' অসামান্য হয়ে উঠেছে।

অ্যাট্‌লাস্ পৃথিবীর ভার বহন করতে করতে অবসন্ন হয়ে পড়েছে ভেবে দেবরাজ জোভ্ হার্কিউলিস্‌কে পাঠিয়েছেন তার ভার লাঘব করার জন্য। অ্যাট্‌লাস্ বলল, পৃথিবী এত লঘু হয়ে গেছে যে তাকে বহন করা একেবারেই কঠিন নয়। হার্কিউলিস্ পৃথিবীকে হাতে নিয়ে দেখল, পৃথিবী হাল্‌কা এবং সম্পূর্ণ নীরব: এর অধিবাসীরা সকলে নিশ্চয় দীর্ঘস্থায়ী নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তাদের জাগাবার জন্য দু-জনে পৃথিবীর সঙ্গে বল নিয়ে খেলা শুরু করল। অ্যাট্‌লাসের খেলার ভুলে পৃথিবীর পতন হল, কিন্তু জীবনের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। কথিত আছে, পৃথিবীর পতনেও সাধু ব্যক্তি বিচলিত হয় না, হার্কিউলিস্ তাই সিদ্ধান্ত করল পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীরাই সাধু।

প্লটিনাস্ ও পর্‌ফিরির দীর্ঘ কথোপকথনে পর্‌ফিরি মনে করে, জীবনে দুঃখ এত বেশী যে আত্মহত্যা করা দোষের নয়: প্লটিনাস জীবন-যন্ত্রণা অস্বীকার করে না, কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ তার অনুমোদিত নয়। সমস্ত

কথোপকথনের মধ্যে প্লটিনাস্ ও পর্ফিরির গভীর বন্ধুত্ব ফুটে উঠেছে; শেষাংশে "আত্মীয়, ছেলেমেয়ে, ভাই বোন, মা বাবা, স্ত্রী এবং অন্যান্য যাদের সঙ্গে থাকতে আমরা সংসারে অভ্যস্ত" সকলেই এই মৈত্রীর বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। নিজেকে জীবন থেকে বঞ্চিত করার অর্থ এই সব প্রীতি থেকে বঞ্চিত করা। আরও গুরুতর ব্যাপার হচ্ছে, আত্মহত্যার অর্থ প্রিয়জনদের উপর স্বার্থপরের মতো দুঃখের বর্বর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া। মানুষের প্রকৃত কর্তব্য একেবারে ভিন্ন ধরনের—

'এসো, পর্ফিরি, আমরা বেঁচে থাকি, এবং পরস্পরকে শক্তিশালী করি: যে দুঃখ সমগ্র মানবজাতির ভাগ্যলিপি তার আমাদের অংশ আমরা যেন গ্রহণ করতে অস্বীকার না করি। বরং এসো আমরা পরস্পরের সঙ্গে থাকি, পরস্পরকে সাহস দিই, পারস্পরিক সাহায্যে পরস্পরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিই।'

১৮২৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিন বছর লেওপার্দী তাঁর মিলান-বাসী প্রকাশক আন্তোনিও স্তেলার নিকট কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। যদিও এই কাজের জন্য মিলানে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না, লেওপার্দী রেকানাতি ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই তিন বছরের বেশির ভাগ সময় তিনি বোলোনিআ, ফ্লরেন্স্ ও পিসা-তে কাটান। ইতালীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সহিত এই সব নগরীতে লেওপার্দীর পরিচয় হয়, এঁদের মধ্যে সহৃদয় লোকেরও অভাব ছিল না। এই সব পরিচয় কিন্তু কোনোক্ষেত্রেই অন্তরঙ্গ বা স্থায়ী বন্ধুত্বে পরিণতি লাভ করে নি। নূতন নগরীতে এসেও তিনি নিঃসঙ্গতার বোধ থেকে পরিত্রাণ পান নি। যাঁদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত রোমান্টিক লেখক আলেস্সান্দ্রো মান্‌জোনী অন্যতম। তাঁর নিয়োগকর্তা স্তেলার জন্য লেওপার্দী সিসারো'র একটি সংস্করণের আংশিক সম্পাদনা করেন, পেত্রার্কার কবিতার ভাষ্য রচনা করেন, এবং ইতালীয় গদ্য ও পদ্যের সংস্করণ প্রণয়ন করেন।

১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের বসন্ত-কালে পিসার নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে লেওপার্দীর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হয়। যে জড়তা তাঁকে গ্রাস করেছিল তার থেকে তিনি মুক্তি পান ও নূতন চেতনা নবীন গীতোচ্ছ্বাস জাগিয়ে তোলে। তাঁর

নবজাগৃতির বিবরণ **Il risorgimiento** ( 'জাগরণ, পুনর্জন্ম' ) কবিতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। অদৃষ্ট সম্পর্কে যদিও তাঁর ধারণা এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে, তিনি দুঃখ ও আনন্দ দুই-ই আবার অনুভব করতে পারছেন ; অন্ততঃ তাঁর হৃদয় প্রাণবন্ত রয়েছে। নূতন প্রাণশক্তি ও নবীন চেতনার কাব্যে প্রথম পূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা 'সিল্‌ভিআর প্রতি' কবিতায় দেখতে পাই। এই কবিতাটিতে ও এর পরবর্তী কয়েকটি কবিতায় কবি স্মৃতিচারণায় মগ্ন—কৈশোরের ফেলে-আসা দিনগুলির ও তখনকার আবেগ-অনুভূতির জন্য কবির ব্যাকুলতা এই সব কবিতায় বাণীরূপ পেয়েছে। রেকানাতির একটি মেয়েকে লেওপার্দী এক সময় ভালোবেসেছিলেন, অনেক দিন হ'ল সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। সেই মেয়েটিরই তিনি নাম দিয়েছেন 'সিল্‌ভিআ'। তিনি সেই দিনগুলি মনে করেছেন যখন মেয়েটির লাজুক ও হাসিমাখা চোখে সৌন্দর্য জ্বলে উঠত এবং সে আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে যৌবনের দ্বারপ্রান্ত অতিক্রম করতে উন্মুখ হয়েছিল। গৃহকর্মের মাঝে মাঝে মেয়েটি গান গাইত ; লেওপার্দী তাঁর পড়াশুনা ফেলে রেখে নিজের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেন তার কণ্ঠস্বর ও সুতা কাটার শব্দ শোনার জন্য—

তাকাতাম স্বচ্ছ আকাশের দিকে
আর সোনালি পথ ও বাগানের দিকে,
আর এ দিকে দূরে সমুদ্র, ও দিকে পাহাড়।
কি যে অনুভব করতাম বুকের মাঝে
মানুষের ভাষায় তা প্রকাশের অতীত।

*

কি মধুর সব ভাবনা,
সে কি আশা, কি হৃদয়, ওগো মোর সিল্‌ভিআ!
কত সুন্দরই না মনে হত
মানুষের ভাগ্য, মানুষের জীবন।
অত আশার কথা যখন মনে পড়ে
তিক্ত বেদনায় মন ভরে যায়,
নিজের দুর্ভাগ্য ভেবে আবার শঙ্কিত।

প্রকৃতি, অয়ি প্রকৃতি,
তোমার সে দিনের প্রতিশ্রুতি
কেন তুমি ভেঙে দিলে পরে ?
নিজের সন্তানগণে তব
কেন এত প্রতারণা ?

যে যৌবন মাধুর্যে পরিপূর্ণ হতে পারত তাকে দুজনের কেউই পেল না—একজন মৃত্যুর কারণে, আর এক জন অদৃষ্টের জন্য।

এই কবিতাটির ও পরবর্তী অধিকাংশ কবিতার জন্য লেওপার্দী 'মুক্ত গীতি'র রীতি ব্যবহার করেছেন, যার প্রথম প্রবর্তক তাসো। বিভিন্ন স্তবকগুলি অসমান দৈর্ঘ্যের এবং বড় ও ছোট পঙ্‌ক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাজানো হয়; মিলের ব্যবহার বেশ কম। লেওপার্দীর ব্যাকুল চিন্তা ও আবেগের স্বত-উৎসারিত প্রকাশের জন্য এই কাব্যরূপ খুব উপযোগী হয়েছিল।

স্তেলার কাছে কাজ করার দু বছরের চুক্তি উত্তীর্ণ হওয়ার পর লেওপার্দী রেকানাতিতে ফিরে আসেন। এই প্রত্যাবর্তন ছিল তাঁর পক্ষে বেদনাদায়ক, কিন্তু তাঁর নবলব্ধ কবিত্বশক্তির স্রোত রুদ্ধ হয় নি; বরং স্মৃতিমন্থন নূতন অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। লেওপার্দীর পাঁচটি শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়—'স্মৃতিগুলি', 'নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ', 'প্রভঞ্জনের পরে প্রশান্তি', 'গ্রামের শনিবারের সন্ধ্যা' ও 'ভ্রাম্যমাণ এশিয়াবাসী মেষপালকের নৈশ গীতি'। যে সব অবিস্মৃত দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা কবির প্রথম আত্মিক বিকাশে সহায়তা করেছিল, সেইগুলি প্রথম কবিতাটিতে ('Le ricordanze') সমাহৃত হয়েছে। কবিতাটির শেষাংশে যৌবন ফিরে পাওয়ার জন্য কবির আর্তি মর্মস্পর্শী। দ্বিতীয় কবিতাটিতে ('Passero solitario') দেখান হয়েছে, একটি থ াশ্‌-পাখি একটি পুরাতন মিনারে একলা গান গাইছে, আর অন্যান্য পাখিরা তখন মুক্ত সমীরণে আনন্দে উড্ডীন। তাঁর নিজের নিঃসঙ্গ অবস্থায় গান গেয়ে যাওয়ার কথা ভাবলে কবির এই পাখির কথা মনে পড়া স্বাভাবিক।

'প্রভঞ্জনের পরে প্রশান্তি' ও 'গ্রামের শনিবারের সন্ধ্যা' যুগ্ম-কবিতা। এই কবিতা দুটিতে প্রথমে সরল সুখের ছবি আঁকা হয়েছে, পরে এই সুখই হতাশার

উৎস হয়ে উঠেছে। 'প্রভঞ্জনের পরে প্রশান্তি' আরম্ভ হয়েছে এই পঙ্‌ক্তিটি দিয়ে—

'থেমে গেছে ঝড়',

তার পর এই দৃশ্যটি দেখা যায়—

……দেখো ওই নীল আকাশ
পশ্চিমে পাহাড়ের মাথায় নির্মেঘ বেরিয়ে আসছে!
প্রান্তরগুলি দেখা যাচ্ছে,
উজ্জ্বল উপত্যকায় নদী বহমান।
সকলের মনেই খুশী; প্রতি দিকে দিকে
নূতন করে কাজ আরম্ভ করার
আনন্দ-ধ্বনি জেগে উঠছে।
শ্রমিকের হাতে রয়েছে কাজ,
দরজায় এসে সে দাঁড়িয়েছে কণ্ঠে নিয়ে গান,
তাকিয়ে দেখছে বাষ্পভরা আকাশের দিকে,
আর তার কথা শুনে পাশের কিশোরী মেয়েটি
সদ্য-পড়া বৃষ্টির জলে
বালতি ভরে নেওয়ার জন্য আসছে।
সরব ফলওয়ালারা
এ গলি থেকে ও গলিতে
আবার তাদের পরিচিত ধ্বনিতে মুখর।
সূর্যের মুখ আবার দেখা যাচ্ছে,
বাড়ি ও পাহাড়গুলিতে রোদের হাসি ছড়িয়ে পড়ছে।
জানালা দরজা পুরো খুলে গেছে; আর দূরের রাস্তায়
যাত্রা শুরু করা পথিকদের
টিং টিং ঘণ্টার শব্দ ও চাকার ঘর্ঘর
তোমরা শুনতে পাচ্ছ।

সব প্রাণেই খুশীর আমেজ;
জীবন এখন যত কৃতজ্ঞতা ও মাধুর্যে ভরা
এমন আর কখনও কি দেখা যায়?

কিন্তু যেমন ঝড়ের বিভীষিকা সদ্য কেটে গেছে বলেই এই সুখের অনুভূতি, সব সুখই আসলে বেদনার সাময়িক উপশম ছাড়া কিছু নয়।

'গ্রামের শনিবারের সন্ধ্যা' কবিতায় দৃশ্যের দ্রুত পরিবর্তন সুচারুভাবে অঙ্কন করা হয়েছে। পরের দিন সাজবার জন্য ফুল নিয়ে আসছে একটি গ্রাম্য মেয়ে ; এক অথর্ব বুড়ী বাইরে বসে সুতা কাটছে, আর যখন তার নিজেরও যৌবন ছিল এবং আনন্দ ছিল তখনকার কথা বলছে ; আর সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি-আভা মিলিয়ে যাওয়ার পর :

আকাশ আবার সুনীলবরণ ;
চাঁদ উঠছে, আর তার শুভ্র আলোয়
পাহাড়গুলো আর বাড়িগুলো থেকে আবার ছায়া পড়ছে,
গীর্জার সান্ধ্য ঘণ্টা
সূচিত করছে আসন্ন ছুটীর দিন,
হৃদয় উৎফুল্ল সে ধ্বনিতে।

ছোট মাঠে ছেলেরা খুশী হয়ে খেলছে ; শ্রমিক শিস্ দিতে দিতে বাড়ি ফিরছে সান্ধ্য আহারের জন্য ; আর সব কিছু অন্ধকার ও নীরব হয়ে যাওয়ার পর সূত্রধর তার দোকানে বসে লণ্ঠনের আলোয় কাজ করে চলেছে ভোর হওয়ার আগেই হাতের কাজ শেষ করার জন্য। (এর পর কবিতাটির ধারা অন্য খাতে প্রবাহিত)—সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে পরের দিন আসবে শুধু চিরাচরিত ক্লান্তি নিয়ে, আর সাপ্তাহিক কাজ আবার শুরু হওয়ার ভাবনা নিয়ে। আর যৌবন হচ্ছে জীবনের শনিবারের সন্ধ্যা।

'ভ্রাম্যমাণ এশিয়াবাসী মেষপালকের নৈশ গীতি'তে করুণ রস আরও ঘনীভূত হয়েছে ও সেই রসের সঙ্গে অনন্তের উপলব্ধি মিশ্রিত হয়েছে। শুধু মেষের দল দ্বারা পরিবৃত নিঃসঙ্গ, ভ্রাম্যমাণ মেষপালক নীরব, পরিক্রমারত চন্দ্রমাকে প্রশ্ন করল—

'ওগো চাঁদ, তুমি আমায় বলো, তার নিজের কাছে মেষপালকের জীবনের কি সার্থকতা, আর তোমার কাছে তোমার জীবনের? আমায় বলো, আমার এই ক্ষণস্থায়ী পরিক্রমার গতি কোন্ দিকে, তোমার বিরামহীন আবর্তনেরই বা কোন্ দিকে?……তুমি নিশ্চয়ই অস্তিত্বের রহস্য বুঝতে পারো, নিশ্চয়ই সকাল ও সন্ধ্যার, এবং নীরব ও অন্তহীন

সময়ের গতির, পরিণতি দেখতে পাও……যখন আমি আকাশে জাজ্বল্যমান নক্ষত্রদের নিরীক্ষণ করি, তখন আমি আপন মনে বলি: এই সব মশালের প্রয়োজন কি? এই অন্তহীন বাতাস, এই গভীর ও অনন্ত প্রশান্তি, এর স্বরূপ কি? এই সীমাহীন নির্জনতার অর্থ কি?' মেলে নি উত্তর।

কয়েকজন বন্ধুর আনুকূল্যের ফলে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে লেওপার্দী ফ্লরেন্সে বাস করতে এসেছিলেন। এখানে নেপ্‌ল্‌সের অধিবাসী এক নির্বাসিত তরুণ আন্তোনিও রাইনেরির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। রাইনেরি চিররুগ্‌ণ লেওপার্দীর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন ও অনুজসুলভ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে, লেওপার্দীর সেবাযত্ন করেন। লেওপার্দীর জীবনের শেষ মর্মন্তুদ ঘটনা এখানেই ঘটে,—তিনি গভীরভাবে অনুরক্ত হন। তাঁর মনে হয়েছিল যে তাঁর অসুস্থতা ও বিকলাঙ্গতা সত্ত্বেও তাঁর প্রেম প্রত্যাখ্যাত হয় নি। পরে অবশ্য নিদারুণভাবে তাঁর আশাভঙ্গ হয়। মহিলাটি (Fanny Targioni Tozzetti) রাইনেরির দিকে বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এঁদের তিনজনের সম্পর্ক, যেটা ক্রমশঃ বেশ জটিল হয়ে উঠছিল, ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে (রাইনেরি ও লেওপার্দী নেপ্‌ল্‌স্ অভিমুখে যাত্রা করার পর) ছিন্ন হয়। 'সর্বগ্রাসী ভাবনা' ('Il pensiero dominante') শীর্ষক তীব্র ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত কবিতাটি লেওপার্দীর এই প্রণয়-অভিজ্ঞতার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বাণীরূপ। প্রেমের আগমনে তাঁর অন্যান্য স্বাভাবিক চিন্তাগুলি নির্বাসিত হয়েছে এবং তাঁর মনে শুধু প্রেমের চিন্তাই বর্তমান। শুধু প্রেমের জন্যই জীবনের মূল্য; শুধু প্রেমের মাধ্যমেই জীবন মৃত্যুর চেয়ে কমনীয়তর হয়ে ওঠে; প্রেমের যে পরিচয় তিনি এখন পেয়েছেন তা পাওয়ার জন্য যে জীবন তিনি ফেলে এসেছেন সে জীবনও নূতন করে বাঁচার জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন:

'বিশ্বসংসারের এ কোন্ অদ্ভুত রূপান্তর, এ কোন্ অভিনব বিশালতা, এ কোন্ স্বর্গলোকে তোমার আশ্চর্য মোহিনী মায়া আমাকে নিয়ে এসে তুলল!'

এই অবাক্ বিস্ময়ও যে খানিকটা অলীক তা তিনি জানেন; কিন্তু এই বিভ্রান্তি অন্তত দিব্য বিভ্রান্তি। এর কয়েক মাস পরে কবি 'প্রেম ও মৃত্যু' রচনা করেন; এই কবিতাতে আবেগের তীব্রতা যেমন কমে এসেছে তেমনই বিষণ্ণ ধ্যানতন্ময়তা বেড়েছে। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রেম ও মৃত্যুর চেয়ে সুন্দরতর

কিছু নেই। (কীট্‌সের কথা স্বতই মনে পড়ে, যিনি ফ্যানি ব্রন্‌ ও মরণকে একই মাল্য-বাঁধনে বাঁধতে চেয়েছিলেন।) লেওপার্দীর আশাভঙ্গের সব বেদনা ও তিক্ততা ধ্বনিতে হয়েছে সংক্ষিপ্ত অথচ মর্মভেদী, করুণ অথচ ভয়ংকর 'A se´ stesso' ("নিজেকে") কবিতায়, যার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে বিরল—

'এখন তোমার চির বিশ্রাম,
ও আমার ক্লান্ত হৃদয়। শেষ প্রবঞ্চনা
আজ অবসিত, চিরন্তন যা মনে হয়েছিল।
অবসিত। এটা বেশ বুঝতে পারছি,
সেই সব প্রিয় মোহের আশাই শুধু
আমাদের মধ্যে নির্বাপিত হয় নি,
তাদের জন্য কামনাও নির্বাপিত।
চিরতরে বিশ্রাম। অনেক করেছ পরিশ্রম।
চাঞ্চল্যের তব প্রতিদান নেই কোন,
দীর্ঘশ্বাসের যোগ্য নয় এই পৃথিবীটা।
জীবনের অর্থ বেদনা ও ক্লান্তি,
আর কিছু নয়; আর সংসার মানে পঙ্ক।
শান্ত হও এইবার। শেষবারের মতো আশাহীন।
মানুষের জন্য অদৃষ্ট শুধু বিধান দিয়েছে মৃত্যুর।
প্রকৃতিকে করো ঘৃণা,
যে পশুশক্তির শাসনে নিখিল বিশ্ব বেদনার্ত,
আর সব কিছুর সীমাহীন তুচ্ছতা।'

এই অনুবাদের একাদশ ও দ্বাদশ পঙ্‌ক্তিগুলি, যাদের মূল রূপ হল

......Amaro e noia
la vita, altro mai nulla ; e fango e il mondo,—

লেওপার্দীর কাব্যের একটি মূল সুর। জীবনের সমস্ত তিক্ততা 'amaro' শব্দটির মধ্যে ও জীবনের সমস্ত রিক্ততা 'noia' শব্দটিতে ধ্বনিত হয়েছে। এই ধরনের শব্দসম্ভার, বিশেষত দ্বিতীয় শব্দটি, লেওপার্দীর কাব্যে বারংবার এসেছে। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, তাঁর সমগ্র কাব্যকে একটি শব্দে

সংহত করলে তা হবে 'noia'—ক্লান্তি, নির্বেদ, tedium, Weltschmerz, যার অন্যতম উৎস 'শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি'।

ফ্লরেন্সে বাস করার সময় লেওপার্দী আরও দুটি 'নৈতিক নিবন্ধ' রচনা করেন, 'পঞ্জিকা-ফেরিওয়ালা ও পথিকের কথোপকথন' এবং 'ট্রিস্টান্ ও এক বন্ধুর কথোপকথন'। প্রথমটিতে ফেরিওয়ালাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে সে চায় না অতীতে যে সব বছর সে পঞ্জিকা বিক্রী করেছে নূতন বছর সেই রকমের হয়; যে জীবন সে কাটিয়ে এসেছে সেই জীবন সে আর একবার বাঁচতে চায় না; যদি আর কোনো জীবন তাকে বাঁচতে হয় তা হলে সেই জীবন সম্পর্কে পূর্বাহ্ণে সে কিছু জানতে চাইবে না।

১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে নির্বাসন-কাল অতীত হওয়ায় রাইনেরি নেপ্ল্সে ফিরে আসেন ও লেওপার্দীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। লেওপার্দী তাঁর মোহভঙ্গের মর্মবেদনা এখনও ভুলতে পারেন নি। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে 'আস্পাসিয়া' কবিতাটি লিখে তিনি তাঁর প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করেন। এই কবিতায় অভিযোগ ও স্বস্তি একসূত্রে গ্রথিত। এই সময় বরাবর লেওপার্দী তাঁর একশতর মতো 'Pensieri' ("বিচিন্তন") গ্রন্থাকারে সংকলিত করেন, এর কোনোটা কয়েক পঙ্‌ক্তি মাত্র কোনোটা বা দীর্ঘ প্রবন্ধ। মানুষের দোষ-ত্রুটি-নির্বুদ্ধিতা এর অনেকগুলির বিষয়-বস্তু: অন্যগুলিতে যৌবন, পিতৃশক্তি, মৈত্রী, সম্পূর্ণতার আদর্শ, সদাচার, ক্লান্তি, বার্ধক্য ও মৃত্যু প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। এগুলিকে 'নৈতিক নিবন্ধাবলী'র পরিশিষ্ট রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

নেপ্ল্সে লেখা রচনাগুলিতে দেখা যায় লেওপার্দীর কবিত্ব-শক্তি পতনোন্মুখ; কিন্তু এই শক্তিতে আর একবার জোয়ার এলো, শেষবারের মতো। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এক বন্ধু লেওপার্দী ও রাইনেরিকে তাঁর গ্রামের দুর্গভবনে নিমন্ত্রণ করেন; এটি ছিল ভিস্থভিয়াসের পাদদেশে অবস্থিত। নূতন পরিবেশ লেওপার্দীর পক্ষে বিশেষ অনুকূল হওয়ায় তিনি প্রায় এক বছর এখানে ছিলেন। এই দুর্গভবন থেকে সমুদ্রের দিকে দেখলে তিনি নেপ্ল্স্ উপসাগরের অপরূপ শোভা উপভোগ করতে পারতেন। পম্পে-ও বেশি দূরে ছিল না; আর সব ছাপিয়ে দাঁড়িয়েছিল আগ্নেয়গিরি। এই পরিবেশেই লেওপার্দী তাঁর শেষ দুটি কবিতা লেখেন, 'La ginestra

or il Fiore del deserto' ("ক্রম্-গুল্ম বা মরুভূমির ফুল") এবং 'Il tramonto della luna' ("চন্দ্রাস্ত")।

মানবের প্রতি প্রকৃতির দৃষ্টিভঙ্গী লেওপার্দী ভিসুভিয়াসের মধ্যে পূর্ণভাবে ও প্রচণ্ডভাবে রূপায়িত দেখেছেন। দিনের বেলা ধূম্রস্তম্ভের মধ্যে ও রাত্রিকালীন রক্তিম আভায় ভিসুভিয়াস সর্বনাশা ধ্বংসের আতঙ্ক লেলিহান করে তুলেছে; লাভাস্রোত ও পম্পের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অচিন্ত্যনীয় নিষ্ঠুরতার সাক্ষ্য রয়েছে। তবু এই ভিসুভিয়াসেরই পাদদেশে জড়িয়ে রয়েছে জীবন ও সৌন্দর্য। যে ক্রমের ঝাড় এই রুক্ষ গ্রামাঞ্চলে সুরভি সঞ্চারিত করেছে সে ঝাড়ও কিন্তু ভূগর্ভস্থ অগ্নি থেকে বেশি দিন পরিত্রাণ পাবে না। নিষ্পাপ ক্রম্ বিনা প্রতিরোধে মৃত্যুভারে নিষ্পেষিত হবে। অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য তার কাপুরুষের মতো কোন প্রার্থনা নেই। অসার আত্মশ্লাঘায় ফুলে-ফেঁপে সে আকাশচুম্বীও হয়ে ওঠে নি। মরুভূমিতে তার জন্ম তার নিজের পছন্দানুসারে হয় নি, সেটা একেবারে আকস্মিক। আর মানুষের মতো অমরত্বের ভ্রান্ত ধারণা তার কোন কালে ছিল না, তাই মানুষের তুলনায় তার জ্ঞান ও শক্তির পরিধি ছিল বিস্তৃততর।

মানুষ স্নেহময়ী প্রকৃতির আদরের দুলাল, এই ধারণা কত ভ্রান্ত এই কবিতায় লেওপার্দী তাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। পম্পে-নগরীর রূপময় অতীতের বর্ণাঢ্য শোভা ও বর্তমানের নির্জন, পতিত অবস্থার বৈষম্য যদি চিন্তা করা যায় তা হলে কবির অভিমতের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাবে। স্বল্পতম প্রচেষ্টায় প্রকৃতি একটি জনবহুল অঞ্চলকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে; এর চেয়ে সামান্য একটু বেশী প্রযত্নে প্রকৃতি সমগ্র মানবসমাজকে ধরাতল থেকে লুপ্ত করে দিতে পারে। করাল সমুদ্রের একটি ঢেউ, বিষাক্ত বায়ুর একটুকু স্পর্শ, বা পদতলে ভূমির মৃদুতম কম্পন যাদের এমনভাবে ধ্বংস করতে পারে যে তারা স্মৃতি থেকেও বিলীন হয়ে যায়, তাদের ভাগ্যে সুখ আছে একথা যে বলে সে নির্বোধ ছাড়া আর কি? তবে ভিসুভিয়াসের সান্নিধ্যে থেকে লেওপার্দী যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেটা এই; কর্মনিষ্ঠ বিশ্বভ্রাতৃত্বের বোধই মানুষের জীবনকে সার্থকতায় মণ্ডিত করতে পারে। তাঁর নিজের স্নেহসুকুমার স্বভাবের মধ্যেও এই সিদ্ধান্ত নিহিত রয়েছে। 'প্লটিনাস্ ও পরফিরির কথোপকথনে' এই সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম উদাত্ত সুরে ধ্বনিত হয়েছে। অন্য কোন মানুষের

বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থ চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা, কারণ সব মানুষকে একই শত্রুর—প্রকৃতির—সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এই সব সত্য উপলব্ধি করতে পারলে তবে সুদৃঢ় মানব সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হতে পারবে, যে সমাজে সাধুতা, সত্য, ন্যায় ও ভ্রাতৃত্ব-বোধ বিকাশ লাভ করবে। এক দিকে লাভাস্রোতের কালিমা রয়েছে, কিন্তু অন্য দিকের সুনীল আকাশে কবি উজ্জল নক্ষত্রপুঞ্জের দ্যুতি দীপ্যমান দেখছেন, যেগুলি দূরের জলেতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। লেওপার্দীকে যাঁরা শুধু 'noia'র কবিরূপে দেখেছেন তাঁরা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁর প্রাতিভাসিক দিকে লেওপার্দী জীবন-ক্লান্তিতে জর্জর, কিন্তু তাঁর পারমার্থিক দিকে তিনি প্রেম ও মৈত্রীর উচ্চ আদর্শে অনলস ও অটল। লাভার কালো যেন নক্ষত্রের আলো থেকে আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন না করে, লেওপার্দীর কবিতা পড়ার সময় সে বিষয়ে আমাদের সজাগ থাকা দরকার। তাঁর কাব্যে নঞর্থক সুর রয়েছে, কিন্তু প্রত্যয়ের সুর গভীরতর।

জল-স্থল যখন রজত-শুভ্র চন্দ্রালোকে প্লাবিত তখন চারিদিকে ছলনাময়ী ছায়ার মিছিল দেখা যায়; কিন্তু কেমনভাবে চন্দ্রাস্তর পর আলো ও ছায়া সব মিলিয়ে যায়, আর অন্ধকারে সব কিছু আবৃত হয়, 'চন্দ্রাস্ত' কবিতাটিতে লেওপার্দী তাই বর্ণনা করেছেন। এই ভাবেই যৌবন কেটে যায়, আর তার পর আসে বার্ধক্য ও মৃত্যু।

বার্ধক্য আসার অনেক আগেই আকস্মিক কিন্তু শান্তভাবে লেওপার্দীর জীবনে মৃত্যুর আগমন হয়, ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুন। San Vitale di Fuorigrottaর গীর্জায় তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয়। তাঁর মতো এত বেদনার্ত অথচ এত মহাপ্রাণ কবিসত্তার আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসে বেশি দেখা যায় নি।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিদের মধ্যে লেওপার্দীর স্থান অবিসংবাদিত। ভাব ও ভাষার যে অপূর্ব সমন্বয় তাঁর গীতিকাব্যে দেখা যায় পেত্রার্কার পরে তা অন্য কোনো কবির রচনায় দেখা যায় নি। তাঁর কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি—এই কবিতা রোমান্টিকও বটে, ক্ল্যাসিকালও বটে। এই স্বকীয়তা লেওপার্দীর কাব্যে এত স্পষ্ট যে আমরা যদি বলি, লেওপার্দীর কাব্য রোমান্টিকও নয় ক্ল্যাসিকালও নয়, তা হলে বোধ হয় বিশেষ ভুল হবে

না। তাঁর কবিতার শব্দসম্ভার প্রাঞ্জল ও সরল, সে শব্দের সাহায্যে কবির মনোভাব স্বচ্ছ ও সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রচলিত অলঙ্কার-বহুল ভাষা বর্জন করে তিনি নিজস্ব সাধারণ অথচ শ্রীময়ী ভাষার সৃষ্টি করেছিলেন। এ দিক থেকে লেওপার্দী ওয়ার্ডসোয়ার্থের সঙ্গে তুলনীয়। আবার ওয়ার্ডসোয়ার্থের ধারণা ছিল, প্রকৃতি মানুষের শান্তির উৎস ; লেওপার্দী প্রকৃতিকে মানুষের অশান্তির কারণ গণ্য করতেন। কিন্তু মানুষের মহিমায় বিশ্বাস ওয়ার্ডসোয়ার্থের চেয়ে লেওপার্দীর কোন অংশে কম ছিল না। প্রকৃতিকে লেওপার্দী মানুষের শত্রু মনে করে থাকতে পারেন, কিন্তু নিজে ছিলেন মানুষের পরম মিত্র। ওয়ার্ডসোয়ার্থের মতো তিনিও 'man's unconquerable mind' এর জয়গান গেয়েছেন এবং জাগতিক দুঃখের কথা তাঁর কবিতায় বার বার এলেও প্রাচীন মহাভারতকারের মতো লেওপার্দীও দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

সুখং বা যদি বা দুঃখং
প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত
হৃদয়েনাপরাজিতঃ ॥

## শার্ল পিয়ের বোদ্‌লেয়ার

১৮২১-১৮৬৭

J'ai cultive mon hysterie avec jouissance et terreur.
আমি আমার হিস্টিরিয়াকে আনন্দ ও আতঙ্কের সঙ্গে লালন করেছি।

পারী-শহরে, ১৮২১ খ্রীস্টাব্দের ৯ই এপ্রিল, শার্ল পিয়ের বোদ্‌লেয়ারের জন্ম হয়। তাঁর পিতার বয়স তখন বাষট্টি ও মাতার আটাশ; শার্ল ছিলেন এঁদের দুজনের নয়নের মণি। শৈশবেই তাঁর মনে চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে কৌতূহল জাগিয়ে তোলার জন্য বোদ্‌লেয়ারের পিতা সচেষ্ট ছিলেন। (বোদ্‌লেয়ার নিজে বলেছেন ছবি তাঁকে কিভাবে মুগ্ধ করত, অভিভূত করত: 'les images, mon unique, ma primitive passion'।) তাঁর মাতার কাছে বোদ্‌লেয়ার ক্যাথলিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ শিক্ষায় দীক্ষিত হন; এর প্রভাব তাঁর জীবন ও কবিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বোদ্‌লেয়ারের সাত বছর বয়স হওয়ার আগেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয় ও তাঁর মাতা পরের বছরই (১৮২৮) পুনর্বার বিবাহ করেন। তাঁর মাতার দ্বিতীয় বিবাহের জন্য বোদ্‌লেয়ার কোনোদিন তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন নি। তাঁর সেনানায়ক বিপিতাকেও তিনি কখনো সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি ও ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বিপিতার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে বোদ্‌লেয়ারের সমানে মনান্তর চলেছে। কবির চরিত্রে যে 'ত্রুটি'র কথা বলা হয় এই মনান্তরের মধ্যে তার উৎস পাওয়া যেতে পারে।

মাতা ও বিপিতার পক্ষে বোদ্‌লেয়ারকে তাঁদের শাসনে রাখা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছিল। কিছুদিন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ও গৃহশিক্ষকের নিকট বোদ্‌লেয়ার শিক্ষা লাভ করার পর যখন তিনি লেখক হওয়ার সংকল্প প্রকাশ করলেন, তখন তাঁরা তাঁকে জলপথে প্রাচ্যদেশ পরিভ্রমণ করার জন্য পাঠান (বোদ্‌লেয়ারের নিজস্ব টাকা থেকে এই ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছিল)।

দশ মাস পরে তিনি যখন ফিরে এলেন, তখনও তিনি তাঁর সংকল্পে অবিচল। অল্প সময়ের জন্য হলেও, এই নূতন অভিজ্ঞতায় গভীরতার অভাব ছিল না এবং সেই কারণেই তাঁর জীবনে ও কাব্যে এই প্রবাসের স্থায়ী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এমন কি শ্রীমতী জান্ দ্যুভালের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণের মূলেও তাঁর প্রাচ্যের জন্য ব্যাকুলতা কিছুটা রয়েছে—যে জান্ তাঁর মনে বিলাসিনী এশিয়া ও জ্বালাময়ী আফ্রিকার ( 'la langoureuse Asie et la brulante Afrique' ) স্মৃতি জাগিয়ে তুলতেন। তাঁর কবিতার বর্ণ-বিন্যাস, প্রাচ্য রূপকল্প, সমুদ্র ও জাহাজের বারংবার ব্যবহার প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

পারীতে ফিরে আসার পর বোদ্‌লেয়ার তাঁর সমস্ত নিজস্ব সম্পত্তি দাবী করেন ও স্বাধীনভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁর সামান্য সম্পত্তির অর্ধেকই বোদ্‌লেয়ার দু বছরের মধ্যে নিঃশেষ করে দেন। পরিবারের সকলে মিলে আইনগত ব্যবস্থা করেন, বাকি টাকা বোদ্‌লেয়ারকে স্বল্প পরিমাণে ও নিয়মিত কিস্তিতে দেওয়া হবে। এই সময় ( ১৮৪৪ খ্রীঃ ) থেকেই বোদ্‌লেয়ারের দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম শুরু হয় ও যত দিন বেঁচেছিলেন তত দিন তিনি এই সংঘর্ষে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। তবু সাহিত্য ছাড়া অন্য কোনো পেশার কথা তিনি চিন্তা করতেও অস্বীকার করেন। এ দিকে ঋণের বোঝা ক্রমাগত বেড়ে চলে। কাব্যগ্রন্থ **Les Fleurs du Mal** ( ১৮৫৭ খ্রীঃ )-এর ছটি কবিতাকে অশ্লীল বলে ঘোষণা করা হয় ও বোদ্‌লেয়ার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমাগত খারাপ হতে থাকে ও অবশেষে বোদ্‌লেয়ার পারী নগরী পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। বেল্‌জিয়ামের ব্রাসেল্‌জ্-শহরে বক্তারূপে তিনি জীবিকা নির্বাহ করার সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু এই ভূমিকায় তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। তাঁর স্বাস্থ্য আরো খারাপ হয় এবং ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি পক্ষাঘাত ও বাক্‌রোধী মস্তিষ্ক-রোগে প্রথম আক্রান্ত হন। তাঁর অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে ও ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁকে পারীতে ফিরিয়ে আনা হয়। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে আগস্ট ছেচল্লিশ বছর বয়সে বোদ্‌লেয়ার পরলোক গমন করেন।

জান্ দ্যুভাল্ ছাড়া অন্য যে সব মহিলার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে বোদ্‌লেয়ার্ এসেছিলেন ও যাঁরা শ্রীমতী দ্যুভালের মতো তাঁর কবি-প্রতিভার বিকাশে

সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অভিনেত্রী মারী দ্যোব্রুন্ ও শ্রীমতী সাবাতিয়ে অন্যতম।

বোদ্‌লেয়ারের অন্যান্য রচনার মধ্যে *Petits Poemes en Prose, L'Art Romantique, Curiosites Esthetiques* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে তাঁর কাব্যকেই শুধু বহুমূল্য মনে করা হয় না, তাঁর শিল্প-সাহিত্য-সমালোচনা ও মার্কিন কবি পো-র অনুবাদকে অত্যন্ত মূল্যবান গণ্য করা হয়।

'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' বোদ্‌লেয়ারের কবিতাকে এই ভাষায় বর্ণনা করা যেতে পারে। কিন্তু এই বর্ণনার সঙ্গে সুকুমার মাধুর্যের ভাবানুষঙ্গ রয়েছে। বোদ্‌লেয়ারের কবিতায় যে সৌকুমার্য ও মাধুর্য খুঁজে পাওয়া যায় তার প্রকৃতি এত স্বতন্ত্র যে সে কবিতাকে সাধারণ অর্থে সুকুমার বা মধুর বলা চলে না। তিনি নিজে তাঁর কবিতাকে ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন—পাপপঙ্ক থেকে যে ফুলের জন্ম। তাঁর রচনার কাব্যরসে যে মাধুর্য তার সঙ্গে অম্ল ও তিক্ত মিশিয়ে আছে। তাঁর কবিতায় কোমলতা কাঠিন্যের আবরণে জড়ানো। তাঁর স্বপ্ন অনেক সময় দুঃস্বপ্নের নামান্তর। তাঁর স্মৃতিচারণে অনেক সময় প্রলাপের উচ্চারণ শোনা যায়। তাঁর কাব্যসংসারে আলোকের প্রবেশাধিকার নেই—অন্তহীন তমিস্রা। মধ্যরাত্রির কবি শার্ল্ বোদ্‌লেয়ার। ভিক্টোরীয় যুগের ব্রিটিশ কবি জেম্‌স্ টম্‌সন্ তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম দিয়েছিলেন 'The City of Dreadful Night'। এই নাম বোদ্‌লেয়ারের কাব্য সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। পারী-শহর তাঁর কবিতায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর জীবন-মদিরাও তিক্তপিত্ত-মিশ্রিত গরল; তাঁর মধ্যাহ্নেও অশুভ স্বপ্নের ঘোর। কয়েকটা বছর তাঁর সর্বস্ব, সেও তাঁর হারানোর চেয়ে বেশি গেছে। এত বড়ো ক্ষতির কি সান্ত্বনা তাঁর আছে?

জীবনের হলাহল আকণ্ঠ পান করে নীলকণ্ঠ কীট্‌স তাঁর কবিতায় অমৃতের আস্বাদন দিয়ে গেছেন। বিষজর্জরিত বোদ্‌লেয়ারের কবিতায় কিন্তু আমরা কোনো সুধার সন্ধান পাই না। অনীহা ও নির্বেদ, বিমর্ষতা ও বিতৃষ্ণার এখানে আতিশয্য। বিরক্তি ও রোষের অভাব নেই। গভীর হতাশা মুখর

হয়ে উঠেছে। বেদনার দীর্ঘশ্বাসে আকাশ আলোড়িত। তাঁর 'Spleen' নামের একটি কবিতায় বোদ্‌লেয়ার লিখেছেন—

J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans.

হাজার বছরের আমি হলেও এত স্মৃতি হত না আমার।

তারপর তিনি তাঁর স্মৃতির স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন—

'আমার বিষণ্ণ মস্তিষ্কে যত গোপন জিনিস লুকোবার আছে তত সেই দেরাজেও নেই যে প্রকাণ্ড দেরাজে ঠাসা আছে হিসাবপত্র, কবিতা, প্রেমপত্র, নথি, গাথা, আর রশিদে জড়ানো ঘন কেশপাশ। এ এক পিরামিড, প্রকাণ্ড গহ্বর, এতে যত মৃতদেহ আছে গোরস্থানেও তত নেই।

চাঁদ যাকে ঘৃণা করে আমি সেইরকম এক কবরখানা। দীর্ঘকায় ক্রিমিরা মনস্তাপের মতো বুকে হেঁটে চলে, যারা মৃত—আমার প্রিয়তম—সব সময় তাদের খুঁটে খুঁটে খায়। শুষ্ক গোলাপে ভরা প্রাচীন এক অন্তঃপুর আমি, যেখানে সেকেলে পোশাকের রাশ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, যেখানে শুধু করুণ প্যাস্‌টাল্ ছবি আর পাণ্ডুর বুশের চিত্র ছিপিখোলা আতর-শিশির গন্ধ আঘ্রাণ করে।'

যাঁরা মনে করেন কবিতাতে শুধু চাঁদের আলো আর পাখির গান থাকবে, উচ্চ আদর্শ ও আপ্ত বাক্যের ছড়াছড়ি হবে, কবিতা নীতির সহায়ক হবে, সমাজের সংস্কার করবে, তাঁরা বোদ্‌লেয়ারের কবিতাকে সুনজরে দেখবেন না। কিন্তু কবিতা শুধু স্বর্গসৃষ্টিতে ব্যস্ত থাকবে, নরক নিরীক্ষণ করবে না, এ হতে পারে না। পৃথিবীর মানুষের কাছে ভালো ও মন্দ সমান বাস্তব। কোনো কবি যদি মন্দের মাদকতায় মুগ্ধ হন ও তাঁর কবিতায় অ-শিবের প্রাধান্য থাকে, সেই কারণেই তিনি অকবি, বা মহৎ কবি নন, এটা বলা কিছুতেই সমীচীন হবে না। বোদ্‌লেয়ার অনেক সময় মন্দকে বড়ো করে দেখেছেন, অ-শিবকে অসুন্দরকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর কবিতায় শব, কবর, ক্রিমি, অন্ধকার, গহ্বর, বিষাদ, বিতৃষ্ণা, হতাশা, জুগুপ্সা বার বার এসেছে। কৃত্রিমতার মধ্যে তিনি শিল্পসুষমা খুঁজে পেয়েছেন, যান্ত্রিক আবর্তনের মধ্যে ছন্দের স্পন্দন শুনেছেন। দেহবোধ তাঁর তীব্র, কিন্তু দেহের ক্ষুধার নিবৃত্তিতে তাঁর শান্তি নেই। আসলে বোদ্‌লেয়ারের মধ্যে দ্বৈত সত্তার উপস্থিতি স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। দ্বৈত সত্তা আমাদের প্রত্যেকের রয়েছে এবং প্রত্যেকের মধ্যেই

অল্পবিস্তর split personality-র পরিচয় আছে; কখনও জেকিলের প্রকাশ, কখনও হাইডের আবির্ভাব। ডিকেন্স্ বলেছেন—Men are so different at different times। বোদ্‌লেয়ার সংবেদনশীল কবি, তাঁর দ্বৈত সত্তা সাধারণের দ্বৈত সত্তার চেয়ে অনেক বেশি পরিস্ফুট। নিজের হৃদয়ের মাঝে ঈশ্বর ও শয়তানের তীব্র দ্বন্দ্ব তিনি উপলব্ধি করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন—'Il y a dans tout homme, a toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan' 'প্রতি মানুষের মধ্যে, প্রতি মুহূর্তে, দুই যুগপৎ দাবী বর্তমান রয়েছে, একটি ঈশ্বরের দিকে, আর একটি শয়তানের দিকে।' তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দিনলিপির এক স্থানে লিখেছেন—'Tout enfant, j'ai senti dans mon coeur deux sentiments contradictoires: l'horreur de la vie et l'extase de la vie.' 'যখন শিশু ছিলাম, আমার হৃদয়ে দুটি বিরোধী ভাব অনুভব করেছি: জীবনের প্রতি তীব্র আতঙ্ক ও জীবনের প্রতি তীব্র আনন্দ।' দেহগত কামনার উপভোগ তিনি প্রতিটি রক্তকণিকায় করতে চান; কিন্তু এই মরণশীল সংসারে মরণাতীত কোনো কিছু পাওয়ার জন্য তাঁর আর্তি তিনি গোপন করতে পারেন নি। তিনি যে 'পাপাত্মা, পাপসম্ভব', এটা মর্মে মর্মে বোদ্‌লেয়ার অনুভব করেছেন। পাপের বোধ তাঁর এক অদ্ভুত সুখানুভূতি ঘটিয়েছে—এক পাপ থেকে পাপান্তরে তিনি অবাধে বিচরণ করেছেন। কিন্তু এই অনুভব করেই তিনি ক্ষান্ত থাকতে পারেন নি।

বোদ্‌লেয়ারের কবিতায় দুঃখের স্থান উচ্চে। তাঁকে আমরা বেদনাবিলাসী কবি আখ্যা দিতে পারি। ব্রাউনিং তাঁর 'How It Strikes a Contemporary' কবিতায় যে কবির কথা বলেছেন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি সে কবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং সেইজন্য সেই কবিকে লোক গুপ্তচর বলে সন্দেহ করে। শহরে যেখানে যা কিছু ঘটে তার জন্য তাই কবিকেই দায়ী করা হয়: একজনের বিচিত্র ভাগ্য, অপরজনের নিরুদ্দেশ, আর একজনের সঙ্গিনী, সব কিছুর মূলেই এই 'পথচারী' লোকটিকে আবিষ্কার করা হয়। বোদ্‌লেয়ার তাঁর 'বেনেদিক্‌শিওঁ' বা 'আশীর্বাদ' কবিতায় যে সমকালীন কবির চিত্র অঙ্কন করেছেন সে কবিকেও ব্রাউনিঙের কবির মতো সাধারণের

অবিচার সহ্য করতে হয়। জননী ও জায়ার সে ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র। কিন্তু তার দুঃখ থেকেই তার মহত্ত্ব এবং দৈবদত্ত সেই দুঃখের দান থেকে তাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। তাই ঈশ্বরের প্রতি তার উক্তি—'দেবতা আমার, আমাদের সব অপবিত্রতার দৈব আরোগ্যরূপে তুমি বেদনা দাও, শক্তিমানকে সাধক-লভ্য আনন্দের জন্য প্রস্তুত করার পক্ষে যে বেদনা শ্রেষ্ঠ ও অবিমিশ্রতম নির্যাস।... দুঃখই একমাত্র মহত্ত্ব যাতে মর্ত্যলোক বা নরক কখনো দন্তস্ফুট করতে পারবে না, আর আমার অলৌকিক মুকুট গড়ার জন্য সব যুগ ও সমস্ত নিখিলকে অংশ গ্রহণ করতে হবে।'

বেদনাবিলাসী কবির কবিতাকে আমরা বিপথগামী কবির স্বেচ্ছাচারিতার প্রকাশ বলে অভিহিত করতে পারব না, যদিও সে চেষ্টা আগে অনেকবার করা হয়েছে। তাঁর অনুভূতিতে ধর্ষকাম বা মর্ষকামের অনুসন্ধানও করা হয়েছে। কিন্তু বোদ্‌লেয়ারের সঙ্গে সাধারণ ভ্রষ্ট কবির পার্থক্য অনেক। বোদ্‌লেয়ার শুধু কামনার ক্রীতদাস রূপে কবিতা লেখেন নি, বা রুচিবিকৃতিতে ইন্ধন জোগাবার চেষ্টা করেন নি। তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে, নিজস্ব জীবনদর্শন রয়েছে, বিশেষ বক্তব্য রয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমার ইচ্ছা সব কিছু অন্তরের আলোকে আলোকিত করি।' সর্বোপরি তিনি শিল্পী, শিল্পীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন। 'L'Art pour l'Art' বা কলাকৈবল্যবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

কিছুদিন আগে ফ্যাশন হয়েছিল, বোদ্‌লেয়ারকে 'decadent' (ক্ষয়িষ্ণু) আখ্যা দেওয়া। এই decadenc শব্দটি অনেক সময় সাহিত্যসমীক্ষায় নির্বিচারে যত্র তত্র ব্যবহার করা হয়। এই প্রসঙ্গে 'rhetoric' শব্দটি ও টি. এস্. এলিয়টের 'Rhetoric and Poetic Drama' প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে এলিয়ট rhetoric-শব্দটি সম্পর্কে লিখেছিলেন—'The word simply cannot be used as synonymous with bad writing।' এই একই কথা decadent সম্পর্কে খাটে। যেটাই আমাদের পছন্দ হবে না বা মনোমতো হবে না, যেটাই নীতিবিরোধী মনে হবে, তাকেই 'ক্ষয়িষ্ণু' বানিয়ে দেওয়া আর যারই হোক সমালোচকের অন্তত কর্তব্য নয়। কোন্‌টা দুর্নীতি আর কোন্‌টা সুনীতি তা স্থির করা খুব কঠিন, নির্ণয় করা যদি আদৌ যায়। আর সামাজিক অনুশাসন ও সাহিত্যের অনুশাসন

ভিন্ন ; সাহিত্যের মূল্যায়ন ও সমাজের কল্যাণ-বিচারের জন্য ভিন্ন মানদণ্ডের প্রয়োজন রয়েছে।

বোদ্‌লেয়ারের জন্ম যুগসন্ধিক্ষণে, কিন্তু সে সন্ধিক্ষণ মূলত সমাজজীবনের, সাহিত্যক্ষেত্রে কোনো সংকট তখন দেখা যায় নি। অভিজাততন্ত্রের অবসান ঘটেছে, গণতন্ত্রে তখনও জোয়ার লাগে নি। সামাজিক জীবন তখন শ্রীহীন, বিশৃঙ্খল। সমাজের কুশ্রী দিকটা অনেকের মতো বোদ্‌লেয়ারের কাছেও অসহনীয় মনে হয়েছিল। তিনি ক্ষয়িষ্ণু নগরসভ্যতার 'ফাঁপা মানুষের' অন্তঃসারশূন্য জীবনকে তাঁর কবিতার উপজীব্য করেছেন। বোদ্‌লেয়ারকে যদি 'ক্ষয়িষ্ণু' বলতেই হয়, তবে এই সীমাবদ্ধ অর্থেই তাঁকে আমরা ক্ষয়িষ্ণু বলতে পারি, তিনি দুর্নীতির পোষক ছিলেন বা তাঁর শিল্পকলা অবদ্য এই অজুহাতে নয়।

শিল্পের মধ্যে বোদ্‌লেয়ার মুক্তি খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তিনি সচেতন কবি ; তিনি বিশ্বাস করেন কবিতা সৃষ্টি করার জন্য কবিকে অনুপ্রেরণার উপর নির্ভর করলে চলবে না। পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্তহীন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আঙ্গিকের সুষ্ঠু ব্যবহার করা সম্ভব হবে। তেঅফিল্ গোতিয়ে বোদ্‌লেয়ারের শিল্পকলা প্রসঙ্গে লিখেছেন—'যে সব শব্দে অনেক syllable আছে এবং যেগুলি বেশ গালভরা শব্দ সেগুলি বোদ্‌লেয়ারের প্রিয়। এই ধরনের তিন-চারটি শব্দ নিয়ে তিনি অনেক সময় এমন কবিতার পঙ্‌ক্তি রচনা করেন যেগুলি বিশাল মনে হয় এবং যেগুলিতে এই অনুনাদশীল ধ্বনিগুলি ছন্দকে আরও দীর্ঘায়িত করে।' 'লে ফ্ল্যর দ্যু মাল্' কাব্যগ্রন্থ প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে বোদ্‌লেয়ার কবিতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন—'সুষমা ও পুনরাবৃত্তির জন্য মানুষের শাশ্বত চাহিদা মেটায় ছন্দ ও মিল, অন্যদিকে অনুপ্রেরণায় আছে অহমিকা ও আশঙ্কা।' কবিতা তার ছন্দের মধ্য দিয়ে সংগীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যেটা মানব-প্রকৃতির গভীরতম ও আদিমতম প্রদেশ থেকে আসছে—বোদ্‌লেয়ারের এই কাব্যতত্ত্ব ফরাসী কবিতার ইতিহাসে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

বোদ্‌লেয়ার একধারে ক্ল্যাসিকাল ও রোমান্টিক। এলিয়ট তাঁকে বর্ণনা করেছেন 'inevitably the offspring of romanticism and by his nature the first counter-romantic in poetry'। রোমান্টিকতার

উজ্জ্বলতম বিকাশ উনবিংশ শতাব্দীতে। রোমান্টিক কবি আত্মসচেতন কবি। আধুনিক জগতে শিল্পের স্থান ও শিল্পীর বিপন্ন অস্তিত্ব নিয়ে ওয়ার্ডসোয়ার্থ, শেলী, বোদ্‌লেয়ার প্রমুখ লেখকেরা আলোচনা করেছেন। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির সঙ্গে কবিপ্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী বিরোধ নিয়ে তাঁরা উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন। এই সমস্যা সমাজবিদ্যার গ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বিংশ শতাব্দীর লেখকরা তাঁদের পূর্ববর্তী লেখকদের অনুগামীরূপে এই সমস্যাকে সাহিত্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। শিল্পীর অধিকার ও স্বাধীনতা শিল্পের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। মালার্মে, জেম্‌স্ জয়েস্ বা টি. এস্. এলিয়ট এ দিক থেকে বোদ্‌লেয়ারের অনুবর্তন করেছেন। যে-সব দিক থেকে বোদ্‌লেয়ারের রচনায় আধুনিকতা আবিষ্কার করা হয় আত্মসচেতনতা তার অন্যতম। বহুভাবে তিনি দেশের ও বিদেশের আধুনিক সাহিত্যের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন। এ দিক থেকে তাঁকে 'poet's poet' বলা যেতে পারে।

বোদ্‌লেয়ারের যুগ আমরা অনেকদিন পার হয়ে এসেছি। শতাব্দীর ব্যবধানে তাঁকে যখন আমরা বিচার করছি তখন তাঁর মধ্যে অনেক কিছু খুঁজে পাচ্ছি যাকে আমরা 'ক্ল্যাসিকাল' বলতে পারি। তাঁর কবিতায় যে যে বৈশিষ্ট্য আধুনিক পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রসাদগুণ ও বিশ্লেষণ-শক্তি। তাঁর 'বেনেদিক্‌শিঅঁ' কবিতায় তিনি কবির 'esprit lucide' ( স্বচ্ছ মন )-এর কথা উল্লেখ করেছেন। কবির মনের স্বচ্ছতা আছে বলেই তাঁর চিন্তাতেও স্বচ্ছতা রয়েছে। এই স্বচ্ছতা রোমান্টিক কবিতায় বিরল। ঐ একই কবিতায় কবিকে 'serein' ( শান্ত ) বলা হয়েছে। বোদ্‌লেয়ারের ধারণা, কবি যদি 'serein' না হতে পারেন, কবির পক্ষে কাব্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। ( ওয়ার্ডসোয়ার্থ-এর 'emotion recollected in tranquillity'-র নীতি এ প্রসঙ্গে তুলনীয়। ) যে 'শতবরনের ভাব-উচ্ছ্বাস' কবির হৃদয়ে আন্দোলিত হয় তার প্রশমীকরণ ও সমাহিতির প্রয়োজন রয়েছে। যে কবি মনেপ্রাণে রোমান্টিক তিনি অবশ্য এ-সব কথা বলবেন না কারণ তিনি অচঞ্চল থাকায় বিশ্বাস করেন না। তাঁর হৃদয় সর্বদাই ঝঞ্ঝাসংকুল তরঙ্গবন্ধুর। সেই আলোড়নেই তাঁর আনন্দ।

বোদ্‌লেয়ারকে মোটামুটিভাবে পার্নাসিয়-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে

পারে। লেকঁৎ দ্য লীল্‌কে সাধারণত এই গোষ্ঠীর নায়কের মর্যাদা দেওয়া হয়। 'মাদাম বোভারি'র লেখক ফ্লোবেয়ার উপন্যাসে বাস্তবতার সূচনা করেন। কাব্যে এই বাস্তবতা আনার প্রয়াস করেন পার্নাসিয় কবিরা। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নিঁখুত শিল্পের সৃষ্টি। রূপারোপের স্থান তাঁদের কাছে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। নির্লিপ্ত ভাব দেখানোর একটা চেষ্টাও তাঁদের মধ্যে অনেক সময় দেখা যেত, কারণ তাঁরা রোমান্টিক আত্মকেন্দ্রিকতা পছন্দ করতেন না। লেকঁৎ দ্য লীল্‌ কাব্যের সঙ্গে ভাস্কর্য প্রভৃতি রূপ-শিল্পের নৈকট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু তিনজন বিশিষ্ট পার্নাসিয় কবি—বোদ্‌লেয়ার, ভের্লেন ও মালার্মে—বিশ্বাস করতেন যে শিল্পজগতে সংগীতের সঙ্গেই কাব্যের সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। প্রকৃতির মাঝে বা বিচিত্র অপরিচিত জিনিসের মাঝে রোমান্টিক কবিরা যে আনন্দ পান বোদ্‌লেয়ার সেই আনন্দ পেয়েছেন এক ধরনের বিশ্লেষণে। তাঁর এই বিশ্লেষণমুখিতাকেও ক্ল্যাসিকাল বলা যেতে পারে। মানবচেতনার বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণের প্রয়োজন মেটাতে পারে বলেই 'লে ফ্ল্যর দ্য মাল্‌' আধুনিক কাব্যের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

কাব্যের গঠনগত শৃঙ্খলা, সৌষ্ঠব ও সুষমার উপর বোদ্‌লেয়ার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। এ দিক থেকেও আমরা তাঁকে ক্ল্যাসিকধর্মী বলতে পারি। তাঁর ধারণা— ভাবাবেগ, অভিজ্ঞতা, চিন্তাধারা, এই সমস্ত যখন রূপের শাসনে বাঁধা পড়ে তখন কবিতার জন্ম হয়। বিপ্লবোন্মাদনা বা প্রলয়-বাসনাকে যখন বোদ্‌লেয়ার প্রকাশ করতে চেয়েছেন তখনও তিনি তাকে নিয়মের নিগড় থেকে মুক্ত করেন নি। এ দিক থেকে তিনি নাট্যকার রাসিন্‌-এর শৈলীর কথা আমাদের মনে করিয়ে দেন। সপ্তদশ শতাব্দীর সত্যানুসন্ধিৎসু মালেব্রাঁশ-এর মতো বোদ্‌লেয়ারও বিশ্বাস করতেন যে বিভিন্ন সৌন্দর্যের মধ্যে শৃঙ্খলার সৌন্দর্যের স্থান প্রথম শ্রেণীতে। শিল্পীর ইচ্ছাশক্তিতে বোদ্‌লেয়ারের গভীর আস্থা ছিল। তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করেন নি, কিন্তু কবিতা লেখার ক্ষেত্রে করেছেন। ১৮৪৬ অব্দে তিনি লিখেছিলেন : 'Il n'y a pas de hasard dans l'oeuvre d'art' ( শিল্পকর্মে আকস্মিক বলে কিছু নেই )। রোমান্টিক চিত্রশিল্পী দেলাক্রোয়াকে তিনি পছন্দ করতেন কারণ দেলাক্রোয়ার ছবিতে তীব্র অনুভূতি ও আবেগের সঙ্গে ইচ্ছাকৃত

মনঃসংযোগের সমন্বয় হয়েছে। প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ও স্ফূরণের জন্য শিল্পের নিয়ম ও নিগড়ের প্রয়োজন আছে বলে বোদ্‌লেয়ার বিশ্বাস করতেন। সৌন্দর্যের তিনি যে বিখ্যাত সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যেও ক্ল্যাসিকাল প্রভাব রয়েছে। তাঁর মতে 'C'est l'infini dans le fini'—সীমার মধ্যে অসীমই সৌন্দর্য।

অন্তরের গহনে যে সমস্ত সম্ভাবনাকে ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যে সাধারণত অবদমিত করা হয়েছে সেগুলি বোদ্‌লেয়ারের রচনায় বিদ্রোহীরূপে প্রকাশ পেয়েছে এবং এই অর্থে বোদ্‌লেয়ার রোমান্টিক। অসীমের জন্য আকুতির মধ্যে তাঁর রোমান্টিকতা নিহিত রয়েছে ও গীতিকাব্যের মধ্যে স্বাভাবিক রূপ খুঁজে পেয়েছে। আত্মকেন্দ্রিকতা তাঁর মধ্যে গভীর। মার্কিন কবি পো'র উক্তি 'আমার অনাবৃত হৃদয়' তিনি গ্রহণ করেছিলেন ও তাঁর রচনায় বারংবার চিত্তের আবরণ উন্মোচন করেছেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন কেমন করে তিনি 'একটি নৃশংস গ্রন্থে তাঁর সমস্ত হৃদয়, সমস্ত কোমলতা, সমস্ত ধর্ম, সমস্ত ঘৃণা' উজাড় করে দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র একবার দুঃখ করে বলেছিলেন, 'লোকে আমার উপন্যাসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ অথচ সেই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ যে জীবন আমার নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুভব করেছি আমার সেই অভিজ্ঞতার জন্য আমাকে লোকের উপহাসাস্পদ হতে হয়েছে।' তাঁর ব্যক্তিগত জীবন যদি অন্য প্রকারের হত তা হলে শরৎচন্দ্রের পক্ষে যে ধরনের উপন্যাস তিনি লিখেছেন সে ধরনের উপন্যাস লেখা সম্ভব হত না। প্রচলিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোদ্‌লেয়ারের ব্যক্তিগত জীবন দারিদ্র্য গ্লানি ও ব্যর্থতায় ভরা। জাঁ পল সার্ত্র এই জন্য তাঁর যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। কিন্তু আর এক দিক থেকে দেখলে তাঁর জীবন পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত। বোদ্‌লেয়ার নিজে পঙ্কের সংস্পর্শে না এলে তাঁর কবিতার পঙ্কজ ফুটত কী করে? নিজের অন্তরের গভীরের সব তিক্ততা, সব অন্তর্দ্বন্দ্ব তিনি তাঁর কবিতায় অনাবৃত করে দিয়েছেন। তাঁর চিত্তের সব আতঙ্ক, তাঁর হৃদয়ের সব আনন্দ, তাঁর কাব্যে শিল্পের সুষমা লাভ করেছে। অধিকাংশ রোমান্টিকদের ক্ষেত্রে যেমন, তাঁরও নিঃসঙ্গতার বোধ তীব্র। কখনো এই বোধ তাঁর অনুভূতিকে তীক্ষ্ণতা দিয়েছে, কখনো তাঁর অন্তরাত্মাকে অভিভূত করেছে। তাঁর ব্যক্তিগত দিনলিপির এক স্থানে তিনি লিখেছেন—

'নিঃসঙ্গতার অনুভূতি বাল্যকাল থেকেই। পরিবারের মধ্যে থেকেও—আর বিশেষ করে বন্ধুদের সান্নিধ্যে—চির-নিঃসঙ্গ অদৃষ্টের অনুভূতি।' বোদ্‌লেয়ার 'ভয়ের নিঃসঙ্গতা' আবিষ্কার করেছেন ; যা রুক্ষ ও শ্রীহীন, যা কুৎসিত, সেটাও যে উপভোগ্য হতে পারে ( অবশ্য উপভোগ করার মতো যদি মানসিক শক্তি থাকে তবেই ), তাও বোদ্‌লেয়ারের আবিষ্কার। এ-সব কিছুকেই রোমান্টিক বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। তিনি নিজেই বলেছেন—'ঠিক বিষয় নির্বাচনের মধ্যেই, কিংবা বিষয়গুলির যথার্থ সত্যে, যে রোমান্টিকতা রয়েছে তা নয় ; সেটা রয়েছে অনুভূতির স্বরূপের মধ্যে।'

'La Chambre Double' বা 'যুগ্ম কক্ষ' গদ্য-কবিতায় রোমান্টিক প্রকৃতির পলায়নী মনোবৃত্তি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। স্বপ্নলোকের চাবি খুঁজে পেয়ে বোদ্‌লেয়ার আর একটি ঘরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। ( অবশ্য অহিফেনের প্রভাব এখানে স্বীকার করতে হবে ; বোদ্‌লেয়ার নেশার দাসত্ব থেকে কখনো পরিত্রাণ পান নি। কখনো সুরা, কখনো অহিফেন, তাঁকে অভিভূত করেছে। ) 'সে ঘর একটি স্বপ্নের মতো, যথার্থই আধ্যাত্মিক, যেখানকার বদ্ধ আবহাওয়ায় গোলাপী ও নীল রঙের আমেজ আছে।… এইভাবে রহস্য, নীরবতা, শান্তি ও সৌরভে ডুবে থাকার জন্য কোন্ শুভার্থী রক্ষঃ-পুরুষের কাছে আমি ঋণী ? স্বর্গসুখ! স্বর্গসুখ! যাকে আমরা সাধারণত জীবন বলি, তার শোভনতম বিকাশেও, এই শ্রেষ্ঠ জীবনের সঙ্গে কোনো মিল নেই যেটার এখন আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে ও যেটা আমি প্রতি মিনিটে, প্রতি মুহূর্তে, অনুভব করছি। না! মিনিটের অস্তিত্ব আর নেই, মুহূর্তের অস্তিত্ব আর নেই! কাল অন্তর্হিত ; শাশ্বত সময়ের আধিপত্য, অনন্ত আনন্দ!' কিন্তু কোল্‌রিজের জ্যানাডুর কল্পপ্রাসাদ চূর্ণ করার জন্য যেমন আগন্তুক অতিথির অভাব হয় নি, 'পরিত্যক্ত' শব্দটি যেমন কীট্‌সের সাধের বিহঙ্গবিলাস শতচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, বোদ্‌লেয়ারের সুখস্বপ্ন ভেঙে দেওয়ার জন্য দ্বারে সশব্দ আঘাত এল, তিনি নিজেও অনুভব করলেন যেন জঠরদেশে কুঠারাহত হয়েছেন। 'আর তার পর এক প্রেতমূর্তির প্রবেশ। আইনের নাম করে আমাকে জ্বালাতে এসেছে এক সাধ্যপাল, কিংবা কোনো কুখ্যাত বারাঙ্গনা দারিদ্র্যের চীৎকার নিয়ে এসেছে আর আমার দুঃখের বোঝার উপর তার জীবনের তুচ্ছ খুঁটিনাটিগুলি চাপাতে এসেছে, কিংবা

কোনো সংবাদপত্র-সম্পাদকের দালাল চাকর পাণ্ডুলিপির পরের কিস্তির দাবী নিয়ে! · প্রেতের পাশবিক করাঘাতে সমস্ত [ স্বর্গরাজ্যের ] যাদু অদৃশ্য হয়ে গেছে।...হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাল আবার ফিরে এসেছে : সম্রাটের মতো সে রাজত্ব করছে, আর সেই বীভৎস বৃদ্ধের সঙ্গে ফিরে এসেছে স্মৃতি, মনস্তাপ, ভয়, বেদনা, দুঃস্বপ্ন, ক্রোধ ও মানসিক ব্যাধির রাক্ষসের দল। আমি হলফ করে বলছি, মুহূর্তগুলি এখন দৃঢ় ও গম্ভীরভাবে উচ্চারিত হচ্ছে, এবং প্রতিটি মুহূর্ত ঘড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ার আগে বলছে : "আমি জীবন, অসহনীয়, অপ্রশমনীয়!"...'

রোমান্টিক অনেক কবিকে শয়তানপন্থী বলা হত। বোদ্‌লেয়ার যে ভাবে অশুভের ও অমঙ্গলের জয়গান গেয়েছেন, পাপের পূজা করেছেন, নরকের আশ্রয় চেয়েছেন, তাতে বোদ্‌লেয়ারকে এই আখ্যা দেওয়া খুব বিসদৃশ নাও মনে হতে পারে। তাঁর 'Horreur Sympathique' ('সহানুভূতিশীল ভীতি') কবিতায় অসুখী দুশ্চরিত্রের বেদনা তার অহমিকার মধ্যে লাঘব খুঁজে পাচ্ছে। নারকীয়তা তার গৌরবেরই উপকরণ আর এটাই তার উপজীব্য। নরকের আঁধারই তার কাছে ভালো। যা কিছু অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত, তার জন্য ক্ষুধা তার অপরিসীম। সে স্পষ্ট বলছে, 'l'enfer ou´ mon coeur se plait'... 'নরকে আমার হৃদয় আনন্দের অনুভূতি পায়।' স্বর্গ্যচুতি তার কাছে শাপে বর, কারণ সে তার বাঞ্ছিত নরকের পথে এগুতে পারবে। এখানে 'Le Rebelle' বা 'বিদ্রোহী' কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। অপরাধীকে অনেক অনুশাসন দেওয়া হল, তাকে প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ জানান হল, যীশুর পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হল। কিন্তু তার সব সময় একই উত্তর—'Je ne veux pas'—'না, আমার চাই না।'

রোমান্টিক কবিদের মধ্যে মরণবিলাসীর অভাব নেই। কীট্‌স্ একটি চিঠিতে তাঁর প্রিয়তমা ফ্যানি ব্রন্‌কে লিখেছেন, 'আমি যখন বেড়াই তখন দুটি বিলাস আমার মনন করার থাকে, তোমার লাবণ্য ও আমার মৃত্যুর মুহূর্ত।' শেলীকেও মরণ অনেক বার প্রিয় নাম ধরে ডেকেছে। মৃত্যুর দিকে সাগ্রহ প্রবণতা বোদ্‌লেয়ারের কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'La Fin de la Journe´e' ( দিনের শেষ ) কবিতায় তিনি লিখেছেন—"পাণ্ডুর দিনের আলোর নীচে জীবন অকারণে ছুটে চলে, নেচে ওঠে, এঁকে বেঁকে যায়,

লজ্জাহীন, উচ্চরব। আর বিলাসিনী রজনীর যেই দিগন্তে আবির্ভাব হয়, সব কিছু প্রশমিত ক'রে, এমন-কি ক্ষুধাও; সব কিছু মুছে দিয়ে, এমন কি লজ্জাও, কবি করে স্বগতোক্তি: 'অবশেষে আমার মেরুদণ্ডের মতো আমার মনও বিশ্রামের জন্য বহু মিনতি করছে। ওগো সঞ্জীবনী সব ছায়া! বিষণ্ণ-স্বপ্নে ভরা হৃদয় নিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে প'ড়ে তোমাদের পর্দায় নিজেকে জড়িয়ে নেব।' "

বহু বিচিত্র রূপে প্রেম বোদ্‌লেয়ারের কবিতায় বিকশিত হয়ে উঠেছে। তিনি যে সব নারীকে ভালোবেসেছিলেন, যেমন জান দ্যুভাল্, মারী দোব্রঁ্য, মাদাম্ সাবাতিয়ে, তাঁরা বিভিন্ন ধরনের প্রেমের কবিতা লিখতে বোদ্‌লেয়ারকে অনুপ্রাণিত করেছেন। ডান্ ও ব্রাউনিঙের মতো তিনিও 'প্রেমের কুঞ্জে অনেক বাঁকা গলিঘুঁজি'-র সন্ধান আমাদের দিয়েছেন। গভীরতার দিক থেকে, হৃদয়বৃত্তির দিক থেকে, 'Les Fleurs du mal' গ্রন্থের প্রায় এক-চতুর্থাংশ কবিতাকে এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতার মধ্যে স্থান দেওয়া হচ্ছে। প্রেমের ইন্দ্রিয়ভোগ্য দিক্ বোদ্‌লেয়ারের লেখায় অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু অনেক সময় তিনি আদিরসে মনোবৃত্তির মিশ্রণ ঘটিয়ে ভিন্ন স্বাদ এনে দিয়েছেন। নারীর মধ্যে বোদ্‌লেয়ার অনেক কিছু খুঁজেছেন; আর যতটা খুঁজেছেন করুণার উৎস জননীকে (মায়ের প্রতি বোদ্‌লেয়ারের অস্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল), একপ্রাণা সহোদরাকে, নীরব কোনো শক্তিকে, লীলাসঙ্গিনীকে ততটা নয়। তাঁর 'Le Balcon' (বারান্দা) কবিতায় তিনি তাঁর 'শ্যামাঙ্গী ভীনাস্' জান্ দ্যুভাল্‌কে প্রণয়ের মূর্তিমতী রূপে কল্পনা করেছেন। তিনি বোদ্‌লেয়ারের কাছে স্মৃতির জননী, প্রিয়দের মধ্যে প্রিয়তমা, তাঁর সব আনন্দের ও সব কর্তব্যের আধার। তাঁর স্বপনচারিণী, বাসনারঙ্গিণী। দেবী রূপে তাঁকে বরণ করেছেন বোদ্‌লেয়ার। *caresses* ('সোহাগ') কথাটি তিনি ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু কবিতাটিতে জানের গৃহলক্ষ্মীর বেশ এত উজ্জ্বল যে আমরা শব্দটির অনঙ্গরঙ্গের দিক্‌টা উপেক্ষা করি। কবিতাটির পরিবেশ রমণীয়। (এ পরিবেশ বোদ্‌লেয়ারের কবিতায় সহজলভ্য।) অস্তোন্মুখ সূর্য মেঘমালায় গোলাপের আভা ছড়িয়ে দিয়েছে; বারান্দা থেকে প্রণয়ীযুগল নিরীক্ষণ করছে সে অপরূপ সৌন্দর্য। ঘরের অগ্নিকুণ্ডস্থ অঙ্গারের আভায় সন্ধ্যা দীপ্তিমতী; কিছু নিবিড় করে কাছে পাওয়া, কিছু মর্মের বাণী

বলা। অঙ্গীকার, সৌরভ আর সংখ্যাতীত চুম্বনের জ্বালা—এই নিয়ে অনুরাগের ফাল্গুনী রচিত হয়েছে।

আবার এক দিক থেকে বোদ্‌লেয়ার Symboliste-দের পূর্বসূরী। তাঁর নূতনত্বের ( 'le Nouveau' ) অনুসন্ধান ও অতিপ্রাকৃত-লোকের বোধ তাঁকে প্রতীকীবাদীদের সমগোত্রীয় করেছে। ভিক্তর উগোর ভাষায়, বোদ্‌লেয়ার ফরাসী কবিতায় এক "অভিনব শিহরণ" ('frisson nouveau') এনেছিলেন।[১] মালার্মে, র‍্যাবো প্রভৃতি প্রতীকীবাদীরা বোদ্‌লেয়ারের মধ্যে এক নূতন ধরনের যাদু আবিষ্কার করেছিলেন। ছন্দ শব্দ ও চিত্রকল্পের সমন্বয়ের সাহায্যে এই যাদু জগৎ-সংসারের চিত্রলিপি ফুটিয়ে তুলতে পারে। *Correspondances* ( অনুরূপতা ) নামক সনেটে বোদ্‌লেয়ার বর্ণ শব্দ ও গন্ধের মধ্যে রহস্যময় যে নিকট সম্পর্ক রয়েছে সেই সম্পর্কে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর ধারণা, বিরল মুহূর্তে কবি এক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন যার ফলে বিশ্বভুবনে যে নিবিড় যোগসূত্র সব কিছু বিধৃত করে আছে সেগুলি তাঁর গোচরে আসে। তাঁর পক্ষে সেই সব প্রতীক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় যে প্রতীকগুলি পরব্রহ্মের অনুরূপ। এই প্রসঙ্গে বোদ্‌লেয়ার সম্পর্কে র‍্যাবোর উচ্ছ্বসিত উক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে—'পরম দ্রষ্টা, কবিকুলচূড়ামণি, প্রকৃত দেবতা!' ( 'Le premier voyant, roi des poétes, un vrai Dieu !' )

১ 'ফ্ল্যর দ্যু·মাল্' সম্পর্কে উগো বোদ্‌লেয়ারকে লিখেছিলেন—'Vous dotez le ciel de l'art d'un rayon macabre ; vous creez un frisson nouveau.' ('আপনি শিল্পের আকাশ এক করাল আলোয় ছেয়ে ফেলেছেন : আপনি এক অভিনব শিহরণ সৃষ্টি করেছেন।')

# রোমান্টিক কাব্য ঃ স্বরূপ ও সার্থকতা

Extraordinary development of imaginative sensibility.

C. H. HERFORD

রোমান্টিকতার অর্থ শুধু স্বপন-বপন বা বেদনা-বিলাস একেবারেই নয়। রোমান্টিক শিল্পী মনে-প্রাণে আদর্শবাদী। কঠিন বাস্তবকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। বাস্তবকে ছেড়ে যখন তিনি আপাত-দৃষ্টিতে পালিয়ে যেতে চাইছেন তখন সেটা তাঁর কাপুরুষতা নয়। তিনি স্বপ্নলোকে যখন যেতে চান, সেটা উজ্জয়িনীতেই হোক বা ইনিস্‌ফ্রীতেই হোক, সেটা সাময়িক বিরামের জন্য, যাতে পূর্ণোদ্যমে আবার এই ধূলিধূসরিত ধরণীতে ফিরে আসতে পারেন। তাঁর বিরুদ্ধে 'পলায়নী মনোবৃত্তি'র অভিযোগ এই কারণেই আনা চলে না। তিনি পৃথিবীকে সুন্দরতর রূপে গড়তে চান, সমাজকে করতে চান ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পালিয়ে গিয়ে তিনি নিজে পরিত্রাণ পেতে পারেন, কিন্তু তাতে তো মানুষের মুক্তি ত্বরান্বিত হবে না। প্রতিটি চোখের প্রতিটি অশ্রুবিন্দু যতক্ষণ না মোছাতে পারছেন ততক্ষণ তাঁর আত্মার শান্তি নেই।

Ah, Love ! could thou and I with Fate conspire
To grasp this sorry Scheme of Things entire,
Would not we shatter it to bits—and then
Re-mould it nearer to the Heart's Desire ![১]

—এ কামনা যে কোনো রোমান্টিক কবির মনের কামনা। পুরানো পৃথিবী ভেঙে-চুরে তিনি যে নূতন ভুবনের সৃষ্টি করবেন তাতে তিনিই শুধু সুখে ঘর-সংসার করবেন না, সকলে সুখী হবে, সকলে নিরাময় হবে।

---

১ E. Fitzgerald, 'Omar Khayyám'.

রোমান্টিক কবি 'রসতীর্থ পথের পথিক'। অনাস্বাদিত রসের পরিবেষণায় তাঁর আনন্দ। তিনি সৌন্দর্যের উপাসক, সব কিছুর মধ্যে সৌন্দর্যের সন্ধান করেন। বসন্তবনের গন্ধ তিনি বহন করে আনেন, নিজের ভালো-লাগা রঙে উত্তরীয়কে করেন রঙিন। এটা তাঁর একটা দিক। আর এক দিকে তিনি যোদ্ধা। জীবন-সংগ্রামে সংগ্রামরত প্রতিটি মানুষের তিনি সহযোদ্ধা। যিনি সুন্দরের পূজারী তিনিই আবার ভৈরবের অনুচর—

যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেখানকার দেনা
শোধ করি—সে নহে কথায় তাহা জানি—
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম ;
সেথায় নির্মম কর্ম ;
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক 'মাভৈঃ' ;
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।
সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
চলে হাতে হাতে।[২]

কবির মন সাধারণ মানুষের মনের থেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির, বিশেষত রোমান্টিক কবির মন। এই পার্থক্য মৌলিক পার্থক্য নয় বলে ওয়ার্ডসোয়ার্থ মনে করেন। তা যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে কবির মন সাধারণ মানুষের মনের তুলনায় অনেক প্রশস্ততর ও গভীরতর। জনসাধারণের জীবনে কবি-মনের সীমাহীন উদারতার দৃষ্টান্ত কোথায় ? আর সূক্ষ্মতা, সংবেদনশীলতার দিক থেকেও রোমান্টিক কবির মন অনন্য। সে মন নিজেকে নিয়ে অনেক সময় তন্ময়, কখনও বা দিশাহারা। কিন্তু অন্যের কথা, অন্যের ব্যথা

২ রবীন্দ্রনাথ, 'রোম্যান্টিক' ("নবজাতক")।

সে মন থেকে কোনো সময়ই একেবারে মুছে যাচ্ছে না। আত্মমগ্ন হয়তো, কিন্তু স্বার্থান্ধ কখনোই নয়। নিজেকে ভালোবাসেন বলেই রোমান্টিক কবি অন্যকেও ভালোবাসতে পারেন, সব মানুষকে ভালোবাসতে পারেন। ( খ্রীস্টের অনুশাসন মনে পড়বে, Thou shalt love thy neighbour as thyself. )

রোমান্টিসিজ্‌মের প্রকৃত সংজ্ঞা এমনও পর্যন্ত অনিশ্চিত। অনেকগুলি বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা প্রচলিত আছে—এগুলির মধ্যে Theodore Watts-Dunton-এর 'the renascence of wonder' ( Chambers's Cyclopaedia of English Literature, III, I : 1903 ) এবং Walter Pater-এর 'addition of strangeness to beauty' ( Appreciations, 1884 ) সমধিক প্রসিদ্ধ। বিস্ময়বোধের নবজাগরণ অবশ্যই আমরা রোমান্টিক রচনায় পাই, কিন্তু সংজ্ঞা দেওয়ার সময় সেইটাকেই অবলম্বন করা হবে কি না এটা তর্কসাপেক্ষ। সুন্দরের সঙ্গে বিচিত্রের সংযোগও রোমান্টিক লেখায় ঘটে থাকে, তবে সেটা রোমান্টিসিজ্‌মের মূল কথা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

সাধারণতঃ রোমান্টিসিজ্‌মকে ক্ল্যাসিসিজ্‌মের বিপরীত-ধর্মী মনে করা হয়। সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, কখনো ক্ল্যাসিকাল ধারা, কখনো রোমান্টিক ধারা প্রবহমান। 'ক্ল্যাসিকাল' কথাটি প্রধানতঃ প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সাহিত্য ও শিল্পের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়। এই ধ্রুপদী দৃষ্টিভঙ্গী ও শৈলী থেকে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী ও শৈলীকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা কঠিন। একটি আর একটির সঙ্গে ওতপ্রোত। তবে সাহিত্য-সমালোচকেরা তাঁদের সুবিধার জন্য দুটি পৃথক ধারা ধরে নেন।

খুব সাধারণভাবে এবং অসতর্কভাবে, আমরা বলতে পারি—রোমান্টিক কবিতার প্রধান লক্ষ্য কল্পনার আলোকে জীবনের রূপান্তর। মধুকরী কল্পনা রোমান্টিক কবির প্রধান সহায়িকা। রোমান্টিক কবি কল্পনার সাহায্যে নূতন জিনিস সৃষ্টি করেন—পুরাতনকে করেন নবজীবনদান। শেক্সপীয়ার তাঁর 'মিড্‌সামার-নাইট্‌স্ ড্রীম্' নাটকে যে কবির 'দিব্যোন্মাদ-ঘূর্ণিত-দৃষ্টি'র কথা উল্লেখ করেছেন সে কবি মনে-প্রাণে রোমান্টিক ;

সে কবি কল্পনার জীব, প্রেমিক ও প্রমত্তের সমগোত্রীয়, 'of imagination all compact'। বাস্তবের যে সব জিনিস প্রতিদিনকার ব্যবহারে ক্লিষ্ট, রোমান্টিক কবি সেই সব জিনিসের উপর কল্পনার আলো ফেলে তাদের উজ্জ্বল করে তোলেন। যেগুলি সুন্দর সেগুলিকে তিনি সুন্দরতর করতে চান। তাই রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতার কবির মতো তিনি বলতে পারেন—

নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বসন্ত কায়া
বাসন্তীবাস-পরা।
ধরণীর তলে গগনের গায়
সাগরের জলে অরণ্যছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।

রোমান্টিক কাব্যে কবির হৃদয়লোকের একটি অন্তরঙ্গ চিত্র ফুটে ওঠে। নিজেকে কবি আবরণ দিয়ে আড়াল করে রাখেন না, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিজের কবিতায় মেলে ধরাই তাঁর পরম কাম্য। কোনো দ্বিধা, কোনো সংকোচ তাঁকে আত্মনিবেদন থেকে বিরত করতে পারে না। কখনো তিনি মিস্টিক, নিজের ইন্দ্রিয়কে নিজেই অতিক্রম করে যাচ্ছেন; চোখের আলোয় চোখের বাইরে না দেখে নিজের অন্তরে তিনি মর্মের নেত্র দিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন। যে আঁধার আলোর অধিক সে আঁধার তাঁর নিরীক্ষণের পথে কোনো বাধার সৃষ্টি করছে না। কখনো-বা রোমান্টিক কবি বিদ্রোহী—ভাঙনের পথে তাঁর জয়যাত্রা। কোনো বিধি-নিষেধ, কোনো অনুশাসন—তা সমাজ-সংসারেরই হোক, বা ব্যাকরণ-অলংকারশাস্ত্রেরই—তাঁকে বাঁধতে পারে না। তিনি চির-নবীন, চির-যুবা, পুরাতনের প্রাচীরে তিনি বারংবার আঘাত হেনেছেন। স্থিতিতে নয়, গতিতেই তাঁর আনন্দ।

ওয়াল্টার পেটারের বিশ্বাস, রোমান্টিসিজ্‌ম্ কোনো বিশেষ যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা একটা বিশেষ ধরনের প্রবণতা মাত্র যেটা সব যুগেই কিছু কিছু দেখা যায়। মধ্যযুগের ও রেনেসাঁস-যুগের সাহিত্য রোমান্টিক লক্ষণাক্রান্ত হলেও, ইংরাজী সাহিত্যে রোমান্টিক কাব্য বলতে মূলত অষ্টাদশ শতকের

শেষাংশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের রচনাকেই বোঝানো হয়।[৩] এই রোমান্টিক সাহিত্য পাশ্চাত্ত্য জগতের অন্যান্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রোমান্টিক সাহিত্য বিকাশে ফরাসী দার্শনিক রুসোর মতবাদ ও রচনার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দে একটি প্রবন্ধে তিনি বলেন, সভ্যতা বা অগ্রগতির অর্থ 'বিকৃতি', বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্র প্রকৃতি সুখের আকর। এই থেকেই রুসোর বিদ্রোহী মনোভাবের সূত্রপাত। 'এমিল্' গ্রন্থের সূচনায় তিনি লিখেছেন—'স্রষ্টার কাছ থেকে যখন আসে, তখন সব কিছুই থাকে ; মানুষের নিকটে আসবার পর সব কিছুর অপকর্ষ হয়।' তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'স্বীকারোক্তি'তে তিনি লিখেছেন—'আমি যাদের দেখেছি আমি তাদের কারও মতো সৃষ্ট হইনি। যদি আমি আরও ভালো না হই, আমি অন্তত স্বতন্ত্র।' রুসোর এই উক্তিকে রোমান্টিক আন্দোলনের মূলমন্ত্র বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। রোমান্টিক কবির প্রকৃতি-প্রীতি, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ, বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী, সব কিছু উৎকর্ষেরই উৎস এখানে সন্ধান করা যেতে পারে। রোমান্টিক আদর্শ অবশ্য যখন বিকৃত হয় ( যেমন বায়রন বা বোদ্‌লেয়ারের মতো কবির কোনো কোনো কবিতায় ) তখন অতিমাত্রায় পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। 'Lilies that fester smell far worse than weeds.'

'রোমান্টিক' কথাটির প্রয়োগ প্রধানত ইংল্যাণ্ডেই প্রথম দেখা যায় ও পরে ইয়োরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই দিক থেকে আমরা বলতে পারি ইংরাজরা পাশ্চাত্ত্য জগতের অন্যান্য জাতির পথ-প্রদর্শক। স্বাভাবিক-ভাবেই মধ্যযুগের 'রোমান্স'-গুলির সঙ্গে 'রোমান্টিক' শব্দটি প্রথমে জড়িত ছিল, যেগুলির অন্যতম উপাদান ছিল 'শিভ্যাল্‌রি' ও 'অ্যাড্‌ভেনচার্'। যা কিছু অতিরঞ্জিত, অবাস্তব, অবিশ্বাস্য—সেই সবের সঙ্গে রোমান্টিকের ছিল যোগ। সপ্তদশ শতাব্দীতে মানুষ যুক্তিতর্ককে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করত। তাই এই সময় 'রোমান্টিক' মানেই 'উদ্ভট' ধরে নেওয়া হ'ত। পরবর্তী শতাব্দীতে ধীরে ধীরে শব্দটি আবার তার মর্যাদা ফিরে পায়।

---

৩ ওয়ার্ডসোয়ার্থের যুগের কাব্যসাহিত্যে যে রোমান্টিক ধারা বেগবতী হয়ে উঠল, ভিক্টোরীয় যুগের, এমন কি বিংশ শতাব্দীর কাব্যসাহিত্যেও, তা লুপ্ত হয় নি।

১৭১১ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ 'রোমান্টিক' নিন্দার্থক তো রইলই না বরং 'চিত্তহারী' বোঝাতে লাগল। এই সময় শব্দটি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হতে লাগল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝ বরাবর দেখা গেল, দুরকম অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে—এর একটি পুরাতন অর্থ, যেটিতে রোমান্সের সঙ্গে এর যোগাযোগ; আর একটি পরবর্তী অর্থ, যেটিতে আমাদের অনুভূতি ও কল্পনা-শক্তির সঙ্গে এর সংযোগ।[৪]

এই সময় বরাবরই দেখা গেল, শব্দটির ফ্রান্সে প্রচলন আরম্ভ হয়েছে। যে দৃশ্যের মূল আবেদন আমাদের ভাবাবেগের কাছে সেই সব দৃশ্য সম্পর্কে কথাটি ব্যবহৃত হতে লাগল। রুসো স্বয়ং তাঁর 'নিঃসঙ্গ ভবঘুরের ভাবনা'য় লিখেছেন—'জেনেভ হ্রদের তীরভূমির তুলনায় বিয়েন্ হ্রদের তীরভূমি আরও বেশি বন্য ও রোমান্টিক'। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী অ্যাকাডেমি যে অভিধান প্রণয়ন করেন তাতেও শব্দটির এই অর্থই ধরা হয়। টম্‌সনের Seasons যখন জার্মানীতে খ্যাতি লাভ করল তখন তার সঙ্গে 'রোমান্টিক' কথাটিও জার্মান ভাষা ও সাহিত্যে 'romantisch' রূপ পরিগ্রহ করল। নির্জন স্থানের দৃশ্যাবলী যার মধ্যে আদিম ভাবের ছাপ স্পষ্ট, সেগুলি ফ্রান্সের মতো, জার্মানীতেও 'রোমান্টিক' হয়ে উঠল।

সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে 'রোমান্টিক' কথাটির প্রয়োগ পরবর্তী ঘটনা। ভারত-প্রেমিক ফ্রীড্‌রিখ্ ফ্যন্ শ্লেগ্যল্ ছিলেন জার্মানীতে রোমান্টিক ধারার অন্যতম প্রবর্তক ও প্রবক্তা। ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে শ্লেগ্যল্ তাঁর একটি প্রবন্ধে সাহিত্য-সমালোচনা সূত্রে 'রোমান্টিক' কথাটি ব্যবহার করার পর থেকে সাহিত্য-মীমাংসায় শব্দটির প্রচলন হয়।[৫]

রোমান্টিক সাহিত্য জার্মানীতে আরম্ভ হয় ইংরাজী সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় কিন্তু পরে আবার ইংরাজী সাহিত্যকেই প্রভাবিত করে। সপ্তদশ শতাব্দীর

---

৪ 'রোমান্টিক' কথাটির অর্থগত বিকাশ যাঁরা অনুধাবন করতে চান তাঁদের পক্ষে Logan Pearsall Smith এর আলোচনাটি ( 'Four Romantic Words', *Words and Idioms*, London, 1925 ) অপরিহার্য।

৫ শ্লেগ্যল্ 'রোমান্টিক কবিতা'কে 'প্রগতিমূলক বিশ্বজনীন কবিতা' ( 'progressive Universalpoesie' ) রূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, এক অর্থে সব কাব্যই রোমান্টিক বা রোমান্টিক হওয়া উচিত।

শেষে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় জার্মান সাহিত্যের বেশ দুঃসময় চলছিল। রাজনীতি ও অর্থনীতির দিক থেকে জার্মানীর দুরবস্থা সাহিত্যকেও সংক্রামিত করেছিল। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত Bodmer-এর রচনার নাম থেকে বোঝা গেল, সুদিনের সূচনা হয়েছে—'কাব্যে বিস্ময়বোধক উপাদান সম্পর্কে নিবন্ধ'। লেসিং প্রচলিত শৈলীকে 'ফরাসীগন্ধী' বলে কঠোরভাবে সমালোচনা করলেন। (ইতিপূর্বে Gottsched এই শৈলীর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন।) তিনি প্রস্তাব করলেন, যেহেতু ফরাসীদের চেয়ে ইংরাজদের সঙ্গে জার্মানদের আত্মিক সম্পর্ক নিকটতর, জার্মানদের উচিত ফরাসীদের পরিত্যাগ করে ইংরাজদের আদর্শরূপে গ্রহণ করা। মিল্‌টন ইতিপূর্বেই জার্মানীতে শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পেয়েছেন। লেসিং শেক্‌স্‌পীয়রের যশোগান আরম্ভ করলেন। তিনি আরো বললেন, অনুকরণের চেয়ে মৌলিক সৃষ্টির দিকে জার্মানদের ঝোঁকা উচিত। ইতিমধ্যে ইংরাজ লেখক ইয়ং-এর 'Conjectures on Original Composition' জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে (১৭৬০)। এই রচনায় নন্দনতাত্ত্বিক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ স্পষ্ট। অনুকরণ ও মৌলিক রচনা, প্রাচীন ও আধুনিক লেখক, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা, নিয়মনিষ্ঠা ও বাধাবন্ধহীন উৎসাহ—এই সমস্ত বিষয়ের পার্থক্য বিশদ্‌ভাবে নিরূপণ করার মধ্য দিয়ে ইয়ং নূতন সাহিত্য-সংক্রান্ত ধারণা প্রচলনে বিশেষ সহায়তা করেন। ইয়ঙের রচনা জার্মানদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

রোমান্টিক আদর্শ বিস্তারের পরবর্তী পর্যায়ে (মোটামুটিভাবে ১৭৭০ থেকে ১৭৯০) জার্মান সাহিত্যের গুরুত্ব ইংরাজী সাহিত্যের চেয়ে বেড়ে যায়। 'Sturm und Drang' (১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ক্লিংগারের এই নামের নাটক থেকে নামটি নেওয়া) আন্দোলনের মূল কথা বিদ্রোহ। সাহিত্যিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সব ধরনের সব কিছু বিধিনিষেধের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। 'ঝটিকা ও সংঘাত' আন্দোলনে যে নীতি উদ্ভূত হয় তরুণ গ্যেটে ও শিলারকে তার মূর্ত প্রতীক মনে করা যেতে পারে। প্রতিভাবান্ লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও আবেগ উদ্দাম কল্পনাশক্তির সাহায্যে শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। এইজন্য অনেক সময় 'ঝটিকা ও সংঘাত'কে *Geniezeit* বা 'প্রতিভার যুগ' বলা হয়। জার্মান রোমান্টিসিজ্‌ম্

এত প্রবল হয়ে ওঠে ও এর প্রভাব এত সুদূরপ্রসারী হয় যে কেউ কেউ মনে করেন রোমান্টিসিজ্‌মের নূতন নাম দেওয়া উচিত 'জার্মান্টিসিজ্‌ম্'।

জার্মান রোমান্টিকতার একটি বিশেষ লক্ষণ, Weltschmerz ('বিশ্ব-বিষাদ')। অনেক রোমান্টিক শিল্পীই নিজেকে সংসারের প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি; এঁরা ছিলেন খেয়ালী, অস্থিরমতি, 'দোলাচলচিত্তবৃত্তি'। এর ফলে অন্তহীন সংঘাত, বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্য তাঁদের জীবনে ও সাহিত্যে দেখা যেতে লাগল। গ্যেটের তরুণ ভের্থের-চরিত্রটির এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। (ভিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্টার-এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু গ্যেটে অন্য জিনিস দেখিয়েছেন।) 'বিশ্ব-বিষাদ'-আক্রান্ত জার্মান কবিদের মধ্যে প্রধান নাম হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে'র। আর একটি সুপরিচিত নাম হোল্‌ডার্লিনের। এই সূত্রে নীকোলাউস্ লেনাউ-এর নামও আসবে। লেনাউ ব্যক্তিগত জীবনে খুব অসুখী ছিলেন এবং তিনি মূলত দুঃখবাদী কবি। ইংরাজী রোমান্টিক সাহিত্যেও সর্বগ্রাসী বিষাদের সুর বহুবার শোনা গেছে। বায়রনের 'ম্যান্‌ফ্রেড্' বা 'চাইল্‌ড্ হ্যারল্‌ডের তীর্থযাত্রা'র এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

রোমান্টিক ভাবধারার প্রসারে রুসোর অসামান্য দানের কথা আগেই বলা হয়েছে। ভূমি ও সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার উপরে প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন সমাজব্যবস্থার প্রতি রুসোর একেবারেই আস্থা ছিল না। মানবজাতির আদিম অবস্থাই তাঁর কাছে কাম্য মনে হয়েছিল ও তিনি 'প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন'-এর নীতি প্রচারে উদ্যোগী হন। মানব-বৈষম্য সংক্রান্ত তাঁর গ্রন্থের পরিশিষ্টে তিনি আদিম মানুষ ও সভ্য মানুষের পার্থক্য স্পষ্টভাবে নিরূপণ করেন। "আহার শেষ হওয়ার পর বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছুর সঙ্গে আদিম মানবের সদ্ভাব, সে তখন সব মানুষের বন্ধু।" কিন্তু সভ্য মানুষ কি করে? "ঐশ্বর্য গলাধঃকরণ, অসংখ্য লোকের সর্বনাশ করার পর, ··নিজেকে বিশ্বের অধীশ্বর বানানো পর্যন্ত অন্য সকলের গলা কেটে তার শেষ পরিণতি।" পরবর্তী কালে তাঁর 'এমিল্' (১৭৬২) উপন্যাসে এই কথাই রুসো অন্যভাবে বলেছেন, মানুষের হাতে পড়লে সব কিছুরই দুর্গতি হয়। বহিঃপ্রকৃতিকে মানুষের মনের অবস্থার সঙ্গে রুসোর মিলিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আমরা তাঁর 'জুলি, বা নূতন এলোয়াস্' (১৭৬১) এবং 'নিঃসঙ্গ ভবঘুরের ভাবনা' (১৭৭৮) প্রভৃতি গ্রন্থে দেখতে পাই।

যে নিসর্গ-চেতনাকে রোমান্টিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য গণ্য করা হয় রুসোর রচনাবলীতে তার সূত্রপাত বললে অত্যুক্তি করা হবে না। প্রকৃতির বিকাশের মধ্যে সৌন্দর্য নিরীক্ষণের প্রথম পাঠ রোমান্টিক কবিরা রুসো থেকে গ্রহণ করেন। ওয়ার্ডসোয়ার্থ যখন তুচ্ছতম কুসুমে গভীরতম বাণী খুঁজে পেয়েছেন তখনো তিনি রুসোর কাছে ঋণী, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে। ভাবাবেগমূলক রচনার যে রীতি রোমান্টিক্ লেখকদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করে তারও প্রথম আরম্ভ হয় রুসোর 'স্বীকারোক্তি'র মধ্যে। 'নূতন এলোয়াজ্' গ্রন্থেরও নাম করা যেতে পারে। আবেগধর্মী আত্মবিশ্লেষণ—যেটা পরবর্তী রোমান্টিক লেখকদের রচনায় বারংবার দেখা গেছে—'স্বীকারোক্তি'তে প্রথম সূচিত হয়। গ্যেটের কথা মনে পড়ে—"ভল্‌তেয়ারের মধ্যে আমরা এক জগতের অবসান দেখি; রুসোর মধ্যে দেখি নূতন জগতের সূচনা।" হয়তো এই উক্তি মনে রেখেই স্যাঁৎ-ব্যুভ্ রুসোকে রোমান্টিক আন্দোলনের পিতামহ রূপে বর্ণনা করেন। জার্মানীতে আমরা যে 'ঝটিকা ও সংঘাত' প্রত্যক্ষ করেছি, তার মূলে রুসোর প্রভাব অপরিসীম। হের্ডার ছিলেন রুসোর শিষ্য এবং তিনি জার্মানদের মধ্যে রুসোর ভাবধারা প্রচারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখান।

ফরাসী সাহিত্যে রোমান্টিক ধারা প্রবর্তনের সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের মধ্যে ফ্রাঁসোআ র‍্যনে ভীকঁৎ দ্য শাতোব্রীয়াঁ অন্যতম। তিনি মিলটনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন; আবার বায়রনকে প্রভাবিত করেছেন। যে রোমান্টিক ধারা ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে প্লাবন এনেছে সেটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে হলে সমকালীন ইংরাজি বা জার্মান বা ফরাসী সাহিত্যকে পৃথক করে দেখলে চলবে না। একই ভাবের জোয়ারে ভেসে গেছে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী। জার্মান রোমান্টিক লেখকদের মতো শাতোব্রীয়াঁও মধ্যযুগের দিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। (ইংল্যাণ্ডে স্কট্ ও কোল্‌রিজের কথা মনে পড়বে।) মধ্যযুগের তথাকথিত বর্বরতার মধ্যে রোমান্টিক শিল্পী প্রাণশক্তির প্রাচুর্যের সন্ধান পেয়েছেন। রোমান্টিক শিল্পীদের অতীত-প্রীতিও মধ্যযুগের প্রতি আকর্ষণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের অনেক গভীর জিনিসের মতো রোমান্টিকতাও বিরোধাভাসে ঝংকৃত। এক দিকে যেমন রোমান্টিক কবি অতীতের অনেক সংস্কার ভাঙছেন, অন্য দিকে আবার অতীতের অনেক কিছুর প্রতি বিশেষ মমতা পোষণ করছেন।

কবিত্বধর্মী ইংরাজ প্রাবন্ধিক ল্যাম্ ও হ্যাজ্‌লিট্ অতীতের জয়গানে মুখর। জার্মান রোমান্টিকদের মতো শাতোব্রীয়াঁও ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন। তিনি যখন জীবনক্লান্তিতে জর্জরিত হয়েছেন, তখন তাঁর রচনায় হেল্‌ডার্লিনের গীতিকবিতার অনুরণন আমরা শুনতে পেয়েছি—'কিছু উপভোগ করারও আগেই হতাশা এসে পড়ে; কামনাগুলি থেকে যায়, কিন্তু মোহ আর কিছু থাকে না। কল্পনা-শক্তিতে সমৃদ্ধি, প্রাচুর্য ও চমক রয়েছে; জীবনে রয়েছে দীনতা, শুষ্কতা আর মোহিনীমায়ার বিলুপ্তি। এ হচ্ছে পূর্ণ হৃদয় নিয়ে শূন্য সংসারে বেঁচে থাকা, আর কোনো কিছু আস্বাদন করারও আগেই সব কিছু বিস্বাদ হয়ে যাওয়া।'[৬]

রোমান্টিক কাব্য সরলরেখা ধরে চলে না; জীবনের জটিলতায় রোমান্টিক ধারা বহুমুখী। তবে গতি সর্পিল, পথ বন্ধুর। তাই আধুনিক রোমান্টিক কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে যাঁরা বলেন, 'মধ্যযুগের পুনরাবির্ভাব'[৭] বা 'রুসোর মতবাদ'[৮], তাঁরা সরলতার স্বার্থে সত্যকে বিসর্জন দেন।

রোমান্টিক কাব্যের সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। (গ্যেটে তাঁর বিখ্যাত কিন্তু পক্ষপাতদুষ্ট উক্তিতে রোমান্টিসিজ্‌ম্‌কে বলেছেন 'অসুস্থতা', ক্ল্যাসিসিজ্‌ম্‌কে 'স্বাস্থ্য'।) রোমান্টিক কাব্যের একটি প্রধান গুণ এর সজীব লাবণ্য। কবিকল্পনার উদ্দামতা রোমান্টিক কাব্যে নিয়ে আসে উন্মাদনা। তাই পাঠকের মনকে রোমান্টিক কাব্য সহজেই জাগিয়ে তুলতে পারে। আর রোমান্টিক কাব্যে আছে রমণীয়তা, যে রমণীয়তা কখনো কখনো নিসর্গ ও মানবের সম্মিলনে কমনীয় হয়ে ওঠে। এই বৈশিষ্ট্য এ যুগের কবিতাতেও দেখা যায়; যেমন,

> স্তব্ধ গভীর নিথর সলিলে আকাশ দেখিছে মুখ,
> গুঞ্জন-ভরা বাতাসের শ্বাসে কভু বা কাঁপিছে বুক,
> ডাহুক ডাহুকী পক্ষ ভিজায়,—এমন সরসীতীরে
> আর্দ্র-শীতল মৃত্তিকা 'পরে শরবনে এনু ফিরে।
>
> (মোহিতলাল মজুমদার, 'বসন্ত-আগমনী')

---

৬ শাতোব্রীয়াঁ, 'খ্রীষ্টধর্মের স্বরূপ' (১৮০২)।

৭ হাইনে রোমান্টিসিজ্‌মকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন—'মধ্যযুগের জীবন ও চিন্তার পুনর্জাগরণ'।

৮ আর্ভিং ব্যাবিট্ রোমান্টিসিজ্‌মের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর 'রুসো ও রোমান্টিসিজ্‌ম্' (১৯১৯) গ্রন্থে রুসোর ভূমিকা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

মন্দির হ'য়ে ঝাউগুলি ওঠে যেখানে নিথর ছায়া—
চিক্কণ জলে পা দুটি ডুবিয়ে বসেছে একলা মেয়ে,—
ধনুকের মত আয়ত চক্ষে অতলান্তিক মায়া,—
সৃষ্টির সেই প্রথম প্রতিমা দেখেছি অবাক্ চেয়ে।

( শান্তিকুমার ঘোষ, 'মিতার জন্য রোমান্টিক কবিতা' )

But I am carried back against
My will into a childhood where
Autumn is bonfires, marbles, smoke ;
I lean against my window fenced
From evocations in the air.
When I said autumn, autumn broke.

( Elizabeth Jennings, 'Song at the Beginning of Autumn')

এই কবিতাগুলি পাঠকের ভালো লাগার কারণ স্পষ্ট। এগুলির প্রধান আবেদন আমাদের হৃদয়ের কাছে, মস্তিষ্কের ভূমিকা এখানে গৌণ। এ কবিতাগুলির আধুনিকতা কিন্তু অস্পষ্ট নয়। ( ফরাসী ঔপন্যাসিক স্তাঁদাল বলেছেন, 'যে-কোনো যুগেই, রোমান্টিসিজ্‌ম্ সমকালীন শিল্পকলা।' ) আর এ সব কবিতার ক্ষেত্রে 'স্বাস্থ্য' বা 'অসুস্থতা' অবান্তর প্রশ্ন—বেঁচে থাকা, প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে বেঁচে থাকা, সেটাই প্রাসঙ্গিক।

সদ্য-আলোচিত কবিতাগুলিতে আমরা যে 'intoxicating dreaming'[৯] পাই তার একটি গভীর দিকও রোমান্টিক কবিতায় পাওয়া যায়। মরমিয়া বা মিষ্টিক কবি যে কাব্য রচনা করেন সেটিও মূলত স্বপ্নাভিসার, এবং সেইজন্যই একান্তভাবে রোমান্টিক। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন হেনরি ভন্ লিখেছিলেন—

I saw Eternity the other night
Like a great *Ring* of pure and endless light,
All calm, as it was bright,

---

৯ বাক্যাংশটি *The Decline and Fall of the Romantic Ideal* ( ১৯৩৬ ) গ্রন্থের লেখক F. L. Lucas ব্যবহার করেছেন।

কিংবা আরো পূর্ববর্তী কালে, চণ্ডীদাস—

( আমার ) বাহির-দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর-দুয়ারে খোলা ;
( তোরা ) নিসাড় হইয়া আয় না, সজনি !
আঁধার পেরিয়ে আলা,

তখন তাঁদের কাব্যে রোমান্টিক রাগিণীই ধ্বনিত হয়েছিল। পরম সত্যের উপলব্ধি যদি জীবনের লক্ষ্য হয় তা হলে সেই লক্ষ্যের সন্ধান মরমিয়া কবিই দিতে পারেন, যিনি একাধারে সাধক পাগল ও প্রেমিক। নৈষা তর্কেণ মতিরাপণেয়া। ক্ষুরের ধারার মতো দুর্গম সে পথ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সাহায্যে পার হওয়া যায় না। অনুভূতিই একমাত্র অবলম্বন। সংসারের সীমার মাঝে তর্ক-বিচারের প্রয়োজন আছে ; কিন্তু সীমাকে অতিক্রম করতে হলে জ্ঞানকেও অতিক্রম করতে হবে। রোমান্টিক কবির পক্ষে এই অতিক্রমণ সম্ভব। শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্যে অনন্তের মূর্ছনা। এইখানেই রোমান্টিক কাব্যের সব চেয়ে বড়ো সার্থকতা।

মন্দির হ'য়ে ঝাউগুলি ওঠে যেখানে নিথর ছায়া—
চিক্কণ জলে পা ছুটি ডুবিয়ে বসেছে একলা মেয়ে,—
ধনুকের মত আয়ত চক্ষে অতলান্তিক মায়া,—
সৃষ্টির সেই প্রথম প্রতিমা দেখেছি অবাক্ চেয়ে।

( শান্তিকুমার ঘোষ, 'মিতার জন্য রোমান্টিক কবিতা' )

But I am carried back against
My will into a childhood where
Autumn is bonfires, marbles, smoke ;
I lean against my window fenced
From evocations in the air.
When I said autumn, autumn broke.

( Elizabeth Jennings, 'Song at the Beginning of Autumn')

এই কবিতাগুলি পাঠকের ভালো লাগার কারণ স্পষ্ট। এগুলির প্রধান আবেদন আমাদের হৃদয়ের কাছে, মস্তিষ্কের ভূমিকা এখানে গৌণ। এ কবিতাগুলির আধুনিকতা কিন্তু অস্পষ্ট নয়। ( ফরাসী ঔপন্যাসিক স্তাঁদাল বলেছেন, 'যে-কোনো যুগেই, রোমান্টিসিজ্‌ম্ সমকালীন শিল্পকলা।' ) আর এ সব কবিতার ক্ষেত্রে 'স্বাস্থ্য' বা 'অসুস্থতা' অবান্তর প্রশ্ন—বেঁচে থাকা, প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে বেঁচে থাকা, সেটাই প্রাসঙ্গিক।

সদ্য-আলোচিত কবিতাগুলিতে আমরা যে 'intoxicating dreaming'[৯] পাই তার একটি গভীর দিকও রোমান্টিক কবিতায় পাওয়া যায়। মরমিয়া বা মিষ্টিক কবি যে কাব্য রচনা করেন সেটিও মূলত স্বপ্নাভিসার, এবং সেইজন্যই একান্তভাবে রোমান্টিক। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন হেনরি ভন্ লিখেছিলেন—

I saw Eternity the other night
Like a great *Ring* of pure and endless light,
All calm, as it was bright,

---

৯ বাক্যাংশটি *The Decline and Fall of the Romantic Ideal* ( ১৯৩৬ ) গ্রন্থের লেখক F. L. Lucas ব্যবহার করেছেন।

কিংবা আরো পূর্ববর্তী কালে, চণ্ডীদাস—

(আমার) বাহির-দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর-দুয়ারে খোলা;
(তোরা) নিসাড় হইয়া আয় না, সজনি!
আঁধার পেরিয়ে আলা,

তখন তাঁদের কাব্যে রোমান্টিক রাগিণীই ধ্বনিত হয়েছিল। পরম সত্যের উপলব্ধি যদি জীবনের লক্ষ্য হয় তা হলে সেই লক্ষ্যের সন্ধান মরমিয়া কবিই দিতে পারেন, যিনি একাধারে সাধক পাগল ও প্রেমিক। নৈষা তর্কেণ মতিরাপণেয়া। ক্ষুরের ধারার মতো দুর্গম সে পথ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সাহায্যে পার হওয়া যায় না। অনুভূতিই একমাত্র অবলম্বন। সংসারের সীমার মাঝে তর্ক-বিচারের প্রয়োজন আছে; কিন্তু সীমাকে অতিক্রম করতে হলে জ্ঞানকেও অতিক্রম করতে হবে। রোমান্টিক কবির পক্ষে এই অতিক্রমণ সম্ভব। শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্যে অনন্তের মূর্ছনা। এইখানেই রোমান্টিক কাব্যের সব চেয়ে বড়ো সার্থকতা।